দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ ছোলাইমান হোসেন

এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ নং- ৫৬/২০১১-২০১২

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট - ২০১৪

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা এবং মমতাময়ী মা ও আমার
শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দের প্রতি যাদের স্নেহশীল দৃষ্টি,
অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা আর
অফুরন্ত দু'আয় মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে
গবেষণার এ স্তরে পৌঁছার তাওফিক দান করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, **দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা** শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

তারিখ, ঢাকা
২৬ আগস্ট ২০১৪

(মোঃ ছোলাইমান হোসেন)
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ৫৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্র :

তারিখ : ২৬ আগস্ট ২০১৪

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোঃ ছোলাইমান হোসেন কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নানামুখী প্রতিকূলতা ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে নতশির শুকরিয়া আদায় করছি।

গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বহু ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নিত হতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে এবং এটি মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করি। স্যারের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

কর্মময় জীবনে নানাবিধ ব্যস্ততার মাঝেও যার আন্তরিক উৎসাহ, প্রেরণা ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের ফলে এ গবেষণা কর্ম ত্বরান্বিত হয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আ ন ম রইছ উদ্দিন স্যার, উপাচার্য, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং বিভাগীয় অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্যারের কাছে সব সময় ঋণী ও কৃতজ্ঞ। সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্যারকে স্মরণ করি ও মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি। সাথে সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষককে যাদের মমতামাখা সংস্পর্শ ও উদার পরামর্শ পেয়ে আমার চিন্তাশক্তি অনেক বেশি গতিশীল হয়েছে। তাদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ এ গবেষণা কাজে যথেষ্ট সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে।

অতি আবেগের সাথে স্মরণ করছি শৈশব জীবনের স্মৃতি বিজড়িত পিতৃতুল্য শিক্ষকমণ্ডলী ও বিদ্যাপিঠগুলোকে, যাদের কোমল হাতছানি ও স্নেহের পরশে জীবনে বেড়ে উঠার সাথে সাথে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে গবেষণার এ দিগন্তে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছি। তন্মধ্যে মির্জানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নৈয়াইর ফাযিল মাদরাসা, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা ও শিক্ষকবৃন্দ আমার হৃদয়ে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেনো এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিয়ামত পর্যন্ত কাঙ্খিত মানে টিকিয়ে রাখেন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দকে উভয় জগতে উত্তম বিনিময় দান করেন।

এছাড়াও যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তারা হলেন আমার সম্মানিত মামা ও ঢাকা প্রকৌশল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, গাজিপুর-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ

বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ফারুক এবং দশপাড়া কবিরউদ্দিন কামিল মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট মুবাল্লিগ ও দা'ঈ মাওলানা আবুল বাশার। সকলকে সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

বিশেষভাবে হৃদয়ের গভীর থেকে তাদের নাম স্মরণ করছি যারা আল্লাহর দরবারে গভীরভাবে কান্নাকাটি করে নিয়মিত দু'আ করছেন তাদের মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বোহা, মমতাময়ী মা হাফিজা সাফিয়া বেগম, সম্মানিত বড় ভাই হাফিজ মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান, মাওলানা মোঃ লোকমান হোসাইন, একান্ত প্রিয় ছোট ভাই মাওলানা ফজলুর রহমান, সম্মানিতা বোনদ্বয় মোসাঃ ওয়াহিদা বেগম ও রাশিদা বেগম-এর কথা। সাথে সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণার নিদর্শন আমার আদরের দু'টি সন্তান আবদুল্লাহ সাফওয়ান, আবদুল্লাহ মারজুক ও তাদের মা আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী নুরুন নাহার ওরফে সুমাইয়া রহমানকে। যাদেরকে এ গবেষণার স্বার্থে দীর্ঘদিন স্নেহ-মমতা, আদর-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করতে হয়েছে। তাদের আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা, কল্যাণ কামনা ও দু'আর ফলে গবেষণকর্মটি শেষ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে তাদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি তিনি যেন তাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা-বান্দি হিসেবে কবুল করে নেন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন।

উক্ত অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরি, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি প্রভৃতি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি আল-কুরআনের পরিচিতি, তাফসির ও উসুলে তাফসির, দা'ওয়াতি বিষয়ের উপর রচিত দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা লেখকের রচনাবলি, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা নিয়েছি এবং যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকের নাম সসম্মানে উল্লেখ করেছি। তাদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে উভয় জাহানে উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করার জন্য এ. বি. এম নূরুল্লাহ-এর কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মহান তাকে ইহকালীন কল্যান ও পরকালীন মুক্তি ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হৃদয়ের গভীর থেকে দু'আ করছি, তিনি যেনো তাঁর এ বান্দাকে তাঁর প্রিয়বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন এবং উক্ত গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমিন।

(মোঃ ছোলাইমান হোসেন)
এম.ফিল গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

‘আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
اَ ء	অ	ض	দ/জ্ব	ـَـ	া	وُ	উ
ب	ব	ط	ত্ব	ـِـ	ি	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُـ	ু	وِيْ	বি/ভী
ث	ছ	ع	‘	ـَا	া	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـِيْ	ী	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـُوْ	ূ	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أَ	আ	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	আ	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ই	عَ	‘আ/‘য়া
ر	র	م	ম	إِيْ	ঈ	عَا	‘আ/‘য়া
ز	য	ن	ন	أُ	উ	عِ	ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ঊ	عِيْ	ঈ
ش	শ	و	ও	وَ/وَا	ওয়া	عُ	উ
ص	ছ	ي	য়	وِ	বি	عُوْ	ঊ

ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, تَأْجِيْرٌ = তা’জীর, تَأْثِيْرٌ = তা’ছীর, تَأْخُذُ = তা’খুযু প্রভৃতি।

ع হরফটির উচ্চারণে (’/‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, دَعْوَةٌ = দা‘ওয়াহ্, جَامِعْ = জামি‘, رَعْدٌ রা‘দ প্রভৃতি।

বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন- মুনাফা, কর্জ, আলেম, ফরজ মাজহাব প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

অনুঃ	:	অনুবাদ
অনূঃ	:	অনূদিত
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	:	ষষ্ঠ
৭ম	:	সপ্তম
৮ম	:	অষ্টম
৯ম	:	নবম
১০ম	:	দশম
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বি.	:	বিশেষ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
তাং	:	তারিখ
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পাণ্ডু	:	পাণ্ডুলিপি
মু.	:	মুদ্রণ
মূ.পা.	:	মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
পরি.	:	পরিশিষ্ট
সা.	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা
র./রহ.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
দঃ/দ.	:	দরূদ
আ.	:	‘আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম
আঃ	:	আয়াত
হি.	:	হিজরি সাল

খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
খৃ. পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ Doctor of Philosophy)
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং.	:	সংস্করণ
BIIT	:	Bangladesh Institute of Islamic Thought
ed.	:	edition
eds.	:	edited
Ibid	:	ibidem, which means 'in the same place'
p.	:	Page
pp.	:	Pages
vol.	:	Volume
AD	:	After death of Christ
C.	:	Christ
Cf.	:	Confer/Compare
H.	:	Hijrah
HTTP	:	Hyper Text Transfer Protocol
N.B.	:	Note Bane
IFB	:	Islamic Foundation Bangladesh
M.Phil	:	Master of Philosophy
Ph.D	:	Doctor of Philosophy

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা ২
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩
- গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ ৪
- গবেষণা কর্মের পদ্ধতি ৪
- গবেষণা কর্মের পরিধি ও ব্যাপকতা ৫
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস ৫
- গবেষণার সময়কাল ৫
- গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ৫
- তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ৬
- অভিসন্দর্ভ গঠন ও গবেষণা পরিকল্পনা ৭
- উপসংহার ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআন পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আল-কুরআনের সংজ্ঞা ও নাযিলের কারণ	১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আল-কুরআন নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৩২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	আল-কুরআন ও আল-হাদিসের পার্থক্য	৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনের সূরাসমূহের পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা ও বিষয়বস্তু	৫০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আল-কুরআনের সূরাসমূহের নামকরণ	৫৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	আল-কুরআনের সূরাসমূহের বিশেষ প্রেক্ষাপট	৭১

চতুর্থ অধ্যায়

মাক্কি সূরাসমূহের পরিচিতি ও বিষয়বস্তু

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	মাক্কি সূরার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য	১১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	মাক্কি ও মাদানি সূরার পার্থক্য	১২৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	মাক্কি সূরার বিষয়বস্তু	১২৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	মাক্কি সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা	১৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামি দা‘ওয়াহ্-এর পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি দা‘ওয়াহ্-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি দা‘ওয়াহ্-এর পদ্ধতি ও কৌশল	১৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে ইসলামি দা‘ওয়াহ্	২৩০

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাক্কি সূরায় ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	মাক্কি সূরায় ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পদ্ধতি	২৪০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	মাক্কি সূরায় জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	২৪৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর মাক্কি জীবন ও মানব জীবনে এর প্রভাব	২৬৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	আল-কুরআনে মাক্কি সূরাসমূহ ও মানব জীবনে দা'ওয়াতি কৌশল ও প্রয়োগিক বিশ্লেষণ	২৮২
●	:	উপসংহার	২৯২

পরিশিষ্ট

●	:	প্রামাণ্য চিত্রাবলি	২৯৭
●	:	গ্রন্থপঞ্জি	৩০২

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal) :

যাবতীয় প্রশংসা সে মহান আল্লাহ্ তা'আলার যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।[১] দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা ও নবী, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর যাকে আল্লাহ্ কিতাব দ্বারা মর্যাদাশীল করেছেন যার মতো কোনো গ্রন্থ উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়েছে তাঁর সমসাময়িক যুগ ও তাঁর পরবর্তী যুগের সকল লোক। অতঃপর বলতে হয়, মহান রব্বুল 'আলামিন মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর এ ইবাদত পালনের যাবতীয় বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী ও রাসুলগণের উপর আসমানি কিতাব ও অহি নাযিল করেন। সবশেষে একটা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। মহিমান্বিত আল-কুরআন সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধান নিয়ে প্রিয়রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়। একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে এতে রয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, উত্তরাধিকার, মিরাস, ফৌজদারি, দণ্ডবিধিসহ ইত্যাদি সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময়কে কেন্দ্র করে সূরাসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মাক্কি ও মাদানি। অহি নাযিলের শুরু হতে মাক্কি সূরাসমূহ সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ্র একত্ববাদ (ওয়াহ্দানিয়্যাহ) ও প্রভূত্ব (রবুবিয়্যাহ্)-এর দিকে আহ্বান করেছে। শির্কমুক্ত পৃথিবী গঠনে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান অধিক মাত্রায় মাক্কি সূরাসমূহে স্থান পেয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণী- '(হে নবী) আপনি বলুন, আল্লাহ্ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'[২] মহান আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার, ফেরেশ্তাগণকে বিশ্বাস, আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস, নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, ভাগ্যের ভাল-মন্দ বিশ্বাসসহ পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান ঈমানের প্রথম দা'ওয়াত হিসেবে আল-কুরআনের মাক্কি সূরাগুলোতে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে।

বিশ্বজনীন ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রচার করার মূল উৎসই হলো মাক্কি সূরাসমূহ। উল্লিখিত সূরাসমূহে দা'ওয়াতি কাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলসহ এর উপস্থাপনা শৈলী (সানায়াতুল ইলতিফাত) বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য খ্রিষ্টান মিশনারিগুলো নানান কৌশলে জনমনে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। কেউ কেউ ইসলামকে তরবারিযুদ্ধের অবাস্তব ঘটনা সাজিয়ে বদর, উহুদের যুদ্ধের যৌক্তিক ঘটনাকে হিংস্রভাবে উপস্থাপন করে থাকে। সুন্দর মার্জিত ধর্ম ইসলামকে উগ্র

---

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّه عِوَجًا দ্র. আল কুরআন, ১১২ : ১-৪

২. قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اَللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا أَحَدٌ দ্র. আল কুরআন, ১১২ : ১-৪

ও জঙ্গিবাদ বলে বিবেচনা করে। আবার কেউ কেউ ইসলামকে ভোগবাদী, কেউ বিরাগবাদী, কেউ আবার নানান পীর-মাযারি কায়দায় শারি'আত, তরিকত ও মা'রিফতের অপব্যাখ্যায় ধোঁকাবাজি করে প্রকৃত সুন্দর ইসলামকে অসাড় করার অপচেষ্টা করছে। এদের কেউ কেউ আবার স্বার্থবাদী, স্বার্থপরতা, নিস্তেজ মনোবল সৃষ্টিকারক কিছু নিষ্কর্ম মনোবৃত্তি লালন করে গির্জা, মন্দির নিরবতার মতো, মসজিদভিত্তিক খামখেয়ালিপনা আর অলস জীবনের ধারা রচনা করেছে। ফলে একশ্রেণির বিজ্ঞ 'আলিম-ইমামগণ তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়টুকুই অবসর নিষ্কর্ম কাটিয়ে সমাজে ইসলামের মূর্ত প্রতীক হিসেবে অবসর বসে থাকেন। এ যে ইসলামের নামে হয়ত জঙ্গিপনা, উগ্রতা ও হিংসাত্মক মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ; নয়তো ভদ্র, মার্জিত মাওলানা, ইমাম সাহেবিভাবে দিনভর অবসর কাটানোর প্রবণতা, এ দু'টোই অতিরিক্ত। অথচ উভয়ের মাঝামাঝিতে ইসলামের প্রকৃত আসলরূপ চিহ্নিত হওয়া জরুরি। আর তাহলো সমাজ সংস্কারের সুন্দর মনোভাব নিয়ে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক মানুষকে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কঠোর সাধনায় জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে মুখে উজ্জ্বল হাসি ও ঈমানের তেজোদীপ্ত প্রেরণায় জাতিকে জাগিয়ে তোলা। আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে তাওহিদি ঘোষণায় নিজেকে সার্বক্ষণিক ঈমানি কাজে ব্যস্ত রাখা। যা আমাদের প্রিয়রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিলো। যা দেখে বিশ্বের সকল ধর্মের অনুসারীরা প্রিয়রাসূল সা.-এর দরবারে আত্মসমর্পণ করে। ফলে মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার প্রভাব কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। প্রকৃত সত্য, কৌশল ও প্রকৃত উপস্থাপনাই দা'ওয়াতি কাজের আসল বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনের মাক্কি সূরাসমূহে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর সেজন্যই মাক্কি সূরাসমূহের এ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে **দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা** বিষয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of Research) :

ইসলাম বিশ্বের দরবারে বিজয়ী ধর্ম হিসেবে একটি স্বীকৃত সর্বজনীন ধর্ম। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এর বিপরীত চিত্র প্রায় সর্বত্র বিরাজমান। মুসলিমগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অবহেলিত লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, তাগুতি শক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে সর্বত্রই। এর মূল কারণ হলো ইসলামকে এর ধারকগণ প্রকৃত সত্যরূপে জাতির সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ। চারদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ইসলামের নামে নানান কু-প্রথা, বিদ'আত, রছম ও রেওয়াজ। অনেক দূরে হারাতে চলছে ইসলামের প্রকৃত সত্য ও বাস্তবরূপ। আর দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে সঠিক ইসলাম চর্চার পরিবেশ। আগামী প্রজন্ম ইসলাম শব্দটা ছাড়া অন্য কোন বাস্তবতার সাক্ষাত না পাওয়ার দুর্ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতির ছোঁয়া আর মিডিয়া সন্ত্রাসের দখলে ইসলাম যেনো হয়ে যাচ্ছে চোখের আঁড়াল। এ মহাসত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এহেন প্রেক্ষাপটে মুসলিম মিল্লাতের সামনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সঠিক

আহ্বান পৌঁছে দেয়া অতীব জরুরি। আর এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে **দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা** শিরোনামে গবেষণায় হাত দেয়ার প্রয়াস।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ (Objectives of the Study) :

আধুনিক বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামি দা'ওয়াহ্ পদ্ধতি মূল্যায়ন করে আল-কুরআনে মাক্কি সূরাসমূহের দা'ওয়াতি উপস্থাপনায় প্রভাব ও প্রয়োগ কতখানি তা জানা এবং ইসলাম পূর্ব তৎকালীন আরবের অবস্থা ও ইসলামের প্রভাবে পরবর্তী কালের আরবের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা। এছাড়াও গবেষণার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো :

১. মাক্কি সূরাসমূহের মৌলিক আহ্বান ও এর বাস্তব রূপরেখা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। মাক্কি সূরাসমূহে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের কী কী হিকমত অবলম্বন করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করা।
২. ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর ক্ষেত্রে মাক্কি সূরার কৌশলগত দিক নির্দেশনা ও এর প্রভাব পর্যালোচনা করা।
৩. মাক্কি সূরাসমূহের দিক নির্দেশনা অনুসরণে বিশ্ব মনবতার সামনে ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর সঠিক পদ্ধতি তুলে ধরা।
৪. উল্লিখিত হিকমাহ্ ও প্রভাব পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্বে এর প্রভাব কতখানি কার্যকর তা মূল্যায়ন করা।
৫. মাক্কি সূরাসমূহে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নামের সুস্পষ্ট বর্ণনা জাতির সামনে তুলে ধরা। মাক্কি সূরাসমূহের মূল শিক্ষা মানব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে করণীয় নির্ধারণ।
৬. দা'ওয়াতি কাজে উত্তম নসিহত (মাওইজাতুল হাসানাহ্) ও বিতর্ক পন্থা (মুজাদালা) এর প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৭. দা'ওয়াতি কাজে প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন দিকসমূহ জানা এবং সমস্যা সমাধান ও সফলতায় করণীয় নির্ধারণ করতে পারা ও দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমে দৃঢ় ও চলমান থাকার কৌশল অর্জন।
৮. একজন প্রকৃত দা'ঈকে জীবন্ত ইসলাম হিসেবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য হওয়ার মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে জানা।

গবেষণা কর্মের পদ্ধতি (Research Methodology) :

এ গবেষণায় ঐতিহাসিক (Historical), ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational), আন্তর্জাতিক (International) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়টি সামাজিক গবেষণার আওতাভুক্ত। সমাজ গবেষণার একক কোন পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। গবেষণার সুবিধার্থে অনেক সময় একাধিক পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সাধারণত ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Method) বেশি অনুসৃত হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা, তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য আরবি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে যথাস্থানে তথ্যসূত্রের উদ্ধৃতিও সংযুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মের পরিধি/ব্যাপকতা (Scope of Research) :
আল-কুরআনের মাক্কি সূরাসমূহে উল্লিখিত দা'ওয়াতি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ইসলামি আদর্শের সঠিক ধারণা এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ ও কল্যাণমুখী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে ইসলামি দা'ওয়াহ সংগঠনসমূহের দায়িত্বশীল ভূমিকা অনুসন্ধান এবং ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাধারণ মানুষের মাঝে যে ভুল কিংবা অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে তা দূরীকরণ করা এ গবেষণার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও আল-কুরআনের আহ্বানে বিশ্ববাসীকে জবাবদিহিতার অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে মাক্কি সূরার আলোকে প্রকৃত দা'ওয়াহ পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ এবং এর উৎকর্ষতা, পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আর আদর্শ সমাজ কায়েমে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার প্রতিকারের বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Source of Data) :
গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Source) ও দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস (Primary Source) : প্রাথমিক উৎস (Primary Source) হিসেবে রয়েছে আল-কুরআনুল কারিম, তাফসিরুল কুরআন আল-কারিম, উসুলে তাফসির ও আল-হাদিসসহ ফিক্‌হি গ্রন্থসমূহ। বিভিন্ন দা'ঈ লিখিত গ্রন্থাবলি, দেশ-বিদেশে প্রকাশিত ইসলামি দা'ওয়াতের গ্রন্থসমূহ, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইসলামি দা'ওয়াতি সংস্থার প্রতিবেদন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত জার্নাল ইত্যাদি।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source) : দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source) এর ভিত্তিতে যেমন, একজন দা'ঈর ব্যক্তিগত জীবন ও কর্ম, বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ও মুসলিম মনিষীগণের বিভিন্ন সভা, সেমিনারে সরাসরি ভাষণ ও সভা-সেমিনারে গৃহীত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তসমূহ।

গবেষণার সময়কাল (Research Time Frame) :
এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সময় ব্যয় হয়েছে এক বছর। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমাপনী পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাচাই-বাছাই করে গবেষণা কর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে এক বছর।

গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study) :
গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার সময় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। দা'ওয়াহ সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ব্যস্ততা, সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে অনীহা তার মধ্যে অন্যতম। সারা বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলেও সেখানে ইসলামি দা'ওয়াহ বিষয়ক তথ্য আশানুরূপভাবে পাওয়া যায়নি। এছাড়া এম.ফিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ শিক্ষার স্তর হওয়ায় বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। যার জন্য

পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আরো বেশি সময় পেলে গবেষণা কর্মটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতো।

তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review) :

আল-কুরআনের পরিচিতি, আল-কুরআনের সূরাসমূহের পরিচিতি, মাক্কি সূরাসমূহের পরিচিতি ও বিষয়বস্তু, ইসলামি দা'ওয়াতের পরিচিতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর কিছু সংখ্যক বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং সামান্য কিছু দিক ও বিভাগ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত *'কুরআন পরিচিতি'* (ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৫) নামক গ্রন্থে আল-কুরআনের পরিচয়, আল-কুরআনের বিষয়বস্তু, আল-কুরআনের আদব ও ফযিলত, ইজাযুল কুরআন, কুরআনের কাহিনী, উলূমুল কুরআন ও কুরআন মাজিদের প্রভাব ও বরকতসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে এ বইটিতে ইসলামি দা'ওয়াতের বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ *'উলূমুল কুরআন'* (রাজশাহী : আল-মাকতাবুতুশ শাফিয়া, ৪র্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১১) নামক গ্রন্থে উলূমুল কুরআনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ, অহির পরিচয়, মাক্কি ও মাদানি সূরা, আসবাবুন নুযুল, নুযুলুল কুরআন, কুরআন সংকলন, নাসখুল কুরআন, ইযাজুল কুরআন, আমসালুল কুরআন, কুরআনে কসম, জাদলুল কুরআন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ., অনূঃ মাওলানা মাহদী হাসান *'কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি–আল-ফাওযুল কাবীর'* (ঢাকা : মক্কা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩) শীর্ষক গ্রন্থে কুরআনে পঞ্চজ্ঞান, কুরআনের সাহিত্যশৈলী বর্ণনাভঙ্গির দরুন উদ্ভূত দুর্বোধ্যতা ও তার সমাধান, কুরআন মাজিদের শব্দ বিন্যাসের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং মনোরঞ্জনকারী আশ্চর্য বর্ণনারীতি, তাফসিরের রীতিনীতি এবং সাহাবা-তাবিঈগণের এ সম্পর্কিত মতবিরোধের ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে সূরাসমূহের পৃথক কোনো আলোচনা এ গ্রন্থে স্থান পায়নি।

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, *'মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি ও কেন'* (ঢাকা : খেলাফত পাবলিকেশন্স, ১৩শ প্রকাশ, ২০১০) বইতে কুরআনের পরিচয়, নাযিলের কারণ, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য, অহির সূচনা, মাক্কি-মাদানি সূরা, কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ, কুরআনের পঠন পদ্ধতির সংস্কার, কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল হওয়ার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ এ বইতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *'ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট'* (ঢাকা : বিআইআইটি, ১ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৬) শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামি দা'ওয়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতির পরিকল্পনাগত উপাদান, ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতির কৌশলগত মৌলিক পদক্ষেপসমূহ, ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তবে দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কি সূরার গুরুত্ব উক্ত বইয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

আব্বাস আলী খান, *'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৭ম প্রকাশ, জুন ২০১১) গ্রন্থে বাংলায় মুসলমানদের আগমন, মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক বাংলার

শাসনকার্য পরিচালনা, বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পটভূমি, ইংরেজদের আক্রমণ ও নবাবের পরাজয়, মুসলিম সমাজের দুর্দশা, মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-দীক্ষা, মুসলিম সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারক ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বাংলায় ইসলামি দা'ওয়াতের বিষয়ে পৃথক কোনো আলোচনা এ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *'বাংলাদেশে ইসলামের আগমন'*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, মে ২০১৩) বইতে ইতিহাসে বাংলাদেশ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করেছেন। এ বইটিতেও বাংলাদেশে ইসলামি দা'ওয়াতের ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো বিষয় আলেঅচিত হয়নি।

মাওলানা মুফতী এমদাদুল্লাহ আনোয়ার, অনূঃ মাওলানা নাজমুল হুদা মিরপুরী, *'জান্নাতের বর্ণনা'*(ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩) গ্রন্থে জান্নাতের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তবে বইটিতে কুরআন তথা মাক্কি সূরার আলোকে জান্নাতের বর্ণনা করার চেয়ে হাদিসের বর্ণনা বেশি স্থান পেয়েছে।

মাওলানা মুফতী এমদাদুল্লাহ আনোয়ার, অনূঃ মাওলানা নাজমুল হুদা মিরপুরী, *'জাহান্নামের বর্ণনা'*(ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪) গ্রন্থে জাহান্নামের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে এ বইটিতেও কুরআন তথা মাক্কি সূরার আলোকে জাহান্নামের আলোচনা করার চেয়ে হাদিসের বর্ণনা বেশি স্থান পেয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন ও গবেষণা পরিকল্পনা (Structure of the Study) :

গবেষণাকর্মের সুবিধার জন্য **দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্বী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা** শিরোনামে এ এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায় ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম ও পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম **গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা**। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামোক্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভূমিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা কর্মের পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি/ব্যাপকতা, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ গঠন/গবেষণা পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম **আল-কুরআন পরিচিতি**। আল কুরআনের পরিচিতি, নাযিলের কারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আল-কুরআন ও আল-হাদিস বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় এ অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। এ অধ্যায়ে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো, আল-কুরআনের সংজ্ঞা ও নাযিলের কারণ, আল কুরআনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আল-কুরআন ও আল-হাদিসের পার্থক্য। উল্লিখিত শিরোনামে বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম **আল-কুরআনের সূরাসমূহের পরিচিতি**। এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের সূরাসমূহের পরিচয় বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। যেসব বিষয়কে এ অধ্যায়ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো, আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা ও বিষয়বস্তু, আল-কুরআনের সূরার নামকরণের কারণসমূহ ও আল-কুরআনের সূরাসমূহের বিশেষ প্রেক্ষাপট। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম **মাক্কি সূরাসমূহের পরিচিতি ও বিষয়বস্তু**। দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কি সূরাসমূহের গুরুত্ব কতখানি তা আলোচনা করার জন্য এ অধ্যায়ে মাক্কি সূরাসমূহের পরিচিতি ও বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ভুক্ত বিষয়গুলো হলো, মাক্কি সূরার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, মাক্কি ও মাদানি সূরার পার্থক্যসমূহ ও মাক্কি সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা। উক্ত শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচনা-পর্যালোচনা করে আরো সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে তদ্‌সংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম **ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পরিচিতি**। এ অধ্যায়ে ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পদ্ধতি ও কৌশল এবং বাংলাদেশে ইসলামি দা'ওয়াহ্ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম **মাক্কি সূরায় ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর স্বরূপ**। অধ্যায়ের উক্ত শিরোনামের অধীনে যেসব বিষয়কে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাহলো− মাক্কি সূরায় ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পদ্ধতি, মাক্কি সূরায় জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর মাক্কি জীবন ও মানব জীবনে এর প্রভাব ও আল-কুরআনে মাক্কি সূরাসমূহ ও মানব জীবনে দা'ওয়াতি কৌশল ও প্রয়োগিক বিশ্লেষণ। উক্ত বিষয়বস্তুকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তোলার জন্য যথাস্থানে তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion) :

উপসংহারে বলা হয়েছে যে, সত্য সুন্দর ও সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামকে উপস্থাপন করা হলে ইসলাম একটি চিরন্তন, সর্বজনীন ও সর্বাধুনিক ধর্ম হিসেবে বিশ্বের দরবারে আজীবন স্বীকৃতি লাভ করবে। প্রকৃত অর্থে আল-কুরআনের মাক্কি সূরাসমূহে নানা পদ্ধতি ও হিকমত অবলম্বন করে ইসলামকে ও ইসলামের রীতিনীতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর উপস্থাপনা শৈলী এবং উপস্থাপনার মাধুর্যতা ও নিপুণতা এতই হৃদয়গ্রাহী যে একজন দা'ঈ যখন এর অনুসরণে মানুষকে আহ্বান করবে প্রত্যেকের হৃদয়েই হযরত উমর রা.-এর মতো ইসলাম গ্রহণের আকর্ষণ অনুভূত হবে। যেমনিভাবে ইসলামি দা'ওয়াতকে সফল করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ সা., সে দা'ওয়াত সফল করা সম্ভব হবে। যার দ্বারা ইসলাম বিরোধীদের মুকাবিলা করা যায়। এটা বর্তমান যুগে সম্ভব কি-না এ ধরনের ধারণা বা সন্দেহ উত্থাপন সঠিক নয়। কারণ অন্যান্য নবীগণের মতো কোন মু'যিজা না থাকলেও সর্বশ্রেষ্ঠ মু'যিজা বর্তমানে মুসলিমগণের মাঝে বিদ্যমান। আর তা হলো আল-কুরআন। এর ভাষাগত, বিষয়গত, আদর্শগত অলৌকিকত্ব ও চ্যালেঞ্জ অদ্যাবধি বিরাজমান। এ মু'যিজা আমাদের মাঝে রয়েছে। হযরত মুসা আ.-এর লাঠি

ছিল সাময়িক। যেমনিভাবে হযরত ঈসা আ.-এর রোগ নিরাময়ের অলৌকিকত্ব ছিল সমসাময়িক কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব সদা বিরাজমান। তাছাড়া মহানবী সা. আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর জীবনের কাজ ও বাণীগুলো আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান। যাকে বলা হয় সুন্নাহ্ ও হাদিস। অতএব আল-কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ করলে সে ধরনের নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই। সুতরাং প্রতি যুগেই যদি আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর একটি অটল জনগোষ্ঠি গঠন করা যায় তবে তাদের মাধ্যমে ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর কাজের সফলতা আসতে পারে। নূন্যতম পক্ষে বলা যায়, এতে প্রয়োজন তাদের জন্য ঈমান, ইজতিহাদ ও জিহাদি চেতনার। ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্কে জানবে, তাঁর আনুগত্য করবে এবং এ আনুগত্যের উপর নিজেকে টিকিয়ে রাখবে। সকলে সৎকাজ করবে, অসৎকাজ থেকে বিরত থাকবে, অন্যকে সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। তাহলেই ইহকালীন জীবনে আসবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আর চূড়ান্ত জীবন আখিরাতে লাভ করবে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে অনন্ত কালের সুখের ঠিকানা জান্নাত।

পরিশিষ্টে গবেষণাকর্মের সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রামাণ্য চিত্রাবলি সন্নিবেশিত হয়েছে। সবশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোগ করা হয়েছে যা দ্বারা শিক্ষার্থী, গবেষকবৃন্দ, মুবাল্লিগ ও দা'ঈগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। এ অভিসন্দর্ভ থেকে জাতি কিংবা কোন ব্যক্তি যদি সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে গবেষকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল-কুরআন পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের সংজ্ঞা ও নাযিলের কারণ

আল-কুরআনুল কারিম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা প্রবাহ এবং ভবিষ্যতের সংবাদপ্রবাহ বিদ্যমান রয়েছে। এটা বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পরে আর কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তাই কুরআনের পর আর কোনো আসমানি কিতাবও মানুষের জীবনব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কুরআন সমগ্র মানবজাতির জীবনপথের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে যাবে। সুতরাং মানব মাত্রই আল-কুরআনের পরিচিতি, কুরআনের শিক্ষা ও কুরআন নাযিলের কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় সঠিকভাবে জীবনকে পরিচালিত করা সম্ভব হবে না। তাই কুরআনের জ্ঞান আহরণ করা মুসলিমগণের ঈমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনের শিক্ষা সম্যকরূপে ধারণ করতে হলে ও তা মানুষের কাছে দা'ওয়াত হিসেবে পেশ করতে হলে প্রথমেই আল-কুরআনের পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন; কেনো নাযিল হলো তা জানা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে কুরআনের সংজ্ঞা ও নাযিলের কারণ উপস্থাপন করা হলো :

আল-কুরআনের সংজ্ঞা

আল-কুরআনকে মোটামুটি তিনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যথা– ক. আভিধানিক খ. পারিভাষিক ও ব্যবহারিক এবং গ. অবয়বগত সংজ্ঞা।

আল-কুরআন-এর আভিধানিক সংজ্ঞা

মুহাক্কিক 'আলিমগণ আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দের বিশ্লেষণে কয়েকটি মত প্রদান করেছেন। কারো কারো মতে, আল-কুরআন শব্দটা মাহমুয বা হামযাযুক্ত। আবার কারো কারো মতে, তা হামযাযুক্ত নয়। আরবি قُرْاٰنٌ শব্দটা قَرَأَ–يَقْرَأُ ক্রিয়ার বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ থেকে মাসদার বা ক্রিয়ামূল। আয-যাজ্জাজের মতে قَرَأَ–يَقْرُأُ ক্রিয়ার বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ এর ক্রিয়ামূল (مصدر)। আল-লিহয়ানির মতে, قَرَأَ يَقْرَأُ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল তিনভাবে হয়ে থাকে : (১) قَرْأٌ (২) قِرَاءَةٌ এবং (৩) قُرْاٰنٌ

এ ক্রিয়াটা মূলে সকর্মক ক্রিয়া (فعل متعدي) হলেও কোন কোন সময় সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশের জন্য এর সাথে অতিরিক্ত একটি ب (বা) হরফ যুক্ত হয়। যেমন قَرَأْتُ الْقُرْاٰنَ (আমি কুরআন পাঠ করেছি), এ একই অর্থে আবার قَرَأْتُ بِالْقُرْاٰنِ (আমি কুরআন পাঠ করেছি) ব্যবহৃত হয়।[১]

---

১ ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ১

قَرْءٌ শব্দটা পাঠ করা এবং একটা বিষয়কে অপর একটা বিষয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করার অর্থও প্রকাশ করে। একটা বর্ণকে অপর একটা বর্ণের সাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হলে তাকে قِرَاءَةٌ (কিরাআত) বলা হয়।[২]

قُرْاٰنٌ পঠিত (مَفْعُوْلٌ = مَقْرُوْءٌ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয় সে গ্রন্থ, যা পাঠ করা হয় তথা পঠিত।[৩]

প্রসিদ্ধ আরবি ভাষাবিদগণের মতে, القُراٰنُ শব্দটি মাছদার। যা قِرَاءَةٌ শব্দের সমার্থবোধক। قُراٰنٌ শব্দটি এর ক্রিয়ামূলের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে বহুল ব্যবহারের কারণে আল্লাহ্‌র বাণী সমষ্টির নাম ধারণ করেছে।[৪]

القُراٰنُ শব্দটি মাছদার, যা ق ر ء ধাতুমূল (মাদ্দাহ্) থেকে উৎকলিত। যেমন বলা হয় قَرَأَ قِرَاءَةً وَقُرْاٰناً- পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-[৫] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه فَإِذَا قَرْأْنَاه فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه

কুরআন (قُراٰنٌ) শব্দটাতে হামযা অক্ষর (قُرْءَانٌ) রয়েছে। কোন কোন ইমাম এটাকে হামযা ছাড়া (قُرَانٌ) উল্লেখ করেছেন। সে অবস্থায় এর অর্থ হবে قَرَنَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ অর্থাৎ কোন একটা বিষয়কে অন্য একটা বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ, বৈয়াকরণ আল-ফাররা ও আবুল হাসান 'আলী ইবন ইসমাঈল আল-আশ'আরি রহ. আল-কুরআনকে হামযা ছাড়া (قُرْانٌ) উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ এটাও বলেছেন যে, আল-কুরআন শব্দটি কুরআন মাজীদের নাম। কুরআন (قُرْانٌ) শব্দটা হামযাযুক্তও নয় এবং অন্য কোন শব্দ হতে গঠিতও নয়; বরং এটা হচ্ছে এমন একটা গ্রন্থ সংকলন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল সা. এর উপর নাযিল করেছেন। তিনি আরও বলেন, কুরআন (قُرْانٌ) শব্দটাকে যদি কিরাআত (قِرَاءَةٌ) ক্রিয়ামূল হতে উদ্ভুত বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে পাঠ করা হয় এমন সব বিষয়কেই

---

২ "قَرَأْتُ الشَّيْءَ قُرْآنًا: جمعته وضممت بعضه بعضا" দ্র. মাজদুদ দীন আল ফিরূযাবাদি, *বাসাইরু যাবিত তাময়িয ফি লাতাইফি কিতাবিল আযিয*(কায়রো : ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, মিশর, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৬ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৬২-২৬৩

৩ আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(কুয়েত : ইসলামি, ওয়াকফ, দা'ওয়াহ্ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, কুয়েত, বিশেষ প্রকাশনা, ১৪৩১ হি., ২০১০ খ্রি.), খ.৩, পৃ. ৪৩; সাইয়িদ মুরতযা আল হুসাইনি আযযাবিদী, *তাজুল 'আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*(কুয়েত : মাতবা'আতু হুকুমাতিল কুয়েত, ১৩৮৫ হি.,), খ.৮, পৃ. ৫২৪

৪ أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ثم نقل من هذا الْمعنى الْمصدري وجعل اسماً للكلام الْمعجز الْمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق الْمصدر على مفعوله، ذلك مما نختاره استناداً إلى موارد اللغة وقوانين الإشتقاق وإليه ذهب اللحياني وجماعة দ্র. মুহাম্মাদ আব্দুল আযিম আয-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী উলুমিল কুরআন*(মদীনা মুনাওয়ারা : দার ইবন আফফান, ১৪১১ হি.), খ.২, পৃ. ১৩-১৪

৫ 'এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।' দ্র. আল কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৮

কুরআন নামে অভিহিত করতে হবে। কিন্তু তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল যেমন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বাণী ছিল, তেমনই কুরআনও আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বাণী।[৬]

আল-আশ'আরির মতে, اَلْقُرْاٰنُ থেকে قَرَنَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ উদ্ভূত। এর অর্থ– একটি বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়েছে। কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ এবং আয়াতগুলো পরস্পরের সাথে সংযোজিত বলে তাকে কুরআন বলা হয়।

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,[৭]

كان الشافعي يهمز "قرأت" ولا يهمز القرآن، ويقول: هو اسم لكتاب الله غير مهموز.

আরবি ভাষাবিদ আল-ফাররা-এর মতে, আল-কুরআন নামটি আল-কারাইন (القرائن) থেকে উদ্ভূত। এটা করীনা (قرينة) এর বহুবচন। এর অর্থ অনুরূপ। যেহেতু কুরআনের একটা আয়াত অপর আয়াতকে সত্যায়ন করে এবং এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে 'কুরআন' কে কুরআন বলা হয়।

জাহিলি যুগে 'আরবগণ কারাআ (قَرَأَ) শব্দটি তিলাওয়াত (تِلَاوَةٌ) অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থেও ব্যবহার করত। যেমন তারা বলত,[৮]

مَا قَرَأَتْ هٰذِهِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ.

প্রাক-ইসলামি যুগের কবি 'আমর ইবন কুলসুমের কবিতায়ও শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:[৯]

تُرِيْكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى خَـلَاءٍ　　وَقَدْ أَمِنْتَ عُيُوْنَ الْكَاشِحِيْنَـا

ذِرَاعِـي عَيْطَلٍ أَدْمَـاءَ بِكْـرٍ　　هِجَـانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِيْنَـا

"শত্রুগণের চোখ এড়িয়ে ঢুকবে যখন সঙ্গোপনে, আমার প্রিয়ার রূপ মাধুরী দেখতে পাবে দুই নয়নে। আমার প্রিয়ার যুগল বাহু দীর্ঘ নিটোল, শুভ্র উজল, কণ্ঠ-দরাজ শুভ্র সতেজ, বন্ধ্যা-উটের জঙ্ঘা যুগল।"[১০]

আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনুস সারি আয যাজ্জাজ, আবুল হাসান 'আলী ইবনুল হায লুগাবী আল-লিহয়ানী প্রমূখ আলিমগণের একটা বৃহৎ দল এটাকে হামযাসহ (قُرْءَانٌ) পাঠ করেন। আয যাজ্জাজের মতে (قُرْءَانٌ) শব্দটা (فُعْلَانٌ) এর সমওযনের। যেমন, فُرْقَانٌ, এবং (قرء)

---

৬ আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৪; আয-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪

৭ 'ইমাম শাফিঈ রহ. "قرأت" শব্দকে হামযা বিশিষ্ট বলেন। কিন্তু কুরআনকে হামযা বিশিষ্ট বলেন না। তার মতে, এটা হামযা বিশিষ্ট নয়। বরং তা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের একটি নাম।' দ্র. বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফি উলূমিল কুরআন*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৪২৭ হি.), পৃ. ১৯৫

৮ 'এ উষ্টীটি কখনো গর্ভবতী হয়নি এবং বাচ্চা জন্ম দেয়নি।' দ্র. আল-ফিরূযাবাদি, *বাসাইরি যাবিত তাময়িয*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৬২-২৬৩

৯ 'নিম্নমানের উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করেনি।' দ্র. আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইবন আহমদ আয যাওযানি, *শারহু আল-মু'আল্লাকাতুস সাব'আ*(বৈরুত : আদ দারুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১১৫

১০ 'আমর বিন কুলথুম, অনূঃ মৌলানা নূরুদ্দীন আহ্মদ, *'অস্-সব্'উ-ল্-মু'অল্লকাত*(ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১ম প্রকাশ, ১৯৭২), পৃ. ১৭৮

হতে উদ্ভূত। এর অর্থ সন্নিবেশ করা। যেমন, পানি হাওজে জমা করা হলে বলা হয়- "قَرَأَ الْمَاءُ فِى الْحَوْضِ" আল লিহয়ানী বলেন, কুরআন (قُرْءَانٌ) শব্দটা হামযা যুক্ত এবং قَرَأَ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল। তাঁর মতে, (قُرْءَانٌ) শব্দটা اَلرُّجْحَانُ، اَلْكُفْرَانُ، اَلْغُفْرَانُ শব্দের সম ওযনের। এটা قَرْءٌ শব্দ হতে গঠিত এবং এর অর্থ তিলাওয়াত বা পাঠ করা। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিক। কেননা, শব্দের বিচারে قُرْءَانٌ শব্দটা ক্রিয়ামূল এবং কিরাআতের সমার্থক। যেমন, কবি হাসসান বিন ছাবিত রা. হযরত উসমান রা. এর স্মরণে বলেন,[১১]

ضَحَّوْا بِأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُّجُوْدِ بِه

يُقَطِّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيْحًا وَقُرْاٰنًا.

মূলত সকল আসমানি গ্রন্থের সারবস্তু এতে জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়।[১২] মূলতঃ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানই কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,[১৩]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,[১৪]

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ.

কুরআন শব্দটি পাঠ করা অর্থে ব্যবহার করে হামযাসহ আল্লাহ্ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন,[১৫]

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه فَإِذَا قَرْأْنَاه فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه.

পবিত্র কুরআনের ৬১ আয়াতে 'কুরআন' শব্দটার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬] কুরআনে ৬৯ বার قُرْاٰنٌ শব্দটার উল্লেখ রয়েছে।[১৭]

আল-কুরআন-এর পারিভাষিক ও ব্যবহারিক সংজ্ঞা

---

১১ হাসসান ইবন ছাবিত রা., *দিওয়ান*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৪ হি., ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৪৪

১২ ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*(বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়ান, ৪র্থ সং., ১১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৪

১৩ 'আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি- মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয় স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ।' আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

১৪ 'কিতাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি।' দ্র. আল কুরআন, ৬ : ৩৮

১৫ এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করবার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।' দ্র. আল কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৮

১৬ ইমাম যাদা হাসানী, *ফতহুর রহমান লি তাবিলিল আয়াতিল কুরআন*(বৈরুত : আল মাতবাতু আল আহ্লিয়্যাহ, ১২২৩ হি.), পৃ. ৩৫৮-৩৫৯

১৭ আল কুরআন, ২:১৮৫, ৪:৮২, ৫:১০১, ৬:১৯, ৭:২০৪, ৯:১১১, ১০:১৫, ৩৭, ৬১, ১২:২, ৩, ১৩:৩১, ১৫:১, ৮৭, ৯১, ১৬:৯৮, ১৭:৯, ৪১, ৪৫, ৪৭, ৬০, ৭৮, ৮২, ৮৮, ৮৯, ১০৬, ১৮:৫৪, ২০:২, ১১৩, ১১৪, ২৫:৩০, ৩২, ২৭ : ১, ২, ৭৬, ৯২, ২৮:৮৫, ৩০:৫৮, ৩৪:৩১, ৩৬:২, ৬৯, ৩৮:১, ৩৯:২৭, ২৮, ৪১:৩, ২৬, ৪৪, ৪২:৭, ৪৩:৩১, ৪৬:২৯, ৪৭:২৪, ৫০:১, ৪৫, ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০, ৫৫:২, ৫৭:৭৭, ৫৯:২১, ৭২:১, ৭৩:৪, ২০, ৭৫:১৭, ১৮, ৭৬:২৩, ৮৪:২১, ৮৫:২১

ইসলামি শারি'আতের পারিভাষায় ও ব্যবহারিক অর্থে 'আল-কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সে মহাগ্রন্থ, যা তিনি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সা. এর উপর নাযিল করেছেন এবং সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক বর্ণনা রীতিতে তা বর্ণিত হয়েছে।' বলা হয়েছে–

أما الكتاب هو القرآن الْمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمكتوب في الْمصاحف الْمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا بلا شبهة.

কিতাব বলতে এমন কুরআনকে বুঝায়, যা রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি নবী কারিম সা.-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির[১৮] পর্যায়ে নিঃসন্দেহভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯]

উক্ত সংজ্ঞায় 'যা রাসূলুল্লাহ্ সা. এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে' বলে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ থেকে কুরআনকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং 'যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে' বলে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ নেই, সেগুলো থেকেও কুরআন মাজিদকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যেমন- ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলোর বিধান বলবৎ আছে; কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। আর 'যা সন্দেহাতীতভাবে তাওয়াতুর পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসছে' সংজ্ঞায় এ শর্তারোপের মাধ্যমে যা এ প্রক্রিয়ায় বর্ণিত নেই সেগুলো থেকেও কুরআন মাজিদকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

এ সংজ্ঞার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, গোটা কুরআনই মুতাওয়াতির পন্থায় প্রমাণিত এবং মুসহাফে উসমানিতে যা আছে তা পুরোটাই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত। কুরআনের কোন অংশই মুসহাফে উসমানি থেকে বাদ পড়ে যায়নি। এটাই গোটা মুসলিম উম্মাহ্র আকিদা ও অকাট্য সত্য।

আল-কুরআনের আরো কতিপয় সংজ্ঞা নিচে প্রদত্ত হলো–

"القرآن هو كلام الله الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الْمتعبد بتلاوته".

'কুরআন মাজিদ আল্লাহ তা'আলার বাণী। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর ইহা অবতীর্ণ। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত।'[২০]

এ সংজ্ঞায় উল্লিখিত শব্দসমূহের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

كلام الله এর মধ্যে كلام শব্দটি সকল প্রকার বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু পরবর্তী শব্দ الله দ্বারা মানুষ, জিন এবং ফেরেশতাগণের কথা কালামের আওতা থেকে বহির্ভুত হয়ে গেছে।

الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم এর মধ্যে الْمنزل শব্দটি আল্লাহপাকের এমন সব কালামকে কুরআন হওয়া থেকে বহির্ভুত করে দেয়, যে সকল কালাম তিনি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট

---

১৮ 'যে বর্ণনার সনদের সকল স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা রচনা বা বলা স্বভাবতই অসম্ভব বলে মনে হয়, এরূপ বর্ণনাকে মুতাওয়াতির বলা হয়।' দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৭০), পৃ. ৪৭

১৯ শাইখ আহমদ মোল্লাজিওন, *নুরুল আনওয়ার*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৭

২০ মান্না খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফি 'উলুমিল কুরআন*(কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬

করে রেখেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার এ ধরনের কালাম সীমাহীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২১]

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه مَدَدًا.

আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২২]

وَلَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّه مِنْۢ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ) শর্ত দ্বারা তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ কুরআনের সংজ্ঞা থেকে বহির্ভুত হয়ে গেছে। যেমন– তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল।

الْمتعبد بتلاوته (এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত) শর্তের প্রেক্ষিতে খবরে আহাদ সূত্রে বর্ণিত কিরাআতসমূহ এবং হাদিসে কুদসি কুরআনের আওতাভুক্ত হওয়া থেকে বহির্ভুত হয়ে গেছে।

মোটকথা আল-কুরআন হলো, আল্লাহ্র কালাম, যার মুকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম, জিবরাঈল আমীন আ.-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর উপর এটি অবতীর্ণ, মুসহাফসমূহে এটা লিপিবদ্ধ মুতাওয়াতির ধারায় এটা আমাদের নিকট পর্যন্ত বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত যার সূচনা সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং পরিসমাপ্তি সূরা নাস-এর মাধ্যমে।

কিতাবুল্লাহর আলোকে কুরআনের সংজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কুরআনের সংজ্ঞায় বলেন,[২৩]

وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الأَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল-কুরআনুল কারিমের গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্টসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তাহলো :

- কুরআন মাজিদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নযিলকৃত।
- আল-কুরআন রূহুল আমিন হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতারিত।
- আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর এজন্য নাযিল হয়েছে, যাতে তিনি তা দ্বারা উম্মতকে সতর্ক করতে পারেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২৪]

  لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ.

- আল-কুরআন স্পষ্ট আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে।

---

২১ 'বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কালাম শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে অনরূপ আরো সমুদ্র আনলেও।' দ্র. আল কুরআন, ১৮ : ১০৯

২২ 'পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র তার সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' দ্র. আল কুরআন, ৩১ : ২৭

২৩ 'আল-কুরআন জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। জিবরাঈল আ. তা নিয়ে অবতরণ করেছেন, আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। এটা নাযিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।' দ্র. আল-কুরআন, ২৬ : ১৯২-১৯৫

২৪ 'রাসূলগণ আসার পর যাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।' দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ১৬৫

হাদীসের আলোকে কুরআনের সংজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ সা. আল-কুরআনুল কারিমের সংজ্ঞায় বলেন,[২৫]

كتاب الله فيه نباء ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، هو حبل الله الْمتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط الْمستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا، يهدى إلى الرشد فامنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

নামের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ্ সা. এর উপর নাযিলকৃত কুরআনকে আল্লাহ্ তা‘আলা স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম ইবন জারির আত-তাবারি রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনকে চারটি নামে উল্লেখ করেছেন।[২৬] সেগুলো হলো- (ক) আল-কুরআন (القرآن)[২৭] (খ) আল ফুরকান (الفرقان)[২৮] (গ) আল কিতাব (الكتاب)[২৯] (ঘ) আয যিকর (الذكر)[৩০]। কুরআনের আরও একটি নাম পবিত্র কুরআনে উক্ত হয়েছে। তাহলো- (ঙ) তানযীল (تَنْزِيْلُ)।[৩১]

পবিত্র কুরআনকে ‘আল-কুরআন’ নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, এটা পাঠ করা হয় এবং এটা বহু আয়াত ও সূরার সংকলন। তাছাড়া এতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও

---

২৫ ‘আল্লাহর কিতাব তাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। তা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ব্যবধানকারী। তাতে অসামঞ্জস্য কিছু নেই। অহংকার বশতঃ যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। যে এটা ভিন্ন অন্য কিছুতে হিদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন। এটা আল্লাহ প্রদত্ত শক্ত রশি। এটা বিজ্ঞপূর্ণ স্মরণিকা এবং একটি সরল-সহজ পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। অন্য কিছু এর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে ‘আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃপুনঃ তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জিনগণ যখন এ কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি। বরং তারা বলে উঠে– আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুসারে কথা বলবে সে সত্যকথা বলবে। আর যে এর অনুসারে ‘আমল করবে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যে এর অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে সে ন্যায়বিচার করবে। আর যে এর প্রতি আহ্বান জানাবে সে সঠিক পথে দিশাপ্রাপ্ত হবে।’ দ্র. আবু ঈসা তিরমিজি, *জামি‘ আত-তিরমিজি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৬৪, হাদিস নং ৪৯০৬

২৬ ان الله ذكره سمى تنزيله الذى انزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة: القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر দ্র. ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারির আত তাবারি, *তাফসির তাবারি*(বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৫ হি.), খ.১, পৃ. ৪৩

২৭ يٰس وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ দ্র. আল কুরআন, ৩৬ : ১-২

২৮ تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِه দ্র. আল কুরআন, ২৫ : ১

২৯ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْه দ্র. আল কুরআন, ২ : ২

৩০ وَاِنَّه لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ দ্র. আল কুরআন, ৪৩ : ৪৪

৩১ وَاِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্র. আল কুরআন, ২৬ : ১৯২

ঘটনাবলি অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,[৩২]

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ.

আল-কুরআনের 'আল কিতাব' নামকরণের কারণ এ যে, এটা একটা লিখিত গ্রন্থ এবং এটাকে যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৩৩]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّه عِوَجًا.

আল-কুরআনকে 'আয-যিকর' নামে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে বিভিন্ন আদেশ-উপদেশ প্রদান করেছেন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব কুরআন হলো বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশনামা। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৩৪]

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ أَنْزَلْنٰهُ.

আল-কুরআনকে 'তানযীল' বলে নামকরণ করা হয়েছে। তার কারণ হলো– তানযীল বলা হয় অল্প অল্প করে নাযিল হওয়া। হযরত মুহাম্মাদ সা. এর উপর ২৩ বছর যাবত ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে বলে একে তানযীল বলা হয়। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৩৫]

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَأَه عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً.

আল্লামা আবুল মা'আলী আযীযী ইবন আব্দুল মালিক রহ. কুরআনের ৫৫টি নামের উল্লেখ করেছেন।[৩৬] কেউ কেউ এর ৯০টি থেকেও অধিক নামের উল্লেখ করেছেন। তবে এগুলো সবই কুরআনের গুণবাচক নাম। যেমন :

১. কুরআন (قراٰن) পঠিত গ্রন্থ : إِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ

২. কিতাব (كتاب) গ্রন্থ : ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ

৩. কালাম (كلام) বাণী : يَسْمَعَ كَلٰمَ اللهِ

৪. নূর (نور) জ্যোতি : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

৫. হুদা (هدى) দিশারি : وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

৬. রহমাহ্ (رحمة) দয়া : وَإِنَّه لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

---

৩২ 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি- ওয়াহ্‌য়ির মাধ্যমে তোমার নিকট এ কুরআন বর্ণনা করে; যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।' দ্র. আল কুরআন, ১২ : ৩

৩৩ 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি।' দ্র. আল কুরআন, ১৮ : ১

৩৪ 'এটা কল্যাণময় উপদেশ, আমি তা নাযিল করেছি।' দ্র. আল কুরআন, ২১ : ৫০

৩৫ 'আর আমি কুরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে, যাতে আপনি তা পর্যায়ক্রমে মানুষকে পড়ে শুনাতে পারেন এবং আমিও তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।' দ্র. আল কুরআন, ১৭ : ১০৬

৩৬ ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ূতী, *আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*(রিয়াদ : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হি.), খ.২, পৃ. ৩৩৬-৩৩৯; আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৪

৭.	ফুরক্বন (فرقان) পার্থক্যকারী :	تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِه
৮.	শিফা (شفاء) আরোগ্য :	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
৯.	মাও‘ইজাহ্ (موعظة) উপদেশ :	قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
১০.	যিকর (ذكر) উপদেশ :	وَاِنَّه لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ
১১.	কারীম (كريم) মর্যাদাপূর্ণ :	إِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ
১২.	আলিয়্যু (علي) মহান :	وَإِنَّه فِىْ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ
১৩.	হিকমাহ্ (علي) প্রজ্ঞা :	حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
১৪.	হাকীম (حكيم) জ্ঞানগর্ভ :	يٰس. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ
১৫.	মুহাইমিন (مهيمن) সংরক্ষক :	مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
১৬.	মুবারক (مبارك) কল্যাণময় :	وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ
১৭.	হাবলুন (حبل) রশি :	وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا
১৮.	সিরাতুম মুস্তাকীম (صراط مستقيم) সঠিক পথ :	وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا
১৯.	ক্বইয়িম (قيم) যথার্থ :	وَلَمْ يَجْعَلْ لَّه عِوَجًا سكتة قَيِّمًا
২০.	ফাছলুন (فصل) মীমাংসাকারী :	إِنَّه لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
২১.	নাবাউন আযীম (نبأ عظيم) মহাসংবাদ :	عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ
২২.	আহসানুল হাদীছ (أحسن الحديث) উত্তম বাণী :	اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا
২৩.	তানযীল (تنزيل) ধীরে ধীরে নাযিল করা :	وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
২৪.	রূহ্ (روح) আত্মা :	وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ط
২৫.	ওয়াহ্য়ি (وحي) প্রত্যাদেশ :	قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ صلى ز
২৬.	মাছানী (الْمَثَانِىْ) বার বার পঠিত :	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ
২৭.	আরাবী (عربي) আরবি :	إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
২৮.	ক্বউলুন (مبين) বাণী :	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ
২৯.	বাছাইর (بصائر) স্পষ্ট প্রমাণ :	قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ
৩০.	বায়ান (بيان) স্পষ্ট বর্ণনা :	هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

৩১.	ইলমুন (مبين) জ্ঞান :	وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
৩২.	হাক্ক (حق) সত্য :	قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ
৩৩.	‘আজাব (عجب) বিস্ময়কর :	إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا
৩৪.	তাযকিরাহ্ (تذكرة) উপদেশ :	إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ
৩৫.	‘উরওয়াতুল উছক্বা (تذكرة) সুদৃঢ় রজ্জু :	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى
৩৬.	মুতাশাবিহুন (متشابه) সামঞ্জস্যপূর্ণ :	كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ
৩৭.	ছিদকুন (متشابه) সত্য :	وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ
৩৮.	‘আদলুন (عدل) ন্যায় বিচার :	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا
৩৯.	ঈমান (إيمان) বিশ্বাস :	سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْإِيْمَانِ
৪০.	আমর (أمر) আদেশ :	ذٰلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهٗ إِلَيْكُمْ
৪১.	বুশরা (بشرى) সুসংবাদ :	وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ
৪২.	মাজীদ (مجيد) সম্মানিত :	ق قف وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ
৪৩.	মুবীন (مبين) সুস্পষ্ট :	الر قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ
৪৪.	বাশীরুন নাযীরুন (بشبر نذير) সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী :	بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ
৪৫.	আযীয (عزيز) মহিমাময় :	وَإِنَّهٗ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ
৪৬.	ক্বফ (ق) ক্বফ, বিচ্ছিন্ন বর্ণ :	ق قف وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ
৪৭.	বালাগুন (بلاغ) বার্তা :	هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ
৪৮.	ক্বছাছ (بلاغ) কাহিনীসমূহ :	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
৪৯.	‘আজীম (عظيم) মহান :	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ
৫০.	বুরহান (برهان) প্রমাণ :	يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
৫১.	বাইয়্যিনাহ্ (بينة) স্পষ্ট প্রমাণ :	بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ
৫২.	মুফাছছাল (مفصل) সুস্পষ্ট :	هُوَ الَّذِىْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا
৫৩.	যিকরা (ذكرى) সদুপদেশ :	وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

৫৪. তাবছিরাহ্ (تبصرة) জ্ঞান : تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ.

৫৫. মুছদ্দিক্ব (مصدق) সত্যায়নকারী : وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৫৬. এক সূরাতে পরপর দু'টি আয়াতে চারটি নাম : فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ.

এগুলো হলো আল-কুরআনের সেসব গুণবাচক নাম, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। হাদিসেও আল-কুরআনের কয়েকটি গুণবাচক নামের বর্ণনা রয়েছে।[৩৭] হাদিসে উল্লিখিত নামগুলো হলো–[৩৮]

১. আন-নাজাহ্ (النجاة) মুক্তি;

২. হাবলুল্লাহিল মাতিন (حبل الله الْمتين) আল্লাহ্‌র শক্ত রশি;

৩. আল মুরশিদ (الْمرشد) সঠিক পথপ্রদর্শক;

৪. আল মু'আদ্দিল (الْمعدل) ভারসাম্য রক্ষাকারী;

৫. আদ দাফি' (الدافع) প্রতিরোধকারী;

৬. ছহিবুল মু'মিন (صاحب الْمؤمن) মু'মিনের সাথী;

৭. কালামুর রহমান (كلام الرحمن) দয়াময়ের বাণী।

কুরআনকে কেন 'কুরআন' বলা হয় এবং এর এরূপ নামকরণের কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো–

(ক) কুরআন বহু আয়াত ও সূরার সমষ্টি;
(খ) পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহিফাসমূহে যে সব শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে তার সার-সংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে;
(গ) এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনাবলি, আদেশ-নিষেধ, অঙ্গীকার, সতর্কিকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যথোচিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে;
(ঘ) কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা শ্রেষ্ঠ সংকলন।[৩৯]
(ঙ) আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। তাই কুরআনকে 'আল-কুরআন' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের নামকরণের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম সবসময়ই 'সংকলন' অর্থটাকে সামনে রেখেছেন। কিন্তু কিছু লোক এটাকে সঠিক বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, القرٰان শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে সূরা আল মুয্‌যাম্মিলে এবং নাযিলের

৩৭ আল-ফিরূযাবাদি, *বাসাইরু যাবিত তাময়ীয*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৮৮-৯৫

৩৮ আবু ঈসা তিরমিজি, *জামি' আত-তিরমিযি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৬৪, হাদিস নং ৪৯০৬

৩৯ আল-ফিরূযাবাদি, *বাসাইরি যাবিত তাময়ীয*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৬৩; আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬

ক্রমানুসারে এটা তৃতীয় সূরা।[৪০] সে সময় এ সকল সূরার কোন সংকলন ছিল না অথবা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের কোন সারসংক্ষেপও এতে ছিল না। অতএব কুরআন নামকরণের সাথে ‘সংকলন’ বা ‘সংগ্রহ’ অর্থের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

তাদের আপত্তির জবাবে এ কথা বলা যায় যে, প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়বস্তু প্রকাশের এক একটি বিশেষ পরিভাষা বিদ্যমান রয়েছে, যা বিশেষ বর্ণনারীতি বা বাকরীতির বৈশিষ্ট্য বহন করে। তদ্রূপ কুরআন মাজিদেরও নিজস্ব একটা বাকরীতি রয়েছে। আর তা অন্যান্য সকল কিছু হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাতে এমন সব বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে, যা এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। তখন তা দ্বারা বর্তমান ধারা অনুসারে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে বলে ধরে নেয়া হয়। অতএব সূরা মুয্যাম্মিলের যেখানে ‘কুরআন’ নামের উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা সে পবিত্র গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ সা. এর উপর নাযিল হতে শুরু করেছে, যা ভবিষ্যতে একটা সংকলনের রূপ লাভ করবে, পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাতে বহু আয়াত ও সূরার সমাবেশ ঘটবে এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার একটা সারসংক্ষেপে পরিণত হবে।

ইবন শিহাব যুহরি রহ. তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন,

لَما جمعوا القرآن فكتبوه فى الورق قال أبو بكر رضي الله عنه التمسوا له اسما. فقال بعضهم السفر وقال بعضهم الْمصحف فإن الحبشة يسمونه الْمصحف وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه الْمصحف.

‘সাহাবিগণ যখন কুরআন একত্রিত করেন এবং কাগজে লিপিবদ্ধ করেন, তখন হযরত আবু বকর রা. তাদেরকে কুরআনের একটা নাম অন্বেষণ করতে বলেন। এতে কেউ কেউ এর নাম আস-সফর (السفر) রাখার এবং কেউ কেউ আল-মুসহাফ (الْمصحف) রাখার প্রস্তাব করেন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণ এ ধরনের গ্রন্থকে আল-মুসহাফ (الْمصحف) বলে আখ্যায়িত করত। হযরত আবু বকর রা.-ই আল্লাহর কিতাবকে প্রথম একত্রিত করেন এবং তিনিই এর নাম রাখেন আল-মুসহাফ (الْمصحف)।’[৪১]

আল-কুরআন-এর অবয়বগত সংজ্ঞা

মুসহাফে উছমানি হতে গ্রন্থবদ্ধ যে কুরআন এখন বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান, এতে ত্রিশটি জুয বা পারা, ৭টি মনযিল বা হিজব, ১৪টি সাজদা, ৫৫৪টি রুকু‘ এবং ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। তবে আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। এ মতভেদের কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ সা. কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াতের শেষে থামতেন, আবার কখনও মিলিয়ে পড়তেন। তাই কেউ কেউ সে সকল আয়াতকে পৃথক গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ মিলিয়ে হিসেব করেছেন। ফলে সংখ্যার এ তারতম্য ঘটেছে। তবে ৬২০০টি আয়াতের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। তাবি‘ঈন, তাব‘উ তাবি‘ঈন এবং অন্যান্য আলিমগণ পবিত্র কুরআনের ৭৭,৪৩৭টি

---

৪০ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً দ্র. আল কুরআন, ৭৩ : ৪

৪১ আস-সুয়ূতি, *আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫১

শব্দ এবং ৩,২৩,৬৭১টি হরফ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকার পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে এভাবে বিভক্ত করেছেন,

●	ওয়াদা সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
●	সতর্কিকরণ ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
●	নিষেধসূচক আয়াত	: ১০০০
●	আদেশসূচক আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
●	উপমাসূচক আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
●	কাহিনীমূলক আয়াত সংখ্যা	: ১০০০
●	হালাল সংক্রান্ত আয়াত সংখ্যা	: ২৫০
●	হারাম সংক্রান্ত আয়াত সংখ্যা	: ২৫০
●	তাসবীহ্ সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা	: ১০০
●	মানসূখ (রহিত) আয়াত সংখ্যা	: ৬৬
	মোট	**: ৬৬৬৬**

তাফসির শাস্ত্রের উলামায়ে কিরাম কুরআনের সূরাসমূহকে অপর চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।[৪২] ভাগগুলো হলো-

১. **আত তুওয়াল (الطوال) :** আত তুওয়াল (الطوال) অর্থাৎ দীর্ঘসূরাসমূহ। এরূপ সূরার সংখ্যা ৭টি। যেগুলো হলো সূরা আল বাক্বারা, আলে ‘ইমরান, আন নিসা, আল মায়িদা, আল আন‘আম, আল আ’রাফ এবং সূরা আত তাওবাহ্সহ আনফাল। কেউ কেউ আত তাওবাহ্ ও আনফালের পরিবর্তে সূরা ইউনুসের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

২. **আল মিঊন (المْئون) :** আল মিঊন (المْئون) অর্থাৎ যে সব সূরায় কমবেশি ১০০ আয়াত রয়েছে। অনুরূপ সূরা হলো সূরা ইউনুস হতে সূরা আল ফাতির পর্যন্ত ২৬টি সূরা।

৩. **আল মাছানী (المْثاني) :** আল মাছানী (المْثاني) সূরা ইয়াসিন হতে সূরা ক্বফ পর্যন্ত ১৫টি সূরা। তবে কারও কারও মতে সূরা ইয়াসিন হতে সূরা হুযুরাত পর্যন্ত। আবার কেউ কেউ বলেন সূরা মুহাম্মাদ পর্যন্ত। এ সূরাগুলোকে মাছানী নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, এ সূরাসমূহে বিশ্বাসীদের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কতৃব্য, কাজকর্মের সীমা-পরিসীমা, কিসসা-কাহিনী এবং উপমাসমূহ বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। তদুপরি আত তুওয়াল ও আল মি‘উনের পরেই এ সূরাসমূহের স্থান।

৪. **আল মুফাছছল (المْفصل) :** আল মুফাছছল (المْفصل) এগুলো পৃথক পৃথক ছোট ছোট সূরা। এসব সূরার শুরুতে বারবার দুই সূরার মাঝে পরিচ্ছেদ স্বরূপ তাসমিয়া এসেছে, তাই সূরাগুলোকে মুফাছছল বলা হয়। মুফাছছল সূরাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। (ক)

---

৪২ قال العلماء رضى الله عنهم: القرآن العزيز أربعة أقسام: الطوال والْمئون والْمثاني والْمفصل. দ্র. আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৪৩ حكى عن سعيد بن جبير أنه عد السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والْمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. দ্র. আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

তুওয়ালুল মুফাছছল বা দীর্ঘ সূরা তথা সূরা ক্বফ হতে আল-মুরসালাত পর্যন্ত সূরাসমূহ; (খ) আউসাতুল মুফাছছল বা মধ্যম দৈর্ঘ্যের সূরা তথা সূরা আন-নাবা হতে সূরা আদ-দুহা পর্যন্ত সূরাসমূহ; (গ) কিছারুল মুফাছছল বা সংক্ষিপ্ত সূরা তথা সূরা আল-ইনশিরাহ হতে নাস পর্যন্ত সূরাগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

আল-কুরআনের একটি বিন্যাস ও বিভাজন : কয়েকটি কালিমার সমন্বয়ে কালাম বা বাক্য গঠিত হয়। কালিমা গঠিত হয় কয়েকটি অক্ষর দিয়ে। আরবি অক্ষর ২৮ বা ২৯টি। আলিফ এবং হামযাকে একটি অক্ষর হিসেব করলে ২৮ আর দুই অক্ষর গণ্য করলে ২৯টি। অক্ষরে অক্ষরে মিলে শব্দ তৈরি হয়। শব্দ অর্থহীনও হয়ে থাকে। কিন্তু কালিমা তাকেই বলে যা অর্থপূর্ণ। এ অর্থপূর্ণ কালিমাসমূহ একটার পর একটা মিলে পূর্ণাঙ্গ অর্থের বাক্য বা কালাম গঠিত হয়। কুরআন মাজিদের রচনাশৈলী তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। পৃথিবীর কোনো ধরনকে দিয়ে তার তুলনা করা যাবে না।

কুরআন মাজিদের বুনিয়াদি একক– আয়াত। একে না বাক্য বলা যায় না অনুচ্ছেদ। ইংরেজিতে তাওরাত ও ইনজিলের রীতি অনুযায়ী ভার্স (Vers) বলা হয়, কিন্তু তা কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কুরআনের আয়াত– তা তার নিজের ধরনে অনন্য– আয়াতকে আয়াতই বলতে হবে। যার আভিধানিক অর্থ– চিহ্ন বা নিদর্শন। কুরআনের প্রতিটি আয়াত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চিহ্ন, নিদর্শন বহন করে। কুরআনের আয়াত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অক্ষরের দ্বারাও গঠিত হয়, যেমন الم। একটি আয়াত। একটি অক্ষর আর একটি শব্দ দিয়েও একটি আয়াত গঠিত হয়। যেমন والعصر ; অর্থপূর্ণ ছোট বাক্য দিয়েও আয়াত গঠিত হয়। যেমন إن الإنسان لفى خسر ; আবার পূর্ণ অর্থের দশটি বাক্যের মাধ্যমেই একটি আয়াত গঠিত হয়। যেমন আয়াতুল কুরসি। এ আয়াতসমূহের পরস্পরিক সম্পর্ক স্থপান ও সংযোজনের ফলে তার তথ্য ও তত্ত্বের অর্থ ও তাৎপর্য ভিন্ন এক মাত্রা সহকারে আত্মপ্রকাশ করে।

ঠিক যেন একটা মুক্তার মালা। প্রতিটি মুক্তারই নিজস্ব একটা রূপ-সৌন্দর্য রয়েছে। স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের অধিকারী অনেকগুলো মুক্তা একটা সুতায় গাঁথলে একটা মালা হয়। তখন তা যেমন একটা ভিন্ন অস্তিত্ব ভিন্ন সৌন্দর্য নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের একটা বস্তু হয়ে যায় ঠিক তেমনি আয়াতসমূহ নিয়ে যে মালা গাঁথা হলো তাকে সূরা বলে। আয়াতসমূহ দিয়ে মালা গাঁথার মধ্যেও একটা ভিন্ন বিন্যাস প্রত্যক্ষ করা যায় বিষয়কে কেন্দ্র করে। যেমন প্রতিটি সূরার মধ্যে যে বক্তব্য, তার একটা চূড়া বা কেন্দ্রিয় বিষয় আছে। কেন্দ্রিয় সেই বিষয়টাকে লকেটের মতো মাঝখানে রেখে দুই পাশ দিয়ে মুক্তা গেঁথে একটা সম্পূর্ণ মালার রূপ প্রদত্ত হয়েছে। যা তখন বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যেমন একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে তেমনি অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকেও হয়ে উঠেছে অনন্য এক বস্তু। এভাবে আয়াতসমূহ মিলে সূরা হয়েছে। এ সূরার সংখ্যা সর্বসম্মত মতে ১১৪টি।

সূরাসমূহের মধ্যে আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে এর অর্থ এবং তাৎপর্যের ক্ষেত্রেও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যেমন একটা মুক্তার মালা গাঁথতে গেলে ছোট বড় মুক্তাকে মালার মধ্যে যে বিন্যাস দেয়া হয় ঠিক সে রকম ভাবে সাজানো।

এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলো রাসূল সা.-এর বলার উপর নির্ভরশীল– তাঁরই নির্দেশিত। এটাকে আরবিতে তাওফিকি (توفيقى) বলা হয়। সূরার বিন্যাসের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার অহির দ্বারাই নিষ্পন্ন। এটা কারো গবেষণার ফসল নয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[৪৪]

সূর (سور) অর্থ প্রাচীর বা দেয়াল। আয়াত (آيت) অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, দৃষ্টান্ত, নমুনা, আদর্শ। প্রতিটি আয়াত যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নিদর্শন সেহেতু প্রতিটা সূরাকে ধরে নিতে হবে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রাচীরঘেরা একটা নগরী। এ সূরা মাত্র তিন আয়াত বিশিষ্টও আছে আবার দুইশত ছিয়াশি আয়াত বিশিষ্টও আছে। যেমন সূরা আল-কাউসার এবং সূরা আল-বাকারা। সাহাবাগণের আমলে সূরাসমূহের আর একটা বিভাজন পাওয়া যায়। তাহলো– কুরআনের মনুযল বা হিজব। সাতটি মনযিল বা হিজবে কুরআন মাজিদ ভাগ করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, যদি এক সপ্তাহে কেউ গোটা কুরআন পাঠ সমাপ্ত করতে চায় তাহলে প্রতিদিন সে এক মনযিল করে পাঠ করবে। সাহাবায়ে কিরাম যেহেতু এভাবে অনুশীলন করতেন নিশ্চয়ই তা রাসূল সা. কর্তৃক অনুমোদিত। সেহেতু এর মধ্যে কুরআনি প্রকৃতির একটা সৌন্দর্যও আছে। বিভাজনের জন্য কোনো কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। কোনো মনযিল একটু বড় কোনো মনযিল একটু ছোট। কিন্তু প্রায় একই রকম। সূরা আল-ফাতিহাকে যদি আলাদা করে গোটা কুরআনের ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে প্রথম মনযিলে ৩টি সূরা, দ্বিতীয় মনযিলে ৫টি সূরা, তৃতীয় মনযিলে ৭টি সূরা, চতুর্থ মনযিলে ৯টি সূরা, পঞ্চম মনযিলে ১১টি সূরা, ষষ্ঠ মনযিলে ১৩টি সূরা এবং সপ্তম মনযিলে রয়েছে ৬৫টি সূরা বিদ্যমান রয়েছে। এ বিভাজন যেন সিড়ির মতো উঠেছে।

আল-কুরআনের মনযিলের বিবরণ : কুরআন মাজিদের ৭টি মনযিলের আওতাভুক্ত ১১৪টি সূরার অবস্থান নিম্নরূপ :

- প্রথম মনযিলে ৩টি সূরা, যথা– ১. সূরা আল-বাকারা, ২. সূরা আলে-'ইমরান ও ৩. সূরা আন-নিসা।
- দ্বিতীয় মনযিলে ৫টি সূরা, যথা– ১. সূরা আল-মায়িদা, ২. সূরা আল-আন'আম, ৩. সূরা আল-আ'রাফ, ৪. সূরা আল-আনফাল ও ৫. সূরা আত-তাওবা।
- তৃতীয় মনযিলে ৭টি সূরা, যথা– ১. সূরা ইউনুস, ২. সূরা হুদ, ৩. সূরা ইউসুফ, ৪. সূরা আর-রা'দ, ৫. সূরা ইবরাহিম, ৬. সূরা আল-হিজর ও ৭. সূরা আন-নহল।
- চতুর্থ মনযিলে ৯টি সূরা, যথা– ১. সূরা বনি-ইসরাঈল (আল-ইসরা), ২. সূরা আল-কাহফ, ৩. সূরা মারয়াম, ৪. সূরা ত্বোয়াহা, ৫. সূরা আল-আম্বিয়া, ৬. সূরা আল-হাজ্জ, ৭. সূরা আল-মু'মিনূন, ৮. সূরা আন-নূর ও ৯. সূরা আল-ফুরকান।
- পঞ্চম মনযিলে ১১টি সূরা, যথা– ১. সূরা আশ-শু'আরা, ২. সূরা আন-নামল, ৩. সূরা আল-ক্বসাস, ৪. সূরা আল-'আনকাবুত, ৫. সূরা আর-রূম, ৬. সূরা লুকমান, ৭. সূরা আস-সাজদাহ্, ৮. সূরা আল-আহযাব, ৯. সূরা সাবা, ১০. সূরা আল-ফাতির ও ১১. সূরা ইয়াসিন।
- ষষ্ঠ মনযিলে ১৩টি সূরা, যথা– ১. সূরা আস-সফ্ফাত, ২. সূরা সোয়াদ, ৩. সূরা আয-যুমার, ৪. সূরা আল-মু'মিন, ৫. সূরা হা মীম আস-সাজদাহ, ৬. সূরা আশ-শূরা, ৭.

৪৪ আয-যারকাশি, *আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৩৮

সূরা আয-যুখরুফ, ৮. সূরা আদ-দুখান, ৯. সূরা আল-জাছিয়া, ১০. সূরা আল-আহক্বফ, ১১. সূরা মুহাম্মদ, ১২. সূরা আল-ফাতহ্ ও ১৩. সূরা আল-হুযুরাত।

- সপ্তম মনযিলে ৬৫ টি সূরা, যথা– ১. সূরা ক্বফ, ২. সূরা আয-যারিয়াত, ৩. সূরা আত-তুর, ৪. সূরা আন-নাজম, ৫. সূরা আল-ক্বমার, ৬. সূরা আর-রহমান, ৭. সূরা আল-ওয়াকি'আহ, ৮. সূরা আল-হাদীদ, ৯. সূরা আল-মুজাদালাহ, ১০. সূরা আল-হাশর, ১১. সূরা আল-মুমতাহিনাহ্, ১২. সূরা আছ-ছফ, ১৩. সূরা আল-জুমু'আহ্, ১৪. সূরা আল-মুনাফিকূন, ১৫. সূরা আত-তাগাবুন, ১৬. সূরা আত-ত্বলাক্ব, ১৭. সূরা আত-তাহরীম, ১৮. সূরা আল-মুলক, ১৯. সূরা আল-ক্বলাম, ২০. সূরা আল-হাক্কাহ্, ২১. সূরা আল-মা'আরিজ, ২২. সূরা নূহ, ২৩. সূরা আল-জ্বিন্ন, ২৪. সূরা আল-মুয্যাম্মিল, ২৫. সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির, ২৬. সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্, ২৭. সূরা আদ-দাহর, ২৮. সূরা আল-মুরসালাত, ২৯. সূরা আন-নাবা, ৩০. সূরা আন-নাযি'আত, ৩১. সূরা আবাসা, ৩২. সূরা আত-তাকভির, ৩৩. সূরা আল-ইনফিতার, ৩৪. সূরা আল-মুত্বফফিফীন, ৩৫. সূরা আল-ইনশিক্বক্ব, ৩৬. সূরা আল-বুরূজ, ৩৭. সূরা আত-ত্বরিক্ব, ৩৮. সূরা আল-আ'লা, ৩৯. সূরা আল-গশিয়াহ্, ৪০. সূরা আল-ফাজর, ৪১. সূরা আল-বালাদ, ৪২. সূরা আশ-শামস্, ৪৩. সূরা আল-লাইল, ৪৪. সূরা আদ-দুহা, ৪৫. সূরা আশ-শরহ, ৪৬. সূরা আত-তীন, ৪৭. সূরা আল-আলাক্ব, ৪৮. সূরা আল-ক্বদর, ৪৯. সূরা আল-বাইয়িনাহ্, ৫০. সূরা আয-যিলযাল, ৫১. সূরা আল-আদিয়াত, ৫২. সূরা আল-ক্বরি'আহ্, ৫৩. সূরা আত-তাকাছুর, ৫৪. সূরা আল-আছর, ৫৫. সূরা আল-হুমাযাহ্, ৫৬. সূরা আল-ফীল, ৫৭. সূরা কুরাইশ, ৫৮. সূরা আল-মা'উন, ৫৯. সূরা আল-কাউছার, ৬০. সূরা আল-কাফিরূন, ৬১. সূরা আন-নাছর, ৬২. সূরা আল-লাহাব, ৬৩. সূরা আল-ইখলাছ, ৬৪. সূরা আল-ফালাক্ব ও ৬৫. সূরা আন-নাস।

উল্লিখিত আভিধানিক, পারিভাষিক সংজ্ঞা ও অবয়বগত কাঠামোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে গ্রন্থচিত্র মানব হৃদয়ে ও স্মৃতিপটে ফুটে উঠে তা-ই হলো আল-কুরআন; মানব জীবনের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ হিদায়াতের সাথী ও আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান। কুরআন মাজিদ আল্লাহ তা'আলার কালাম। মানব জাতির সার্বিক জীবনের পথনির্দেশ প্রদানের জন্য এটা নবী কারিম সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটা তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এ গ্রন্থের শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস, রচনাশৈলী, সুর-মূর্ছনা, ভাব-গাম্ভীর্য, এর অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের রূপরেখা ইত্যাদির মুকাবিলা করতে সর্বকালের ও সর্বযুগের সকল মানুষ অক্ষম ও অপারগ। কুরআন, হাদিস ও মুসলিম মনীষীগণ কুরআন মাজিদের যেসব সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সা. কুরআন মাজিদকে যেসব গুণবাচক নাম দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে যে গ্রন্থচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় সেটাই হলো আল-কুরআনের পরিচয়।

কুরআন নাযিলের কারণসমূহ

কুরআন মাজিদের সূরা ও আয়াতসমূহকে নাযিল হওয়ার দিক থেকে প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা– (ক) কোন কারণ ছাড়াই অবতীর্ণ আয়াত ও (খ) ঘটনা বা জিজ্ঞাসার

পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত। কোন বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা ছাড়াই কুরআন মাজিদের অসংখ্যা আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে এ সকল আয়াত নাযিল করেন। আবার কোন বিশেষ ঘটনা অথবা কোন জিজ্ঞাসার জবাবে কুরআন মাজিদের সূরা বা আয়াত নাযিল হয়েছে। মুফাসসিরগণের পরিভাষায় এ ধরনের বিশেষ ঘটনাকে সাবাবুন নুযুল বা শানে নুযুল বলা হয়।

সাবাবুব নুযুলের পরিচিতি

আরবি 'সাবাব' (سبب) অর্থ কারণ, আর 'নুযুল' (النزول) অর্থ অবতরণ। অতএব 'সাবাবুন নুযুল' অর্থ অবতরণের কারণ। কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে অথবা কোন প্রশ্নের জবাবে আয়াত বা সূরা নাযিল হওয়া নাযিলের কারণ তথা সাবাবুন নুযুল বলা হয়।
সাবাবুন নুযুলের সংজ্ঞায় আল্লামা যারকানি রহ. বলেন,[৪৫]

سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات محدثة أو مبينة لحكمه أيام وقوعه.

'কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর সেই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখ করে বা ঐ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কালে সে ঘটনার হুকুম বর্ণনা করে এক বা একাধিক আয়াত নাযিল হওয়াকে সাবাবুন নুযুল বলা হয়।'[৪৬]

ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিলকৃত আয়াতের উদাহরণ : হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি ছিলাম কর্মকার। 'আস ইবন ওয়ায়িল আমার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে। আমি ঋণ আদায়ের জন্য তাগাদা দিতে তার নিকট গেলাম। তখন সে আমাকে বলল, তুমি মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি কুফুরি এবং লাত ও উযযার পূজা না করা পর্যন্ত আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। তখন আমি বললাম, আমি কুফুরি করব না যতক্ষণ না তোমাকে আল্লাহ মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করেন। তখন সে বলল, আমি কী মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তুমি আমাকে ঐদিন পর্যন্ত সময় দাও। কারণ তখন আমাকে ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হবে। আর আমি তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করব। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন,

أَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا.
كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَه مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. وَّنَرِثُه مَا يَقُوْلُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا.

'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, যে ব্যক্তি আমার বাণীসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং বলেছে, আমাকে অবশ্যই ধনবল ও জনবল দান করা হবে? সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, নাকি দয়ময়ের নিকট থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে? কখনো নয়, সে যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তার শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিবো। আর সে যা বলে তা থাকবে আমার স্বত্বাধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।'[৪৭]

---

৪৫ আয-যারকানি, *মানাহিলুল ইরফান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৮৯

৪৬ মুহাম্মদ 'আলি আস-সাবুনি, *আত-তিবইয়ান ফী 'উলুমিল কুরআন*(দামিশক : মাকতাবাতুল গাযালি, ১৪০১ হি.), পৃ. ২৪

৪৭ আল-কুরআন, ১৯ : ৭৭-৮০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যখন কুরআন মাজিদে আয়াত–

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ.

'আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন' নাযিল হয় তখন নবী কারিম সা. সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে يا صباحاه বলে চিৎকার দেন। তখন লোকেরা তাঁর নিকট সমবেত হয়। তখন তিনি বলেন, আমি যদি তোমাদের এ সংবাদ প্রদান করি যে, এ পাহাড়ের অপরদিকে একদল সৈন্য তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমাক কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে? তারা বলল, আপনি কোনো মিথ্যা কতা বলেছেন এমন অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। আবু লাহাব তখন বলল, تبا لك أنما جمعتنا لهذا؟ 'তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছো? এরপরই সূরা আল-লাহাব নাযিল হয়।[৪৮]

প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নাযিলকৃত আয়াতের উদাহরণ : সাহাবিগণ একবার রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের নিকটে আছেন না দূরে অবস্থান করছেন? তিনি আমাদের নিকটে অবস্থান করলে আমরা তাঁকে গোপনে গোপনে ডাকবো। আর তিনি দূরে থাকলে আমরা তাঁকে জোরে জোরে ডাকবো। তখন কুরআন মাজিদের আয়াত নাযিল হয়,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে করে, তখন আপনি বলে দিন আমি তাদের অতি নিকটে। যখন সে আমাকে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সৎপথের সন্ধান পেতে পারে।'[৪৯]

হযরত মু'আজ ইবন জাবাল রা. একদিন রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদি সম্প্রদায় আমাদের বেষ্টন করে আছে। তারা নবচাঁদ সম্পর্কে আমাদের অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে। নবচাঁদ কেন সূক্ষ্মাকারে প্রকাশ পায় এবং এরপর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পূর্ণ হয়ে গোলাকৃতি লাভ করে, এরপর তা হ্রাস পেতে পেতে পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়?[৫০] তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الاَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۖ.

'লোকজন আপনার নিকট নতুন চাঁদ সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, তা মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য সময়-তারিখ নির্দেশক।'[৫১]

প্রত্যেক আয়াতের নাযিলের কারণ অন্বেষণ কর সঠিক নয়। কেননা ঘটনা, উদ্ভূত পরিস্থিতি বা জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের উপর কুরআন মাজিদের অবতরণ নির্ভরশীল ছিল না। বরং 'আকিদা,

---

৪৮ মান্না' আল কাত্তান, *মাবাহিসু ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৪৯ আল-কুরআন, ২ : ১৮৬

৫০ মুহাম্মদ আলি আস-সাবুনি, *আত-তিবইয়ান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

৫১ আল-কুরআন, ২ : ১৮৯

বিশ্বাস, ব্যক্তি ও সামাজিক বিধি-বিধান এবং শারি'আতের আহকাম সম্বলিত আয়াত বিনা কারণে নিজ থেকেই মহান আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। 'আল্লামা সুয়ূতি রহ. বলেন,

'জাবারি বলেন, আল-কুরআন দুই প্রকারে নাযিল হয়। এক প্রকার হচ্ছে, বিনা কারণে প্রাথমিকভাবেই নাযিলকৃত। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, ঘটনা অথবা প্রশ্নের পশ্চাতে নাযিলকৃত।[৫২]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এ পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তার দায়িত্বে কতিপয় বিধান আরোপ করে সমস্ত সৃষ্ট জীবকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে আসার পর দু'টি কাজ তার জন্য আবশ্যক। (ক) তার চারপাশে যে সব সৃষ্টিকুল রয়েছে তা থেকে উপকার লাভ করা (খ) পৃথিবীর সামগ্রী হতে উপকৃত হওয়ার সময় আল্লাহর বিধানের প্রতি যত্নবান হওয়া। আর সে যেন আদৌ এমন কোন আচরণ না করে যা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এ দু'টি কাজের জন্য মানুষের জ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, এ জগতসমূহের হাকীকত কী এবং কোন বস্তুর কী গুণ, তা থেকে কিভাবে উপকৃত হওয়া যায়। এসব বিষয় জানা না থাকলে জগতের কোন বস্তু থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষ সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে না। এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কী বা তা অর্জনের পদ্ধতি কী? তিনি কোন কাজ পছন্দ করেন আর কোন কাজ অপছন্দ করেন। ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে বস্তুকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যার মাধ্যমে তার উল্লিখিত বস্তুর জ্ঞান অর্জিত হয় নিচের কয়েকটি পদ্ধতিতে-

- মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি অর্থাৎ চক্ষু, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে;
- মানুষের নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনার মাধ্যমে;
- অহির জ্ঞানের মাধ্যমে।

সুতরাং মানুষ অনেক বিষয়ের জ্ঞান ইন্দিয়ের মাধ্যমে আর অনেক বিষয়ের জ্ঞান নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা লাভ করে। যেগুলোর জ্ঞান এ দু'টির মাধ্যমে লাভ সম্ভব হয় না, সেগুলোর জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে অর্জিত হয়। জ্ঞান লাভের এ তিনটি পদ্ধতির মাঝে নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, সীমার বাইরে সেগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয়। সুতরাং যে বস্তুর জ্ঞান মানুষের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে, তার জ্ঞান আকল বা বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে অর্জিত হবে না। যেমন- এ সময়ে আমার সম্মুখে একজন মানুষ উপবিষ্ট আছে। আমি আমার চোখ দ্বারা তা উপলব্ধি করতে পারব যে, আমার সামনে একজন মানুষ বিদ্যমান আছে এবং চোখের মাধ্যমেই অবগত হতে পারব যে, তার বর্ণ ফর্সা, ললাট প্রশস্ত, কালো পাতলা ঠোঁট এবং মুখমণ্ডল গোলাকার। পক্ষান্তরে যদি ইন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রীয় করে বুদ্ধির দ্বারা উক্ত বস্তুগুলোর জ্ঞান লাভ করতে চাই। যেমন– চোখ বন্ধ করে যদি মনে করি এ মানুষের গঠন প্রকৃতি, রং, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক গঠন পদ্ধতি এবং তার আপাদমস্তকের সঠিক রূপরেখা আকল বা বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে জানা যাবে, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমনিভাবে যে বস্তুর জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে অর্জিত হয়

---

৫২ "قال الجعبرى نزول القرآن على قسمين. قسم نزل ابتداء قسم نزل عقب واقعة أو سؤال". আস-সুয়ূতি, *আল-ইতকান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২৮

তা শুধু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। যেমন কোন ব্যক্তির সম্পর্কে আমার জানা আছে যে, তার কোন না কোন একজন 'মা' অবশ্যই আছেন এবং এটাও জানা আছে যে, তাকে কোন না কোন সত্তা সৃষ্টি করেছেন। যদিও 'মা' ঐ সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকেন এবং সৃষ্টিকর্তাকে আমি যদিও দেখিনি। কিন্তু আমার বুদ্ধির মাধ্যমে অবগত হয়েছি যে, নিজে নিজে সে ব্যক্তির জন্ম হয়নি। পক্ষান্তরে যদি আমি আমার বুদ্ধির পরিবর্তে চোখের মাধ্যমে তা অর্জন করতে চাই তাহলে তা সম্ভব নয়। কেননা, তার সৃষ্টি এবং জন্মের দৃশ্য আমার চোখের সামনে আসা অসম্ভব।

সাধারণ মুফাসসিরগণ বিধি-বিধান সম্বলিত ও তার্কিক আয়াতসমূহকে একেকটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। আর তাঁরা ঐ ঘটনাকেই সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের নাযিলের একমাত্র কারণ বলে মত প্রকাশ করেন। অথচ পবিত্র কুরআন নাযিলের মূল লক্ষ্যই হলো প্রধানত তিনটি। যথা :

(١) تهذيب النفوس البشرية، (٢) ودمع العقائد الباطلة، (٣) ونقي الأعمال الفاسدة.

(১) মানবাত্মার সংশোধন (২) বাতিল 'আকিদার মূলোৎপাটন (৩) ভ্রান্ত আমলের মূলোচ্ছেদ।[৫৩]

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,[৫৪]

الر ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۙ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

এছাড়া কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-[৫৫]

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِه وَمَنْ بَلَغَ.

তাই বলা যায় যে, কুরআনের বিভিন্ন ধরনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহর বিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বান্দাদের মনে পুঞ্জিভূত ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই তার্কিক আয়াতসমূহ (آيات الجدال) নাযিল হয়েছে। কুসংস্কার ও কুকর্ম ও সমাজে জুলুম-নির্যাতন বিদ্যমান থাকার কারণে বিধি-বিধান সম্পকৃিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি, তাঁর সুনিপুন সৃষ্টি রহস্য, পূর্ববর্তী জাতির পুরষ্কার-পরিণামের ইতিহাস, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী জগতের ব্যাপারে অসচেতনতা ও উদাসীনতার কারণেই উপদেশমূলক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে তাফসিরকারগণ কুরআন নাযিলের কারণ হিসেবে যেসব বিশেষ কারণ ও ঘটনাবলীর অবতারণা করেছেন, তাফসিরের ক্ষেত্রে এসবের উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যকারিতা নেই। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু আয়াতে আবার সেসবের গুরুত্ব রয়েছে। যেসব আয়াতে নবী

---

৫৩ শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., অনূঃ মাওলানা মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা, *আল ফাউযুল কাবির*(ঢাকা : মক্কা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৩), পৃ. ১৬

৫৪ 'আলিফ-লাম-রা। একটা মহাগ্রন্থ, যা আমি আপনার উপর নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন; মহাপরাক্রমশালী, বিপুল প্রশংসার অধিকারী সত্তার পথে।' দ্র. আল কুরআন, ১৪ : ১

৫৫ 'এ কুরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারি।' দ্র. আল কুরআন, ৬ : ১৯

কারিম সা.-এর যুগের বা তাঁর পূর্বের কোনো ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আর সে ইঙ্গিতের ফলে শ্রোতার মনে জানার যে, আগ্রহ সৃষ্টি হয় তা বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া সে চাহিদা পূরণ হয় না। তাই সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতের খুঁটিনাটি ব্যাপার ও ঘটনাবলি সম্বলিত নাযিলের কারণ বিস্তারিত জানা অত্যাবশ্যক।

নাযিলের কারণ জানার পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন নাযিলের কারণ উপলব্ধি করা কখনো ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা বা জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে সম্ভব নয়। সাবাবুন নুযুল জানার একমাত্র মাধ্যম হলো, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সহিহ হাদিস এবং বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত সাহাবিগণের উক্তি। কেননা সাহাবিগণ যখন আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন তখন তা মারফূ‘[৫৬]-এর অন্তর্ভুক্ত।[৫৭] প্রখ্যাত তাবি‘ঈ মুহাম্মদ ইবন সিরিন রহ. বলেন,

سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال: اتق الله وقل سدادا. ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن.

‘আমি আবিদাহ র.-কে কুরআন মাজিদের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং ঠিকঠিক বলো। কেননা ঐ সকল ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছেন যারা কুরআন নাযিল হওয়ার কারণ জানতেন। তিনি এর দ্বারা সাহাবিগণকে বুঝিয়েছেন। সাহাবিগণ কোনো আয়াত সম্পর্কে যদি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে,[৫৮] سبب نزول هذه الآية كذا وكذا এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ এই এই, তবেই তা গ্রহণ করা যাবে।’

আল্লামা সুয়ূতি রহ.-এর মতে, ‘তাবি‘ঈ যদি কোনো আয়াতের সাবাবুন নুযুল সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেন তবে তা শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। শর্ত এই যে, মুরসাল হাদিসের সনদ সহিহ হতে হবে।[৫৯] তাকে তাফসির শাস্ত্রের এমন ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা সাহাবিগণ থেকে তাফসিরের জ্ঞান অর্জন করেছেন। যেমন– মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইবন জুবাইর রহ.। এ ছাড়া অপর মুরসাল হাদিস দ্বারাও সে বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যেতে হবে।’[৬০]

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবতার কল্যাণে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সা. প্রদর্শিত জীবন বিধান সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে লাওহি মাহফুয থেকে আরবি ভাষায় নাযিলকৃত গ্রন্থই হচ্ছে আল-কুরআন। আর এ কুরআনের বিধান অনুসারে মানব জীবন পরিচালনা করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্যই এ কুরআনকে নাযিল করা হয়েছে।

---

৫৬ ‘যেসব হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে সূত্রের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলের কোনো কথা, কোনো কাজ করার বিবরণ কিংবা কোনো বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, যে সনদের ধারাবহিকতা রাসূলে কারিম সা. হতে হাদিস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়েছে এবং মাঝ থেকে একজন বর্ণনাকারীও উহ্য হয়ে যায়নি, উসূলে হাদিসের পরিভাষায় তা-ই মারফূ‘ হাদিস নামে পরিচিত।’ দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৭), পৃ. ৪৪

৫৭ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৫৮ মুহাম্মদ আলি আস-সাবুনি, *আত-তিবইয়ান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৫৯ ‘যে হাদিসে বর্ণনাকারীদের সূত্রের শেষদিকে কোনো বর্ণনাকারীর নাম তথা কোনো সাহাবির নাম বাদ পড়ে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।’ দ্র. ড. সুবহি সালিহ, *‘উলুমিল হাদিস ওয়া মুসতালাহাতুহু ‘আরদুন ওয়া দিরাসাতুন*(বৈরুত : দারুল ‘ইলম লিল মালায়িন, জানুয়ারি ১৯৮৪), পৃ. ১৬৬

৬০ আস-সুয়ূতি, *আল-ইতকান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআন নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আল-কুরআন নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানার পূর্বে আইয়ামে জাহিলিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আইয়াম শব্দের অর্থ সময় বা যুগ এবং জাহিলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা। সুতরাং আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে 'অজ্ঞতার যুগ' বা 'তমসার যুগ' বুঝায়। সে যুগে আরবে কোন প্রকার কৃষ্টি ছিল না, এ কথা বলা যায় না। বর্তমান যুগের মত কোনো প্রকার সুষ্ঠু শিক্ষাপদ্ধতি আরবে প্রচলিত না থাকলেও বাগ্মিতা ও কাব্যচর্চার জন্য আরববাসী বিখ্যাত ছিল। তাদের আরবি ভাষা সে যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। এ সময়, 'আরবদের ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবন আদিম অবস্থায় ছিল।'[৬১]

নীতিবোধ ও মানবতাবোধের অভাবে তাদের সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিল। অজ্ঞতার যুগে আরবরা জঘন্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলো। কলহ-বিবাহ, খুন-জখম, অন্যান্য-অবিচারের অন্ধকারে সমগ্র আরববাসী নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সুস্থ ও সুন্দর জীবন-যাত্রা এবং সুশৃঙ্খল, সুসংহত শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। 'সাধারণভাবে 'জাহিলিয়া' শব্দের অর্থ অজ্ঞতার বা বর্বরতার যুগ বুঝায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সে যুগকেই বুঝায়, যে যুগে আরবে কোন নিয়ম-কানুন ছিল না, কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি এবং কোন ঐশী কিতাব নাজিল হয়নি।'[৬২] তবে, কোন প্রকার প্রামাণ্য দলিলপত্র না থাকায় কথখন এবং কার সময় এ অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত আদম আ. এর সৃষ্টিকাল হতে শুরু করলে হযরত মুহাম্মাদ সা. এর নবুওয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত এ দীর্ঘ যুগকে 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা অন্ধকারের যযুগ বলা হয়। এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ সুদীর্ঘ যুগে মানুষকে হেদায়েত করার জন্য এবং তাদেরকে সৎপথে চালিত করার উদ্দেশে অনেক নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

আরব ঐতিহাসিকদের মতে– হযরত ঈসা আ.-এর তিরোধানের পর হতে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কালকে 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা তমসার যুগ বলা হয়। এ অভিমতকে আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি না।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক নিকলসন ইসলামের আবির্ভাব কালের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকালকে তমসার যুগ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৩] ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টিও এ মতবাদকে সমর্থন করেন। এ অভিমতটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিলো বলে একে তমসা বা অন্ধকার হতে পারে না; এটা

---

৬১ 'The religion of the Arabs as will as their political life was on a thoroughly primitive level.' Cf. J. Wellhausen, Translated by Margaret Graham Weir, *The Arab Kingdom and its Fall*(Calcutta : The Calcutta University Press, 1927), p. ix

৬২ 'The term jahiliyah, usually rendered `time of ignorance` or berbarism in reality means the period in which Arabia had n dispensation, no inspired prophet, no revealed book.' Cf. Philip K. Hitti, *History of the Arabs History of the Arabs*(Palgrave Macmillan : ST Martinis Press, 10th ed. 1972), p. 150

৬৩ Reynold A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*(New York : Charles Scribner's Sons, 1907), p. 30

শুধু হিজায, নাজদ ও নাফুদ এলাকার বেলায়ই সত্য। অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এ এলাকার অধিবাসীরা সাধারণভাবে তখন পর্যন্ত সমাজ-সভ্যতার আদিম স্তরেই থেকে গিয়েছিলো।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট : তমসার যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা অতীব শোচনীয় এবং নৈরাশ্যজনক ছিলো। রোমান ও পারসিক শাসিত উত্তরাঞ্চলের সামান্য অংশ ব্যতীত সমগ্র আরব স্বাধীন ছিলো। শহরবাসী আরবগণের রাজনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল থাকলেও মরুবাসী আরবগণের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও নৈরাজ্যজনক ছিলো। আরবে তখন আইন-কানুনের বালাই ছিলো না। কেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সমগ্র আরব শত সহস্র গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্র-শাসনই ছিল আরবের রাষ্ট্রীয় শাসনের মূলভিত্তি। প্রত্যেক গোত্রের একজন করে দলপতি থাকতো। সাহস, বুদ্ধি, আর্থিক অবস্থা, পদ মর্যাদা এবং অভিজ্ঞতা বিচার করে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলপতি নির্বাচন করতো। শেখের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেও তারা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে রাজি ছিলো না। কাজেই শেখ তার দলের লোকদেরকে শাসনের পরিবর্তে প্রশ্রয়ই দিতেন বেশি। একই গোত্রের লোকদের পরস্পরের মধ্যে মিল-মহব্বত ছিলো। কিন্তু ভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ছিলো। বস্তুত হযরত ঈসা আ.-এর সময় হতেই আরবগণ পরস্পরের শত্রুতা সাধনে লিপ্ত ছিলো। দলের বা গোত্রের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত ছিলো না। সামান্য কোনো অজুহাতেই গোত্রে গোত্রে ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনা হত। 'রক্তের বদলে রক্ত' এটাই ছিল গোত্রযুদ্ধের মূল কারণ।

বিভিন্ন গোত্রের চারণ কবিরা বীর ও ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা দ্বারা এবং রণরঙ্গিনী নারীরা বীররসাত্মক সঙ্গীত গেয়ে সংগ্রামরত যোদ্ধাদেরকে উত্তেজিত এবং উৎসাহিত করতো। ফলে যুদ্ধ ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হতো। এরূপে মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এবং মক্কার কুরাইশ এবং হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'হারবুল ফিজর' বা 'ফিজরের যুদ্ধ' ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়েছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আরবের এ তমসা যুগে কোন রাষ্ট্র পরিচালক না থাকায় আরববাসীগণ অকারণে ঐসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতো। দীর্ঘকালব্যাপী এসব কলহ-বিবাদ 'আইয়ামে আল-আরব' বা আরবের দিন নামে পরিচিত।[৬৪]

মক্কা ও এর শহরতলী এলাকায় প্রাগ্রসর রাজনীতির উন্মেষ দেখা যায়। বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে এখানে ক্রমে এক নগররাষ্ট্রের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন কুরাইশ গোত্রপতিদের দিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রণা-পরিষদ এর প্রশাসন ব্যবস্থা তদারক করতো। এ পরিষদ কুরাইশ গোত্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিক দিয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতো এবং স্বীয় স্বার্থে এলাকার বেদুইন গোত্রগুলোর সাথে একটি মৈত্রী জোটও গঠন করেছিলো।

সামাজিক প্রেক্ষাপট : তমসাযুগে আরবের সামাজিক অবস্থা অতীব শোচনীয় থাকলেও আরব চরিত্রে কতকগুলো মহৎগুণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিলো। আরবেরা সততা, সরলতা, উদারতা, আতিথেয়তা, স্বাধীনতা-প্রীতি, কাব্যপ্রীতি ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ছিল। কিন্তু ঐসব গুণের চেয়ে তাদের দোষের পরিমাণ ছিলো অনেক বেশি। পাপাচার, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার আরবের সামাজিক জীবন কলুষিত করেছিলো। মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ ব্যবসায় যে কত আরববাসীকে সর্বস্বান্ত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক খোদা

---

৬৪ Joseph Hell, Translated by S. Khudah Bakhsh, *The Arab Civilization*(Lahore : Shaikh Muhammad Ashraf Press, 1943), p. 10

বখশ বলেন, 'War, woman and wine were the three absorbing passions of the Arabs. Arabia, as Muhammad found it, was steeped in ignorance, berbarism and fetishism of the worst tipe.'[৬৫]

কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া : সে যুগে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ করা আরববাসীদের নিকট অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার ছিলো। অনেক পিতা লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং অনেকে আবার দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। পবিত্র কুরআনে এজন্য সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে– 'দারিদ্র্যের ভয়ে তুমি তোমার সন্তানদেরকে হত্যা করো না। এটা মহাপাপ। আমি তোমার ও তাদের জীবিকা সরবরাহ করে থাকি।'[৬৬] কিতাবুল আগানির মতে এ জঘন্য প্রথা কায়েস বিন আসিম নামে জনৈক ব্যক্তি প্রথম প্রবর্তন করে। কায়েস মহানবী সা.-এর সমসাময়িক ছিলো। যদিও গোত্রীয় সমাজে শিশু হত্যার প্রথা বিশ্বের অন্যত্রও বিদ্যমান ছিলো।

আরবের তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সাধারণ আরববাসীরা ছিলো বেদুইন এবং সমাজ ব্যবস্থা ছিলো অসংখ্য স্বশাষিত গোত্রের সমষ্টি। ক্রমে ক্রমে মক্কা, মদিনা, তায়েফ প্রভৃতি স্থানে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠে। এ দুই শ্রেণির আরবদের জীবনযাত্রারও একটা পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করে। ওয়াটের মতে, বসতি এলাকায় গোত্রবন্ধনে শিথিলতা দেখা দেয় এভং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ঘটে। ফলে, পারিবারিক জীবনেও পরিবর্তন সাধিত হয়। মক্কা প্রভৃতি বসতি এলাকায় মাতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার স্থলে পিতৃ-প্রধান পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্যত্র এ পরিবর্তন তত কার্যকর ছিলো না। এর ফলে তখনকার আরবদেশে একই সাথে পুরুষ ও মেয়েদের বহু বিবাহ প্রথা দেখা দেয়। এরূপ নৈরাজ্যজনক অবস্থায় মেয়েদের অধিকার ও মর্যাদা স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। পতিতাবৃত্তি সমাজে স্বীকৃতি পায়। বিষয় সম্পত্তিতে নারীর অধিকার লোপ পেতে থাকে। তবে তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিলো, এই কথা সর্বাঙ্গীনভাবে সত্য নয়। বিবি খাদিজা ও আবু জেহেলের মাতা দু'জনই সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন।[৬৭]

দাস-দাসীর অবস্থা : তৎকালীন অন্যান্য সমাজের ন্যায় আরব সমাজেও দাসপ্রথা ছিলো। পণ্যসামগ্রীর মতো দাস-দাসীও হাটে-বাজারে বিক্রি হতো। তাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে আমীর আলী বলেন, 'ভৃত্যই হোক আর ভূমিদাসই হোক তাদের ভাগ্যে ক্ষীণ আশা বা এককণা সূর্যরশ্মিও কবরের এদিকে অর্থাৎ ইহজীবনে জুটতো না।' প্রভুরা তাদেরকে খেয়াল-খুশিমত অত্যাচার করতো। তারা কখনো বা দাসীদেরকে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতো। বিবাহেও তাদের কোনো প্রকার স্বাধীনতা ছিলো না। তখনকার দিনে দাস-দাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিলো।

---

৬৫ Joseph Hell, Translated by S. Khudah Bakhsh, *The Arab Civilization*, Ibid, p. 10

৬৬ আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

৬৭ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca*(London : Oxford University Press, 1953), p. 35

ব্যভিচার ও কুসংস্কার : স্বভাবতই নৈতিক চরিত্র বলতে তাদের কিছুই ছিলো না। মদ্যপান, জুয়াখেলা, অবিচার-অত্যাচার, লুণ্ঠন, নরবলি ইত্যাদি তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো। তারা এত বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলো যে, তারা কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তীরের সাহায্যে দেবমূর্তির সাথে পরমর্শ করতো। আরবের মত নৈতিক ও সামাজিক অবনতি সমকালীন বিশ্বের কোথাও পারলক্ষিত হতো না। আভিজাত্যের দম্ভ, আত্মম্ভরিতা, পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি জাহেলিয়া যুগে আরব চরিত্রকে ভীষণভাবে কলুষিত ও কলঙ্কিক করে তুলেছিলো। তবে এসব দোষ-ত্রুটিকে আরব জাতীয় চরিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করা কঠিন হবে না। এগুলো সমাজ বিকাশের পর্যায় বিশেষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিলো।

ধর্মীয় প্রেক্ষাপট : হযরত ইবরাহিম আ. এবং দীর্ঘ যুগ পরে হযরত ঈসা আ. মানব সমাজে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করে প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঈসা আ.-এর উর্ধাকাশে উত্তোলনের পরে আরব জাহান আবার পৌত্তলিকতায় ফিরে যায়। তাদের ধর্মীয় জীবন তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

জাহেলিয়া যুগে আরবে মোটামুটিভাবে চার প্রকার ধর্মাবলম্বী লোক বাস করতো– ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, প্রকৃতি-পূজক মূর্তি উপাসক আরববাসী এবং হানিফ সম্প্রদায়। ইহুদিগণ অজ্ঞানতাবশত জেহোবাকে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মনে করতো। অপরপক্ষে, খ্রিস্টানরা এক খোদার পরিবর্তে 'ত্রিত্ববাদে' বা তিন খোদায় বিশ্বাসী ছিলো। তাদের মতে আল্লাহর স্ত্রী ছিলেন বিবি মরিয়ম (মেরি) এবং ঈসা আ. ছিলেন আল্লাহর পুত্র। ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম আরবের নৈতিক ও পার্থিব অবস্থার উপর কোনো প্রকার মঙ্গলজনক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বাকি সমগ্র আরববাসী ছিলো মূর্তি উপাসক ও প্রকৃতি পূজারী। তারা ইচ্ছানুযায়ী দেব-দেবী প্রস্তুত করে সেগুলোর পূজা করতো। তারা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রস্তরখণ্ড এবং বৃক্ষরাজিরও পূজা করতো। ভূত-প্রেতাদি এবং অশরীরী প্রাণীর উপরও তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিলো। যে কাবাগৃহ হযরত ইবরাহিম আ. একমাত্র আল্লাহপাকের উপাসনার জন্য নির্মাণ করেছিলেন, সে গৃহে পৌত্তলিক আরববাসী কালক্রমে ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করেছিলো। তারা হযরত ইবরাহিম আ., হযরত ইসমাঈল আ., হযরত ঈসা আ. এবং হযরত মরিয়ামের মূর্তিও কাবাগৃহে স্থাপন করেছিলো। প্রতি বছর তারা ঐসব দেব-দেবীকে অর্ঘ দিতে আসতো এবং দেবতার মনস্তুতির জন্য নরবলী দিতো এবং এ উপলক্ষে সেখানে 'ওকাজ মেলা' নামে এক বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হতো। মক্কার পূর্বদিকে নাকলাস্থ তিনটি গাছের সমন্বয়ে গঠিত দেবতা আল-উজ্জাহ, তায়েফের চতুষ্কোণবিশিষ্ট পাথরের দেবতা আল-লাত, মক্কা ও মদিনার মধ্যে কুডাইডে অবস্থিত কালো পাথর বিশিষ্ট ভাগ্য-দেবতা আল-মানাহ, মেসোপটেমিয়া হতে আমদানিকৃত মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট ও কা'বায় স্থাপিত দেবতা হুবল, নসর (শকুনাকৃতি পাখি) এবং আউফ (মহান পাখি) দেব-দেবীর মধ্যে আরববাসীর নিকট সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ছিলো। তারা আল্লাহর একত্ববাদ, আত্মার অবিনশ্বরতায় এবং কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করতো না। মৃত্যুকেই তারা জীবনের সমাপ্তি বলে মনে করতো। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন- 'তোমরা একটা ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় বিরাজ করেছিলে।'[৬৮]

---

৬৮ আল-কুরআন, ৩ : ১০৩

এ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও আরবের মদিনা নগরীতে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয়-জীবন যাপন করতেন এবং কোনো প্রকার মূর্তি পূজায় অংশগ্রহণ করতেন না। পৌত্তলিক আরবে তারা 'হানিফ' নামে পরিচিত ছিলেন। বিবি খাদিজা রা.-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফেল, উমাইয়া বিন আবি সালত, আউস বিন সাওদাহ, কবি যুহাইর প্রমুখ বিশিষ্ট আরববাসী ছিলেন একেশ্বরবাদী হানিফ (ধর্মনিষ্ঠ)।

আরবের তথা সমগ্র বিশ্বের নৈরাশ্যজনক ধর্মীয় অবস্থা কোনো এক ঐশ্বরিক আবির্ভাবের পূর্বাভাস সূচনা করেছিলো। এখানে ঐতিহাসিক আমির আলি যথার্থভাবে মন্তব্য করেন–

'এর পূর্বে বিশ্বের ইতিহাসে কখনও একজন মহান ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের সময় ও প্রয়োজন এত বেশি অনুভূত হয়নি।'[৬৯]

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট : মরুময় আরব উপদ্বীপের অনুর্বর জমি কৃষিকাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিলো। সামান্য যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হতো প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিলো অত্যন্ত অপ্রতুল। বেদুঈন আরববাসীদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিলো। পশুচারণ করে এবং লুণ্ঠন চালিয়ে তারা কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করতো। ১০০০-এর উপরে তাদের কোনো সংখ্যা ছিলো না। এ থেকে বুঝা যায় যে তারা কিরূপ দরিদ্র ছিলো। জাহেলিয়া যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে ইয়াহুদিরা সুদের ব্যবসা করতো। সুদের কারবারের নিয়মাবলী ছিলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও জটিল। সুদ অনাদায়ে খাতকের অর্থাৎ সুদ গ্রহণকারীর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা দাস-দাসী হিসেবে কুসীদজীবী মহাজনের হাতে চলে যেতো। পৌত্তলিক আরবে কারিগরদের অর্থাৎ যারা মূর্তি তৈরি করতো তারা আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিলো এবং সমাজে উচ্চ পদমর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলো। হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত উসমান রা.-এর ন্যায় অবস্থা ও পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা এবং অন্যান্য শহরবাসী আরবগণ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে সচ্ছল অবস্থায় কালাতিপাত করতেন। ধর্মীয় গুরুত্ব, বিশেষ করে ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিলো তখন পশ্চিম এশিয়ার সমৃদ্ধতম নগরী। মক্কার বণিক সম্প্রদায় এশিয়ার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার স্থল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিলো। বাণিজ্য পথে তাদের ছিলো নিরঙ্কুশ আধিপত্য। ক্রমে হিজাযের প্রায় সকল গোত্র এ বাণিজ্যের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত হয়। মক্কায় ব্যাংক স্থাপিত হয়, মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়ক হিসেবে নিকাশঘর এর আবির্ভাব ঘটে। মদিনাও এ সমৃদ্ধ ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। এর ফলে হিজাযের জনসাধারণের একটা অংশ স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিলো। তবে এরূপ ধনী লোকের সংখ্যা সমগ্র আরবের জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্যই ছিলো।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট : 'আরববাসীরা নিরক্ষর ও মূর্খ হলেও তারা তাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বাগ্মিতা এবং কবিতা চর্চায় মনন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলো।'[৭০] কিন্তু তাদের কবিতার বিষয়বস্তু

---

৬৯ 'Never in the history of the world was need so great, the time so ripe, for the appearance of a Deliverer.' Cf. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*(London : Macmillan and Co. Limited, 1916), p. 5

ছিলো নারী প্রেম, বংশ গৌরব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলি। কবিরা তাদের অশ্লীল কবিতার মাধ্যমে সমাজে সর্বপ্রকারের অনর্থও ঘটাতো। সমাজে কবিদেরকে 'অতিমানব' হিসেবে মর্যাদা দেয়া হলেও তাদের কবিতায় মৌলিক চিন্তাধারার অভাব পরিলক্ষিত হতো। প্রাক-ইসলামি যুগের কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ইমরুউল কায়েস, তারাফাহ ইবনুল আবদ, যুহাইর ইবন আবি সুলমা, লবিদ ইবন রবি'আহ আমিরি, আমর ইবন কুলছুম, আনতারাহ ইবন শাদ্দাদ ও হারিস ইবন হিল্লিযাহ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল-মু'আল্লাকাত, দিওয়ানুল হামসা এবং কিতাবুল অগানী নামক গ্রন্থের মাধ্যমে জাহেলিয়া যুগের গীতিকাব্যসমূহ সংরক্ষিত করা হয়েছে।

তাদের কবিতার বিষয়বস্তু যতই জঘন্য হোক না কেনো তাদের কবিতার মাধ্যমে আমরা জাহিলিয়া যুগের আরব সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। আরবরা যে নির্ভীক বীর, অতিথিবৎসল ও পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলো এবং মৃত্যুভয়ে কাপুরুষদের মতো ভীত ছিলো না– সেগুলো সম্বন্ধেও আমরা তাদের কবিতাবলি থেকে অবগত হতে পারি। সেজন্য ঐসব কবিতাকে 'দিওয়ানুল আরব' তথা Public Register of the Arabs বলা হয়। আর তাদের আরবি ভাষাও জাহিলিয়া যুগে খুব সমৃদ্ধশালী ছিলো এবং বর্তমানের ইউরোপের যে কোনো উন্নত ভাষার সাথে তাকে তুলনা করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক হিট্টি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন :

'মধ্যযুগে বহু শতাব্দিকাল পর্যন্ত আরবি ভাষা সভ্যজগতের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং উন্নতির একমাত্র মাধ্যম ছিলো।'[৭১]

আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে ওকাজ মেলার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। প্রত্যেক বছর এখানে সাহিত্য প্রতিযোগিতাও হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতা কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এরূপ সাতটি কাবিতা উমাইয়া আমলে সংকলিত হয়। কবিতাগুলো সমগ্র আরবি সাহিত্যের অসাধারণ সৃষ্টি। এদের রচয়িতাদেরকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দেওয়া হতো।

যা হোক, প্রাক-ইসলামি যুগে গোটা বিশ্বের এবং আরববাসীর জীবনধারা, রীতি-নীতি এবং বিশেষ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ছিলো পাপ ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত। অনাচার, অবিচার, অন্যায় ও অত্যাচারে সমগ্র আরব ডুবে গিয়েছিলো। মহান আল্লাহপাক কর্তৃক প্রেরিত হযরত ইবরাহিম আ., হযরত ঈসা আ. এবং আরও অনেক নবী-রাসূল মানুষের সর্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে মহান ধর্ম ও আদর্শ বিশ্বের মানুষকে শিখিয়েছিলেন, সে পথ ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে মানবকুল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অভিশপ্ত অবস্থায় পতিত হয়েছিলো। পারস্যবাসী এক ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে কল্যাণ-অকল্যাণের জন্য দুই দেবতায় বিশ্বাস করতো। পাক-ভারত-বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজা চলতো। চীনাবাসীরা নর ও নৃপতি

---

৭০ 'It was only in the field of poetical expression that the pre-Islamic Arabian excelled. Herein his finest talents found a field.' Cf. Philip K. Hitti, *History of the Arabs History of the Arabs*, Ibid, p. 92

৭১ 'For many centuries in the Middile Ages it was the language of learning and culture and progressive thougt throughout the civilized world.' Cf. Philip K. Hitti, *History of the Arabs History of the Arabs*, Ibid, p. 4

পূজায় নিমগ্ন ছিলো। ইয়াহুদিগণও ধর্মগুরুর প্রকাশিত পথ ও একেশ্বরবাদীতা ভুলে গিয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন করতো। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানগণও হযরত ঈসা আ. কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার হস্তক্ষেপ ছাড়া ঐসব ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থা হতে বিশ্ব মানবকূলের বিশেষ করে আরববাসীর উদ্ধারের আর কোনো পথ খোলা ছিলো না। তাই একজন মহান ত্রাণ-কর্তার আবির্ভাবের কামনায় সমগ্র বিশ্ব যেনো অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলো। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি যথার্থভাবে মন্তব্য করেন– 'রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অরাজকা বিরাজমান ছিলো। একজন মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার অভ্যুদয়ের সময় উপযোগী ছিলো, মঞ্চও প্রস্তুত হয়েছিল।'[৭২]

দিগন্তব্যাপী এ ঘন তমসার বুকে তাওহিদের আলো জ্বালানোর মহান ব্রত নিয়ে বিশ্বের রহমতস্বরূপ মহানবী মুহাম্মদ স. পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর প্রভাবে শুধু আরবভূমিই আলোকিত হয়নি, সারা বিশ্বভুবনও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আল-কুরআনের নাযিল : কুরআন মাজিদের নাযিল সংক্রান্ত আলোচনা 'উলূমুল কুরআনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কুরআনের উপর ঈমান ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর ঈমান অনেকাংশে কুরআন নাযিলকে মেনে নেয়ার উপর নির্ভরশীল। আরবি নুযুল শব্দের অর্থ কোনো স্থানে অবতরণ এবং আশ্রয় গ্রহণ করা। আর বাবে ইফ'আলের মাসদার হিসেবে ইনযাল (إِنْزَالٌ) শব্দের অর্থ অন্যকে কোনো স্থানে অবতরণ করানো, অন্যকে আশ্রয় দান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৭৩]

رَبِّ أَنْزِلْنِى مُنْزَلاً مُّبٰرَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

নুযুল শব্দের আর একটা অর্থ, উপর থেকে নিচে নেমে আসা। যেমন আরবিতে বলা হয়, نَزَلَ فُلَانٌ مِّنَ الْجَبَلِ. 'অমুক ব্যক্তি পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসেছে।' এ অর্থের প্রেক্ষিতে ইনযাল অর্থ কোনো বস্তুকে উপর থেকে নিচে স্থানান্তর করা, বর্ষণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৭৪]

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً.

কুরআন মাজিদের নাযিলের ক্ষেত্রে এ দু'টি অর্থের কোনোটিই প্রযোজ্য নয়। কেননা, এর জন্য স্থান ও আকারের প্রয়োজন। আর কুরআন মাজিদের কোনো আকার নেই, যাতে তা কোনো স্থানে অবতরণ করবে বা উপর থেকে নিচে নেমে আসবে। এ কারণে এ ক্ষেত্রে নুযুলুল কুরআনের রূপক অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তা এই যে, কোনো মাধ্যম দ্বারা তা জানানো বা অবগত করানো। যেমন– লাওহে মাহফূয এবং দুনিয়ার আকাশের বাইতুল ইযযাহ-এ

---

৭২ 'Anarchy prevailed in the political realm as it did in the religious. The stage was set, the moment was psychological, for the rise of a great religious and national leader.' Cf. Philip K. Hitti, *History of the Arabs History of the Arabs*, Ibid, p. 6

৭৩ 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে বরকতময় মনযিলে অবতরণ করাও এবং তুমিই সর্বোত্তম মনযিল দানকারী।' দ্র. আল কুরআন, ২৩ : ২৯

৭৪ 'তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন।' দ্র. আল কুরআন, ২ : ২২

নাযিল অর্থ তাতে এমন নকশা অংকিত করা, যাতে তা বুঝা যায়। আর নবী কারিম সা.-এর অন্তরে অবতরণ অর্থ, সুস্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে তা অবগত করানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৭৫]

حٰمٓ. وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ. إِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. وَإِنَّه فِىْٓ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ.

কুরআন নাজিলের ইতিহাস : সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল-কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,[৭৬]

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ. فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ.

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,[৭৭]

وَإِنَّه فِىْٓ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ.

কুরআন মাজিদ লাওহে মাহফূজে কখন, কি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। আর তিনি জানেন যাকে আল্লাহ তা'আলা এ অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত করেছেন। উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, লাওহে মাহফূজে পূর্ণ কুরআনই সংরক্ষিত আছে।

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি : কুরআন মাজিদ দু'টি পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। যথা–

- লাওহে মাহফূজ থেকে লাইলাতুল কদরে পূর্ণ কুরআন এক সাথে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নাযিল হয়।
- পৃথিবীর আকাশ থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর সময়ব্যাপী প্রয়োজনের পেক্ষাপটে কিস্তিতে কিস্তিতে পৃথিবীতে নাযিল হয়েছে।

নাযিলের প্রথম পর্যায়ে এক বরকতময় রাত্রিতে পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফূজ থেকে পৃথিবীর আকাশে বাইতুল ইযযাহ নামক স্থানে নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৭৮]

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ.

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,[৭৯]

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,[৮০]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ.

---

৭৫ 'হা-মীম, শপথ এ সুস্পষ্ট কিতাবের। নিশ্চয়ই আমি একে আরবি ভাষায় কুরআনরূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। নিশ্চয়ই তা সংরক্ষিত আছে আমার নিকট মূল কিতাবে (লাওহে মাহফুজে)। এটি অত্যন্ত মহান ও জ্ঞানগর্ভ কিতাব।' দ্র. আল কুরআন, ৪৩ : ১-৪

৭৬ 'বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন। সংরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ আছে)।' দ্র. আল কুরআন, ৮৫ : ২১-২২

৭৭ 'নিশ্চয়ই তা সংরক্ষিত আছে আমার নিকট মূল কিতাবে (লাউহি মাহফুজে)। এটা অত্যন্ত মহান ও জ্ঞানগর্ভ কিতাব।' দ্র. আল কুরআন, ৪৩ : ৪

৭৮ 'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময়-প্রাচুর্যময় রাতে। আমি অবশ্যই সতর্ককারী।' দ্র. আল কুরআন, ৪৪ : ৩

৭৯ 'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন নাযিল করেছি এক মহিমান্বিত রাতে।' দ্র. আল কুরআন, ৯৭ : ১

৮০ 'রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।' দ্র. আল কুরআন, ২ : ১৮৫

উপরোক্ত তিনটি আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কুরআন মাজিদ একটি রাতেই নাযিল হয়েছে। সূরা দুখানের আয়াত থেকে জানা যায়, এ রাতটি হলো বরকতময় রাত। আর সূরা কদরের আয়াত থেকে জানা যায়, এ রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর। আর সূরা বাকারার আয়াত থেকে জানা যায়, এটি ছিলো রমযান মাসের একটি রাত।

আমরা হাদিস থেকে স্পষ্ট জানতে পারি যে, নবী কারিম সা.-এর উপর কুরআন মাজিদ খণ্ডাকারে কয়েক বছর ধরে নাযিল হয়েছে। এক রাতে নাযিল হয়নি। কাজেই এ তিনটি আয়াতে কুরআন মাজিদ নাযিলের যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা একটি ভিন্ন নাযিল। নবী কারিম সা.-এর উপর নাযিল নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত হাদিসে এ নাযিলের পক্ষে স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন,[৮১]

أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر. ثم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة. ثم قرأ "وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا."[৮২] "وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَأَه عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً".[৮৩]

হযরত ইবন আব্বাস রা. থেকে এ প্রসঙ্গে আরো তিনটি হাদিস বর্ণিত আছে। যথা–

প্রথম হাদিস : 'হাকিম স্বীয় সনদের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরআন-এর উপদেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ওটাকে পৃথিবীর আকাশে বাইতুল ইয্যাহ নামক স্থানে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে হযরত জিবরা'ঈল আ. নবী কারিম সা.-এর উপর নাযিল করতে থাকেন।'[৮৪]

দ্বিতীয় হাদিস : 'হাকিম, বাইহাকি নিজ নিজ সনদে ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, পূর্ণ কুরআন একত্রিতভাবে পৃথিবীর আকাশে নাযিল করা হয়। এ অবতরণ প্রক্রিয়া ছিলো মাওআকি' নুযুম[৮৫]-এর ন্যায়। অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নবীর উপর এর একটি অংশ অপর অংশের পর নাযিল করতে থাকেন।'[৮৬]

তৃতীয় হাদিস : 'তাবারানি স্বীয় সনদে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরআন রমযান মাসে লাইলাতুল কদরে একত্রিতভাবে পৃথিবীর আকাশে নাযিল হয়। অতঃপর তা খণ্ডাকারে নাযিল করা হয়।'[৮৭]

---

৮১ 'সম্পূর্ণ কুরআন এক সাথে লাইলাতুল কদরে পৃথিবীর আকাশে নাযিল করা হয়েছে। এরপর তা বিশ বছরে নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন– তারা আপনার নিকট যে কোনো সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হোক, আমিই আপনাকে তার সঠিক জবাব ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা শিখিয়ে দেই। আর আমি কুরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে, যাতে আপনি তা পর্যায়ক্রমে মানুষকে পড়ে শুনাতে পারেন এবং আমিও তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।' দ্র. আস-সুয়ূতি, *আল-ইতকান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪০

৮২ আল-কুরআন, ২৫ : ৩৩

৮৩ আল-কুরআন, ১৭ : ১০৬

৮৪ আস-সুয়ূতি, *আল-ইতকান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪০

৮৫ 'আকাশে যেমন তারকারাজি একটার পর একটা বিচ্ছিন্নভাবে উদিত হয় এবং সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায় অনুরূপভাবে ঘটনা এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াতগুলো যেভাবে আল্লাহ নবী কারিম সা.-এর উপর নাযিল করার ইচ্ছা পোষণ করেন, ঠিক সেভাবেই তিনি আয়াতগুলো প্রথম আকাশে নাযিল করেন। এ নাযিল লাওহে মাহফূজের তারতিব অনুযায়ী ছিলো না। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের হাতে যে কুরআন রয়েছে তা লাওহি মাজফূজের তারতিব অনুসারে সাজানো। নবী কারিম সা.-এর নির্দেশে এভাবে সাজানো হয়েছে।' দ্র. আস-সাবুনি, *আত-তিবইয়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

৮৬ আস-সুয়ূতি, *আল-ইতকান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪০

৮৭ প্রাগুক্ত।

আল্লামা সুয়ূতি এ হাদিসগুলো বর্ণনা বলেন, এ হাদিসগুলোর সনদ বিশুদ্ধ। তিনি আরো বলেন, এগুলো মাওকুফ হাদিস। তবে এগুলো মারফু' হাদিসের হুকুম বহন করে। কারণ সাহাবি থেকে বর্ণিত যে হাদিসে ব্যক্তিগত মতামতের অবকাশ নেই এবং যিনি ইসরাঈলি বর্ণনা গ্রহণে প্রসিদ্ধও নন, তার হাদিস মারফু'-এর হুকুম রাখে। কুরআন মাজিদের বাইতুল ইযযাহতে নাযিল হওয়ার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে একটি অদৃশ্য বিষয়। এটা রাসূলুল্লাহ সা. থেকে জানা ছাড়া কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর হযরত ইবন আব্বাস রা. ইসরাঈলি বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। কাজেই তার বর্ণিত হাদিস একটি স্পষ্ট দলিল।[৮৮]

আল্লামা সুয়ূতি রহ. ইবন মারদুইয়াহ ও ইমাম বাইহাকি রহ.-এর বর্ণনা সূত্রে ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা 'আতিয়্যাহ ইবনুল আসওয়াদ তাকে বলেন, আমার অন্তরে কুরআনের দুইটি আয়াতের মর্ম সম্পর্কে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলো সূরা বাকারার আয়াত 'রমযান মাস যাতে কুরআন নাযিল কর হয়েছে।' ও সূরা কদরের আয়াত 'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।' অথচ কুরআন অন্যান্য মাসসমূহেও নাযিল হয়। ইবন আব্বাস জবাবে বলেন, রমযান মাসের লাইলাতুল কদরে পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফূজ থেকে এক সাথে নাযিল হয়। অতঃপর বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল হয়।[৮৯] আল্লামা কুরতুবি রহ. এ ব্যাপারে 'আলিমগণের ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন একত্রিতভাবে লাওহে মাহফূজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আকাশের বাইতুল ইযযাহ নাকম স্থানে নাযিল হয়।[৯০]

প্রমাণিত হলো যে, লাওহে মাহফুজ থেকে দুই পর্যায়ে কুরআন নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বায়তুল ইযযাহ'-তে নাজিল করা হয়।[৯১] 'বাইতুল ইযযাহ্' কে বায়তুল মামুরও বলা হয়। এটি কা'বা শরিফের বরাবর উপরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাগণের ইবাদতগাহ্। পবিত্র কুরআন লাইলাতুল কদরে এখানে নাযিল করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি প্রয়োজন সাপেক্ষে অল্প অল্প করে দীর্ঘ তেইশ বছরে নাজিল হয়।

অহি এ উভয়বিধ অবতরণের ভাবকে কুরআনুল কারিম দু'টি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। একটি হলো ইনযাল অপরটি হলো তানযিল। ইনযাল শব্দের অর্থ কোন বস্তু বা বিষয়কে সম্পূর্ণ এক দফায় নাযিল করা। তানযিল শব্দের অর্থ কোন বস্তু বা বিষয়কে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাযিল করা। সুতরাং কুরআনের যেখানে ইনযাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সাধারণত লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে। আর যেখানে তানযিল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে হুজুর সা.-এর প্রতি ধীরে ধীরে অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে।

প্রথম অবতীর্ণ আয়াতসমূহ : নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে রসূল সা. এর প্রতি সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল, সেগুলো ছিল সূরা আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত। ইমাম বুখারি হযরত আয়িশা রা. এর বর্ণনা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রতি প্রথম অহি নাযিল হয়েছিল হেরা গুহায়। তিনি নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাতের পর রাত হেরা গুহায় কাটিয়ে দিতেন। এ অবস্থাতেই এক রজনীতে হযরত জিবরাঈল আ. হেরা গুহায় তাঁর নিকট

---

৮৮ আস-সাবুনি, *আত-তিবইয়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৮৯ আস-সুয়ূতি, *আল-ইতকান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪০

৯০ আস-সাবুনি, *আত-তিবইয়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৯১ আস-সুয়ুতী, *আল ইতকান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৫৮; ইবন জারির তাবারি, *তাফসীরে জামিউল বায়ান*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ.৭

এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! اِقْرَأْ (পড়ুন), রাসূলুল্লাহ্ উত্তরে বললেন, আমি পড়তে জানি না। এ উত্তর শুনে হযরত জিবরাঈল আ. রসূল সা. কে বুকে চেপে ধরেন। অত:পর ছেড়ে দিয়ে আবার বলেন اِقْرَأْ (পড়ুন)। রাসূল সা. উত্তরে বললেন, আমি পড়তে জানি না। এভাবে তিন বারের পর রসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, কি পড়ব? এরপর নাযিল হলো–[৯২]

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

এ ছিল তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কয়েকটি আয়াত। এরপর তিন বছর অহি নাযিলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়কালকে ফাতরাতুল অহির কাল বলা হয়। তিন বছর পর পুনরায় রাসূল সা. হযরত জিবরাঈল আ. কে আসমান ও যমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা মুদ্দাসসির এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত অহি নাযিলের ধারা শুরু হয়।[৯৩]

কুরআন নাযিলের পরিসমাপ্তি ও কুরআনের শেষ আয়াত : একাদশ হিজরিতে রাসূলে কারিম সা. এর ইন্তিকালের একাশি দিন মতান্তরে নয় দিন পূর্বে কুরআন নাযিল সমাপ্ত হয়। শেষ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর ইন্তিকালের মাত্র ৯ দিন পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৯৪]

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ۖ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ৯ দিন পর রসূল সা. ইহলোক ত্যাগ করেন। তবে শেষ আয়াত সম্পর্কে সাধারণভাবে জানা যায় যে, সূরা আল মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতের অংশটুকু অবতীর্ণ হয় সর্বশেষে–[৯৫]

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

উল্লেখ্য, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল দশম হিজরির যিলহাজ্জ মাসে আরাফাতের ময়দানে এবং একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদিসের দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এরপরও কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তবে যেহেতু উল্লিখিত আয়াতটি নাযিলের পর শারি'আতের বিধান সম্বলিত অন্য কোন আয়াত নাযিল হয়নি, এজন্যই অনেকে ধারণা করেছেন যে, এটাই হচ্ছে কুরআনের নাযিলকৃত শেষ আয়াত।

আল-কুরআনুল কারিম এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করা এবং পরে পর্যায়ক্রমে নাযিল করার তাৎপর্য– আল-কুরআনুল কারিম এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবু শামাহ রহ. বলেন, এর দ্বারা আল-কুরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই

---

৯২ 'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্তের দলা থেকে। পড়ুন এবং আপনার প্রভু দয়াময়, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।' দ্র. আল কুরআন, ৯৬ : ১-৫

৯৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহিহ আল-বুখারি*(ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, সং. ৪, মার্চ ২০০৩), খ.১, পৃ. ৪-৫, হাদীস নং ৩; মাওলানা তক্বী উসমানি, *উলূমুল কুরআন*(করাচি : মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচি, ৭ম প্রকাশ, জুমাদাল উলা ১৪০৮ হি.), পৃ. ৫৬

৯৪ আল-কুরআন, ২ : ২৮১

৯৫ আল-কুরআন, ৫ : ৩

আল্লাহর শেষ কিতাব যা দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে। আল্লামা যারকানি বলেন, এভাবে দুইবারে নাযিল করে একথাও বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এ কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। তদুপরি রসূল সা. এর পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরও দুই জায়গায় তা সুরক্ষিত রয়েছে। লাওহে মাহফুজ এবং বাইতুল মা'মূরে। রাসূল সা. এর বয়স ৪০ বছরে পৌঁছলে রমাদান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে কুরআন নাযিল হয়।

আল-কুরআনুল কারিম পর্যায়ক্রমে নাযিল হলো কেন? কুরআন একবারে নাযিল হয়নি। হয়েছে ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে; সুদীর্ঘ তেইশ বছরে। অন্যান্য আসমানি কিতাব তথা তাওরাত, যাবূর ও ইনজিল লিপিবদ্ধ আকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক সঙ্গে নাযিল হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজিদ নাযিল হয়েছে ধীরে ধীরে। কখনো এক আয়াত, কখনো দুই বা তিন আয়াত, আবার কখনো এক সূরা।

কুরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতের অংশ নাযিল হয়েছে তা ছিল সূরা নিসার ৯৫ নং আয়াতের অংশ বিশেষ অথচ অপরদিকে সমগ্র সূরা আল-আন'আম একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদকে একবারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল কেন করা হলো? এ প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও রাসূল সা. কে করেছিল। এর উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়–[৯৬]

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً.

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,[৯৭]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً.

ইমাম তাবারি রহ. উপরোক্ত আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন তা-ই এখানে যথেষ্ঠ হবে বলে মনে করি। তিনি লিখেন,[৯৮]

১. রাসূল সা. উম্মি ছিলেন। লেখাপড়া চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কুরআন যদি একই সাথে একবারে নাযিল করা হত, তবে তা স্মরণ রাখা বা অন্য কোন পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়ত তাঁর পক্ষে কঠিন হত। অপরপক্ষে হযরত মুসা আ. যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তার প্রতি তাওরাত একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তাওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন। তাই পবিত্র কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে যাতে কুরআন হিফয করা, উপলব্ধি করা এবং সে অনুসারে 'আমল করা সহজসাধ্য হয়।
২. কুরআনের প্রধান অংশ বিধান সম্বলিত। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে নাযিল করা হয়েছে, যেন বিধানের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। এক সাথে নাযিল হলে সকল বিধানের উপর আমল করা দুষ্কর ছিল। তাই শারি'আতের আহকাম ও নির্দেশাবলি পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হয়েছে।
৩. বারবার ঘন ঘন জিবরাঈল আ. এর আগমন রসূল সা. এর মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ছিল।

---

৯৬ আল-কুরআন, ১৭ : ১০৬

৯৭ 'এবং কাফিররা বলে, কুরআন তাঁর প্রতি একবারে কেন নাযিল করা হলো না? এভাবে (ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে) নাযিল করেছি যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেয়া যায় এবং আমি তা ধীরে ধীরে পাঠ করিয়েছি। তাছাড়া এরা এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না যার (মুকাবিলায়) আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব না।' দ্র. আল-কুরআন, ২৫ : ৩২

৯৮ ইবন জারির আত তাবারি, *তাফসির তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৯

৪. কুরআন শরীফের উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে একাধারে যেমন মু'মিনদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কুরআনের অভ্রান্ততা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়।[৯৯]
৫. মুশরিকদের বিভিন্নমুখি নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের মুকাবিলায় নবী কারিম সা.-এর অন্তরকে দৃঢ় করা এবং তাঁর মনকে শান্ত রাখা।
৬. পূর্ণ কুরআন একসাথে নাযিল হলে তা বহন করা কোমল হৃদয়ের অধিকারী নবী কারিম সা.-এর পক্ষে কষ্টসাধ্য হতো।
৭. বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করা এবং এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিমদের সতর্ক করা। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
৮. কুরআন মাজিদের উৎসস্থল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তিনিই এ কুরআন নাযিল করেন। মানুষের অন্তরে এ ধ্রুব সত্যটা বদ্ধমূল করা।
৯. বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত ঈসা আ.-এর উর্ধ্বাকাশে উত্তোলনের পর পাঁচ শতাধিক বছরের ব্যবধানে ধীরে ধীরে অহির আলোকে ইসলামের দা'ওয়াতের কার্যক্রম না থাকায় মানব জীবনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নানারূপ কুসংস্কারের জালে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর নাযিল করেন দিশেহারা মানুষের সঠিক পথের দিশারি আল-কুরআনুল কারিম।

৯৯ আল্লামা তক্বী উসমানী, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *উলূমুল কুরআন*(ঢাকা : আল জামিয়তুস সিদ্দীকিয়া দারুল উলূম, মিরপুর, ১৪২০), পৃ. ১১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআন ও আল-হাদিসের পার্থক্য

কুরআন ও হাদিসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য-ই কুরআনকে মানুষের বাণী থেকে আলাদা করে দিয়েছে। কুরআনের দাবি ও মুসলিমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন হচ্ছে এ মহাবিশ্বের অদৃশ্য স্রষ্টা আল্লাহ্র বাণী– যা নূর তথা আলোর তৈরি ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। অন্যদিকে হাদিস গ্রন্থগুলোকে মুহাম্মদ সা.-এর বাণী ও কার্যকলাপ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। কুরআনও যদি মুহাম্মদ সা. কিংবা অন্য কোনো মানুষের বাণী হতো তাহলে কুরআন ও হাদিস গ্রন্থগুলোর মধ্যে যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক ও গুণগত দিক দিয়ে তেমন কোনো পার্থক্য থাকতো না। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দু'এর মধ্যে রাত-দিন তফাৎ পরিলক্ষিত হয়– This kind of clear-cut distinction cannot be found in any other religion। কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্যকে মোটামুটি নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে :

ভাষাসম্বন্ধীয় মু'যিজা (Literary excellence and eloquence) : অনুধাবন করার জন্য কুরআন ও হাদিসের তিলাওয়াত শোনাই যথেষ্ট। শুধুমাত্র তিলাওয়াত শুনেই দু'য়ের মাঝে পার্থক্য অনুমান করা সম্ভব।

Rev. Bosworth-Smith -এর মতে,
'Al-Qur'an As a miracle of purity of style, of wisdom and of truth, it is the one miracle claimed by Mohammed, his standing miracle he called it, and a miracle indeed it is!'[১০০]

A. J. Arberry বলেন,
'Whenever I hear the Quran chanted, it is as though I am listening to music, underneath the flowing melody, there is sounding all the time the instant beat of a drum, it is like the beating of my heart.'[১০১]

এছাড়াও Marmaduke Picktall বলেছেন,
'That inimitable symphony, the very sound of which move men to tears and ecstacy.'[১০২]

স্বর ও বাচনভঙ্গি : কুরআনের স্বর ও বাচনভঙ্গি হাদিস গ্রন্থগুলোসহ অন্য যে কোন গ্রন্থ থেকে অসাধারণভাবে আলাদা। এমনকি কুরআনে মাঝে-মধ্যেই পাঠকদের প্রতি প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে।

---

১০০ Ahmed Deedat, Al-Qur'an- The Miracle of Miracles, Cf. http://www.islambasics.com, 15.05.2014

১০১ https://archive.org/details/QuranAJArberry, 20.05.2014

১০২ http://www.khayma.com/librarians/call2islaam/quran/pickthall, 05.06.2014

বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা : হাদিস গ্রন্থগুলোতে এমন কিছু হোম রেমিডি ও বক্তব্য আছে যেগুলোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো যৌক্তিকতা নেই। অন্যদিকে কুরআনে এমন কোনো হোম রেমিডি বা বক্তব্য নেই যা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, কুরআনের কিছু আয়াতকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় করানো যায়, এতগুলো হাদিস গ্রন্থেও উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু পাওয়া যায়না।

অধিকন্তু, কুরআন যদি মুহাম্মদ সা.-এর নিজস্ব বাণী হতো বা মুহাম্মদ সা.-এর নামে অন্য কেউ যদি লিখতেন সেক্ষেত্রে কুরআনের কেন্দ্রিয় চরিত্র হতেন মুহাম্মদ সা.। যেমন গীতা, ত্রিপিটক, নিউ টেস্টামেন্ট, ও হাদিসের কেন্দ্রিয় চরিত্র যথাক্রমে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু ও মুহাম্মদ সা.। অথচ কুরআনের কেন্দ্রিয় চরিত্র হচ্ছেন আল্লাহ। কুরআনে আসলে মুহাম্মদ সা.-কে বিভিন্নভাবে আদেশ-উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

কুরআনের মতো তথ্যপূর্ণ ও পৃথিবী কাঁপানো একটি গ্রন্থ লিখে কেউ কখনো কাল্পনিক কারো বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছেন বলে জানা যায় না। মানব জাতির ইতিহাসে এমন বোকামী কিংবা পাগলামীর কোনো নজির নেই। কুরআন যেভাবে লেখা হয়েছে সেভাবে আসলে সম্ভবও নয়। কেউ যদি মনে করেন যে কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ লিখে কাল্পনিক কারো বাণী হিসেবে চালিয়ে দেয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে তাকে কাজটি করে দেখানোর জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম করে এরকম একটি সাড়া জাগানো গ্রন্থ লিখে অন্য কারো নামে, তাও আবার কাল্পনিক, চালিয়ে দেয়ার মতো সাহসী কোনো লোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি, আর কিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবেও না।

কুরআন ও হাদিস উভয়ই অহির উৎস থেকে উৎসারিত হলেও এতদুভয়ের মধ্যে নানাদিক দিয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। এ পর্যায়ে কুরআন ও হাদিসের মধ্যকার পার্থক্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

কুরআন মাজিদ এক অপূর্ব মু'জিযা : এটা কেবল শব্দ, ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়েই মু'জিযা নয়; এর বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা, প্রসারতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতা এবং এর উপস্থাপিত মানব কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাও এক অপূর্ব ও চরম বিস্ময়কর মু'জিযা।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে কুরআন মাজিদ : কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এটা কালজয়ী, সর্বপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন-সংযোজন হতে চিরসুরক্ষিত, বিনা অযুতে তা স্পর্শ ও নাপাক অবস্থায় পাঠ করা হারাম। নামাযে তা সুনির্দিষ্টভাবে পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু হাদিসসমূহ কুরআনের ন্যায় কোন মু'জিযা নয়। হাদিসের মূল কথাটিই শুধু অহির মাধ্যমে মহানবী সা.-এর স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়পটে প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি নিজ ভাষায় তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন। এজন্য এর ভাষা 'মাতলু' নয়; এর ভাষা ও শব্দের তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক নয়, এর মূল বক্তব্য ও ভাবধারা অনুসরণ করার জন্যই শারি'আতে নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ কারণেই এটাকে 'অহিয়ে গাইরে মাতলু' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু কুরআন মাজিদের ভাব-ভাষা-শব্দ সব কিছুই আল্লাহর এবং এটা তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ।

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন :

الوحي الْمتلو وهو القرآن والوحي الْمروي عنه صلى الله عليه وسلم.

“অহিয়ে মাতলু হচ্ছে কুরআন মাজিদ। অপর প্রকার অহি রসূলে কারিম সা. থেকে বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণিত।”[১০৩]

আল্লামা মুহাম্মদ আল-মাদানি লিখেছেন, কুরআন হাদিসের পারস্পরিক পার্থক্য ছয়টি দিক দিয়ে বিবেচ্য।

এক. কুরআন অলৌকিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মু‘জিযা; হাদিস তা নয়।

দুই. কুরআন পাঠ না করা হলে নামায শুদ্ধ হয় না, হাদিস সেরূপ নয়।

তিন. কুরআন ও এর সামান্য অংশও অস্বীকার করলে সে নিশ্চিত কাফির হয়ে যায়, কিন্তু বিশেষ কারণের ভিত্তিতে বিশেষ কোনো হাদিস মেনে নিতে অস্বীকার করলে কাফির হতে হয় না।

চার. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ ও রসূল সা.-এর মাঝখানে জিবরাঈল আ.-এর মধ্যস্থতা অপরিহার্য; হাদিসের জন্য এটা জরুরি নয়।

পাঁচ. কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও কথা আল্লাহর নিজস্ব, হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসূল সা.-এর নিজের।

ছয়. কুরআন অযু ও পবিত্রতার সাথে স্পর্শ করা কর্তব্য, বিনা অযুতে স্পর্শ করা যায় না। হাদিস সম্পর্কে এরূপ কোনো নির্দেশনা নেই।[১০৪]

অন্য কথায় চিঠি ও মৌখিক বার্তার মধ্যে যে পার্থক্য, কুরআন ও হাদিসের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। লোক মারফত মৌখিক বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে মূল কথাটিই মুখ্য, ভাষা বা শব্দের তারতম্যে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু চিঠির ব্যাপারটি এরূপ নহে। প্রথমত তা চিঠি প্রেরকের নিজস্ব মর্জি অনুযায়ী রচিত হয় এবং দ্বিতীয়ত তাতে নিজ মত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণ ভাব প্রকাশক ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু মৌলিক কথা প্রেরণে শব্দ ও ভাষার সে বাধ্যবাধকতা থাকে না।

কুরআন ও হাদিসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যদিও এরূপ পার্থক্য রয়েছে– কুরআনকে মনে করা যায় আল্লাহর নিজস্ব লিখিত চিঠি আর হাদিস হচ্ছে আল্লাহর মৌখিক বার্তা; কিন্তু সে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহর এ ‘চিঠি’ ও মৌখিক ‘বার্তা’ উভয়েরই মুখপাত্র হচ্ছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.। এ কারণে তাঁর নিকট থেকে আল্লাহর লিখিত চিঠি– কুরআন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৌখিক বার্তা– হাদিসও জেনে নেয়া আবশ্যক। আল্লাহর প্রেরিত এ দু’টি জিনিসই পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে অপরটা গ্রহণ করলে মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হতে বাধ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেছেন :

اِذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى.

---

১০৩ শাইখ মুহাম্মদ আল মাদানি, *আল হাদিস আল কুদসিয়্যাহ*(রিয়াদ : আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ লি-ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১৮৮

১০৪ মুহাম্মদ আবু জাহু, *আল-হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*(রিয়াদ : আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ লি-ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১৪

'আমি যখন কোনো হাদিস বর্ণনা করি, তখন তোমাদের নিকট তার কুরআন সমর্থিত হওয়ারই সংবাদ প্রকাশ করি।'[১০৫]

আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রা. বলেছেন :

مَا بلغنى حديث على وجهه الا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى.

'আমার নিকট যে হাদিসই পৌঁছেছে আমি আল্লাহর কিতাবে তার সমর্থন ও তার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি।'[১০৬]

ইসলামি শারি'আতের ইমামগণের সর্বসম্মত মত হলো :

وجميع السنة شرح للقرآن الكريم.

'সমগ্র সুন্নাত ও হাদিস কুরআনেরই ব্যাখ্যা।' অতএব কুরআন হলো মহান আল্লাহর বাণী আর হাদিস হলো সে বাণীর ব্যাখ্যা।

পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার সরাসরি বাণী। আর হাদিসের ভাব আল্লাহর; কিন্তু ভাষা রাসূলূল্লাহ সা.-এর। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কুরআনের যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন হাদিসের। কারণ হাদিস তো কুরআনেরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

---

১০৫ আশ-শাইখ আলি ইবন সুলতান মুহাম্মদ আল-কারি, *মিরকাতুল মাফাতিহ শারহে মিশকাতুল মাসাবিহ*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২ হি.), খ.১, পৃ. ২৪০

১০৬ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতিব আত-তিবরিযি, *মিশকাতুল মাসাবিহ*(দিল্লি : আল-মাতবাউল আনসার, তা.বি.), খ.১, পৃ. ২৪০

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনের সূরাসমূহের পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা ও বিষয়বস্তু

আরবি সূরা (سُوْرَةٌ) শব্দটা একবচন, বহুবচনে সুওয়ার (سُوَرٌ)। উক্ত শব্দের ওয়াও হরফের উপর যদি হামযাযুক্ত হয় তবে তার অর্থ হবে অবশিষ্ট, ঝুটা। আর হামযামুক্ত সূরা শব্দের অর্থ প্রাচীর, দেয়ালে পাথরের সারি, ভবনের সুউচ্চ ও সুন্দর অংশ, সম্মান, মর্যাদা, পদমর্যাদা, চিহ্ন, পবিত্র কুরআনের অধ্যায়, সুরা।[১] অধিকাংশ সূরারই একটামাত্র নাম রয়েছে। অনেক সূরার দুই বা ততোধিক নাম আছে।

বিশুদ্ধতম মতে আল-কুরআনের মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। আবুশ শাইখ সূরা আনফাল ও তাওবাকে একটা সূরা গণ্য করে পবিত্র কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৩টি বলে মন্তব্য করেছেন।[২] প্রকৃতপক্ষে উভয়টি ভিন্ন সূরা। এ সূরাগুলোর গ্রন্থিত ও নাযিলের ক্রমধারা অনুযায়ী মাক্কি-মাদানি পরিচিতি, রুকু ও আয়াত সংখ্যা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো :

গ্রন্থিত ধারা	নাযিলের ক্রম	সূরার নাম	মাক্কি/মাদানি	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
১	৫	সূরা আল-ফাতিহা	মাক্কি	১	৭
২	৮৭	সূরা আল-বাক্বারাহ	মাদানি	৪০	২৮৬
৩	৮৯	সূরা আলে-ইমরান	মাদানি	২০	২০০
৪	৯২	সূরা আন-নিসা	মাদানি	২৪	১৭৬
৫	১১২	সূরা আল-মায়িদা	মাদানি	১৬	১২০
৬	৫৫	সূরা আল-আন'আম	মাক্কি	২০	১৬৫
৭	৩৯	সূরা আল-আ'রাফ	মাক্কি	২৪	২০৬
৮	৮৮	সূরা আল-আনফাল	মাদানি	১০	৭৫
৯	১১৩	সূরা আত-তাওবাহ	মাদানি	১৬	১২৯
১০	৫১	সূরা ইউনুস	মাক্কি	১১	১০৯
১১	৫২	সূরা হুদ	মাক্কি	১০	১২৩
১২	৫৩	সূরা ইউসুফ	মাক্কি	১২	১১১
১৩	৯৬	সূরা আর-রা'দ	মাদানি	৬	৪৩
১৪	৭২	সূরা ইবরাহীম	মাক্কি	৭	৫২
১৫	৫৪	সূরা আল-হিজর	মাক্কি	৬	৯৯
১৬	৭০	সূরা আন-নাহল	মাক্কি	১৬	১২৮
১৭	৫০	সূরা বনি ইসরাঈল	মাক্কি	১২	১১১
১৮	৬৯	সূরা আল-কাহ্ফ	মাক্কি	১২	১১০
১৯	৪৪	সূরা মারইয়াম	মাক্কি	৬	৯৮

১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৩শ সং., সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ৫৮১

২ আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন*(রিয়াদ : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হি.), খ.২, পৃ. ৪২২

গ্রন্থিত ধারা	নাযিলের ক্রম	সূরার নাম	মাক্কি/মাদানি	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
২০	৪৫	সূরা ত্বোয়াহা	মাক্কি	৮	১৩৫
২১	৭৩	সূরা আল-আম্বিয়া	মাক্কি	৭	১১২
২২	১০৩	সূরা আল-হাজ্জ	মাদানি	১০	৭৮
২৩	৭৪	সূরা আল-মু'মিনূন	মাক্কি	৬	১১৮
২৪	১০২	সূরা আন-নূর	মাদানি	৯	৬৪
২৫	৪২	সূরা আল-ফুরকান	মাক্কি	৬	৭৭
২৬	৪৭	সূরা আশ-শু'আরা	মাক্কি	১১	২২৭
২৭	৪৮	সূরা আন-নামল	মাক্কি	৭	৯৩
২৮	৪৯	সূরা আল-ক্বাসাস	মাক্কি	৯	৮৮
২৯	৮৫	সূরা আল-'আনকাবূত	মাক্কি	৭	৬৯
৩০	৮৪	সূরা আর-রূম	মাক্কি	৬	৬০
৩১	৫৭	সূরা লুকমান	মাক্কি	৪	৩৪
৩২	৭৫	সূরা আস-সাজদাহ্	মাক্কি	৩	৩০
৩৩	৯০	সূরা আল-আহযাব	মাদানি	৯	৭৩
৩৪	৫৮	সূরা সাবা	মাক্কি	৬	৫৪
৩৫	৪৩	সূরা আল-ফাতির	মাক্কি	৫	৪৫
৩৬	৪১	সূরা ইয়াসিন	মাক্কি	৫	৮৩
৩৭	৫৬	সূরা আস-সফ্ফাত	মাক্কি	৫	১৮২
৩৮	৩৮	সূরা সোয়াদ	মাক্কি	৫	৮৮
৩৯	৫৯	সূরা আয-যুমার	মাক্কি	৮	৭৫
৪০	৬০	সূরা আল-মু'মিন	মাক্কি	৯	৮৫
৪১	৬১	সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ	মাক্কি	৬	৫৪
৪২	৬২	সূরা আশ-শূরা	মাক্কি	৫	৫৩
৪৩	৬৩	সূরা আয-যুখরুফ	মাক্কি	৭	৮৯
৪৪	৬৪	সূরা আদ-দুখান	মাক্কি	৩	৫৯
৪৫	৬৫	সূরা আল-জাছিয়া	মাক্কি	৪	৩৭
৪৬	৬৬	সূরা আল-আহক্বফ	মাক্কি	৪	৩৫
৪৭	৯৫	সূরা মুহাম্মদ	মাদানি	৪	৩৮
৪৮	১১১	সূরা আল-ফাতহ্	মাদানি	৪	২৯
৪৯	১০৬	সূরা আল-হুযুরাত	মাদানি	২	১৮
৫০	৩৪	সূরা ক্বফ	মাক্কি	৩	৪৫
৫১	৬৭	সূরা আয-যারিয়াত	মাক্কি	৩	৬০
৫২	৭৬	সূরা আত-তুর	মাক্কি	২	৪৯
৫৩	২৩	সূরা আন-নাজম	মাক্কি	৩	৬২
৫৪	৩৭	সূরা আল-ক্বমার	মাক্কি	৩	৫৫
৫৫	৯৭	সূরা আর-রহমান	মাদানি	৩	৭৮
৫৬	৪৬	সূরা আল-ওয়াকি'আহ	মাক্কি	৩	৯৬
৫৭	৯৪	সূরা আল-হাদীদ	মাদানি	৪	২৯
৫৮	১০৫	সূরা আল-মুজাদালাহ	মাদানি	৩	২২
৫৯	১০১	সূরা আল-হাশর	মাদানি	৩	২৪

গ্রন্থিত ধারা	নাযিলের ক্রম	সূরার নাম	মাক্কি/মাদানি	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৬০	৯১	সূরা আল-মুমতাহিনাহ্	মাদানি	২	১৩
৬১	১০৯	সূরা আছ-ছফ	মাদানি	২	১৪
৬২	১১০	সূরা আল-জুমু‘আহ্	মাদানি	২	১১
৬৩	১০৪	সূরা আল-মুনাফিক্বূন	মাদানি	২	১১
৬৪	১০৮	সূরা আত-তাগাবুন	মাদানি	২	১৮
৬৫	৯৯	সূরা আত-ত্বলাক্ব	মাদানি	২	১২
৬৬	১০৭	সূরা আত-তাহরীম	মাদানি	২	১২
৬৭	৭৭	সূরা আল-মুলক	মাক্কি	২	৩০
৬৮	২	সূরা আল-ক্বলাম	মাক্কি	২	৫২
৬৯	৭৮	সূরা আল-হাক্কাহ্	মাক্কি	২	৫২
৭০	৭৯	সূরা আল-মা‘আরিজ	মাক্কি	২	৪৪
৭১	৭১	সূরা নূহ	মাক্কি	২	২৮
৭২	৪০	সূরা আল-জ্বিন্ন	মাক্কি	২	২৮
৭৩	৩	সূরা আল-মুয্যাম্মিল	মাক্কি	২	২০
৭৪	৪	সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির	মাক্কি	২	৫৬
৭৫	৩১	সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্	মাক্কি	২	৪০
৭৬	৯৮	সূরা আদ-দাহর	মাদানি	২	৩১
৭৭	৩৩	সূরা আল-মুরসালাত	মাক্কি	২	৫০
৭৮	৮০	সূরা আন-নাবা	মাক্কি	২	৪০
৭৯	৮১	সূরা আন-নাযি‘আত	মাক্কি	২	৪৬
৮০	২৪	সূরা আবাসা	মাক্কি	১	৪২
৮১	৭	সূরা আত-তাকভির	মাক্কি	১	২৯
৮২	৮২	সূরা আল-ইনফিতার	মাক্কি	১	১৯
৮৩	৮৬	সূরা আল-মুত্বফফিফীন	মাক্কি	১	৩৬
৮৪	৮৩	সূরা আল-ইনশিক্বক্ব	মাক্কি	১	২৫
৮৫	২৭	সূরা আল-বুরূজ	মাক্কি	১	২২
৮৬	৩৬	সূরা আত-ত্বরিক্ব	মাক্কি	১	১৭
৮৭	৮	সূরা আল-আ‘লা	মাক্কি	১	১৯
৮৮	৬৮	সূরা আল-গশিয়াহ্	মাক্কি	১	২৬
৮৯	১০	সূরা আল-ফাজর	মাক্কি	১	৩০
৯০	৩৫	সূরা আল-বালাদ	মাক্কি	১	২০
৯১	২৬	সূরা আশ-শামস্	মাক্কি	১	১৫
৯২	৯	সূরা আল-লাইল	মাক্কি	১	২১
৯৩	১১	সূরা আদ-দুহা	মাক্কি	১	১১
৯৪	১২	সূরা আশ-শরহ	মাক্কি	১	৮
৯৫	২৮	সূরা আত-তীন	মাক্কি	১	৮
৯৬	১	সূরা আল-আলাক্ব	মাক্কি	১	১৯
৯৭	২৫	সূরা আল-ক্বদর	মাক্কি	১	৫
৯৮	১০০	সূরা আল-বাইয়িনাহ্	মাদানি	১	৮
৯৯	৯৩	সূরা আয-যিলযাল	মাদানি	১	৮

গ্রন্থিত ধারা	নাযিলের ক্রম	সূরার নাম	মাক্কি/মাদানি	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
১০০	১৪	সূরা আল-আদিয়াত	মাক্কি	১	১১
১০১	৩০	সূরা আল-ক্বারি‘আহ্	মাক্কি	১	১১
১০২	১৬	সূরা আত-তাকাছুর	মাক্কি	১	৮
১০৩	১৩	সূরা আল-আছর	মাক্কি	১	৩
১০৪	৩২	সূরা আল-হুমাযাহ্	মাক্কি	১	৯
১০৫	১৯	সূরা আল-ফীল	মাক্কি	১	৫
১০৬	২৯	সূরা কুরাইশ	মাক্কি	১	৪
১০৭	১৭	সূরা আল-মা‘উন	মাক্কি	১	৭
১০৮	১৫	সূরা আল-কাউছার	মাক্কি	১	৩
১০৯	১৮	সূরা আল-কাফিরূন	মাক্কি	১	৬
১১০	১১৪	সূরা আন-নাছর	মাদানি	১	৩
১১১	৬	সূরা আল-লাহাব	মাক্কি	১	৫
১১২	২২	সূরা আল-ইখলাছ	মাক্কি	১	৪
১১৩	২০	সূরা আল-ফালাক্ব	মাক্কি	১	৫
১১৪	২১	সূরা আন-নাস	মাক্কি	১	৬
		মোট	**৮৬/২৮**	**৫৫৮**	**৬২৩৬**

আল-কুরআনের বিষয়বস্তু

আল-কুরআনের বিষয়বস্তু হলো– মানব জাতি। কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই কুরআনে দান করা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে প্রথপ্রদর্শন করা, যাতে সে পৃথিবীতেও নিজের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

কুরআনের কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু মানুষ : মানুষকে কেন্দ্র করেই পবিত্র কুরআনে নানাবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে– একথাই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু। এর কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আপাত দৃষ্টি, আন্দাজ-অনুমান নির্ভরতা অথবা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ গড়ে তুলেছে এবং ঐ মতবাদগুলোর ভিত্তিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে যথার্থ জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা মানুষের জন্য ধ্বংসকর। আসল সত্য তাই যা মানুষকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আর এ আসল সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য ইতিপূর্বে সঠিক কর্মনীতি নামে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতির আলোচনা করা হয়েছে তাই সঠিক, নির্ভুল ও শুভ পরিণতির দাবিদার।

এ চূড়ান্ত লক্ষ্য ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর হিদায়াতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা। মানুষ নিজের গাফলতি ও অসতর্কতার দরুন এগুলো হারিয়ে ফেলেছে এবং তার শয়তানি প্রবৃত্তির কারণে সে এগুলোকে বিভিন্ন সময় বিকৃতি করার কাজই করেছে। এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে

কুরআন পাঠ করতে থাকলে দেখা যাবে এ কিতাবটি তার সমগ্র পরিসরে কোথাও এর বিষয়বস্তু, কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে পড়েনি। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলি এর কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি তাসবির মালা বিভিন্ন রংয়ের ছোট-বড় দানা একটি সুতোর বাধনে একসাথে একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে পৃথিবী ও আকাশের গঠনাকৃতি সম্পর্কে, মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে এবং বিশ্বজগতের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়েছে। অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়েছে। কিন্তু মানুষকে নিছক পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা বা অন্য কোনো বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা, যথার্থ সত্যকে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ এবং কল্যাণময় পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহ্বান করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততটুকুই এবং সে ভঙ্গিময় করা হয়েছে যতটুকু এবং যে ভঙ্গিমায় আলোচনা করা তার মূল লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সব সময়ই অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। কুরআনের বিষয়বস্তু একটি সুগভীর ঐক্য ও একাত্বতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা 'ইসলামি দা'ওয়াহ'-এর কেন্দ্র বিন্দুতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

মোটকথা দা'ওয়াতি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে মানবজাতিকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত মৌলিক বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব (২) তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ (৩) আল্লাহ তা'আলার তানযিহ বা পবিত্রতা (৪) অদৃশ্য জ্ঞান (৫) শিরক বা অংশিবাদ (৬) তাকওয়া (৭) রিসালাত (৮) রাসূলের অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্য (৯) আখিরাত (কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম) (১০) জিহাদ (১১) সালাত (১২) যাকাত (১৩) সাওম (১৪) হাজ্জ (১৫) আদল ও ইনসাফ (১৬) ব্যবসা-বাণিজ্য ও চুক্তি (১৭) সুদ (১৮) চরিত্র গঠন (১৯) অর্থনীতি (২০) মজলিসের শিষ্ঠাচার (২১) রাসূল সা.-এর প্রতি আদব রক্ষা (২২) জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহদান ও এর মর্যাদা (২৩) ইসলামে বিবেক-বুদ্ধির স্থান বর্ণনা (২৪) কিসাস ও দিয়াত (২৫) লুট-তরাজ ও ডাকাতির শাস্তি (২৬) চুরির শাস্তি (২৭) অপবাদ রটানোর শাস্তি (২৮) যিনার শাস্তি (২৯) মাপ বা ওজন সংক্রান্ত বিষয়াবলি (৩০) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ।[৩]

---

৩ ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ৭৪-৯০

কুরআনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিন্যাসরীতি ও এর বহুতর আলোচ্য বিষয়কে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এর অবতরণের রীতি-পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা এ কুরআনকে একবারে লিখে মুহাম্মাদ সা.-এর হাতে দিয়ে এর বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটা বিশেষ জীবনধারার দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দেননি। এটা আদৌ তেমন ধরনের গ্রন্থ নয়। অনুরূপভাবে এ গ্রন্থে প্রচলিত রচনা পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়নি। এ জন্য রচনা বিন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে বই লেখা হয় তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা অভিনব ধরনের আসমানি কিতাব। মহান আল্লাহ তা'আলা আরব দেশের মক্কা নগরিতে তাঁর এক বান্দাকে নবী করে প্রেরণ করেন। নিজের শহর ও সম্প্রদায়–কুরাইশ থেকে দা'ওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। এ কাজ শুরু করার জন্য প্রথম দিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় নির্দেশনাগুলোই তাকে দেয়া হলো। এ নির্দেশনাগুলো ছিলো প্রধানত তিনটা বিষয়কে কেন্দ্র করে :

(ক) মহানবী সা.-কে প্রশিক্ষণ দান : ইসলামি দা'ওয়াতের বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য মহানবী সা. নিজেকে কিভাবে তৈরি করবেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে দা'ওয়াতি মিশন পরিচালনা করবেন এ পর্যায়ে তা তাকে শিখিয়ে দেয়া হয়।

(খ) প্রাথমিক তথ্যাবলি সরবরাহ : যথার্থ সত্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাবলি সরবরাহ এবং সত্য সম্পর্কে চারপাশের পরিবেশের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো প্রচলিত ছিলো সংক্ষেপে সেগুলোর খণ্ডন করা, যেগুলোর কারণে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করতো।

(গ) সঠিক কর্মনীতির দিকে আহ্বান : দা'ওয়াতি মিশনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সঠিক কর্মনীতির দিকে আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহর বিধানের যেসব মৌলিক চরিত্র নীতির অনুসরণ মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বার্তাবহ সেগুলো বিবৃত করা হয় এ অধ্যায়ে।

উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজিদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু মানবজাতি। তাই পবিত্র কুরআনে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিচয়ই দান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো– মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রতি পথ প্রদর্শন করা, যাতে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে তারা শান্তিময় জবিনের অধিকারী হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :[৪]

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ ۖ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

কুরআনে রয়েছে মানুষেরই আলোচনা। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :[৫]

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

কুরআনে রয়েছে মানব জাতির জন্য বিভিন্ন উপমা। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :[৬]

---

৪ 'এ কিতাবে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, এতে মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে পথনির্দেশ।' দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২

৫ 'তোমাদের প্রতি আমি এমন একটা কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদেরই আলোচনা রয়েছে; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করো না।' দ্র. আল-কুরআন, ২১ : ১০

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَأَبٰى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوْرًا.

বস্তুত: মানবজাতির উৎকর্ষ সাধনই যেহেতু পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই মানবজীবনের সকল দিক নিয়েই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। একটা মানুষের জীবন পথে চলার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যা কিছু আবশ্যক, যত কিছু অপরিহার্য সক কিছুরই সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল সমস্যার উল্লেখ এবং এর সঠিক সমাধান রয়েছে এ মহাগ্রন্থে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :[৭]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

কুরআনের উক্ত মৌলিক ও কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তুকে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে নিচের এ আয়াত কয়টাতে–[৮]

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ. يَّهْدِىْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِه وَيَهْدِيْهِمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের এ কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করার জন্য পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা হয়েছে।[৯] মূলতঃ এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রধানতঃ পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. **বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান তথা 'ইলমুল আহকাম (علم الأحكام) :** ইবাদত-বন্দেগি, আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার, ঘর-সংসার, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও বিষয় সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ও নির্দেশাবলি– ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ যাবতীয় আদেশ-নিষেধই এ প্রকারে আলোচিত হয়েছে।

২. **বিতর্কমূলক আলোচনার জ্ঞান তথা 'ইলমুল জাদাল ওয়াল মুখাসামা (علم الجدل والمخاصمة) :** ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, মুনাফিক এ চারটা পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্কমূলক আলোচনা হয়েছে। এ প্রকারে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের ঘৃণ্যতা ও জঘন্যতা প্রকাশ করে জনমনে তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা হয়েছে। সে সঙ্গে তাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোর সমুচিত জবাব দেয়া হয়েছে।

---

৬ 'মানবজাতির জন্য আমি এ কুরআন বিভিন্ন উপমা দিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি; কিন্তু তারা অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখান করেছে।' দ্র. আল-কুরআন, ১৭ : ৮৯

৭ 'আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি– মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয় স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ।' দ্র. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

৮ 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের জন্য নূর ও স্পষ্ট কিতাব আগমন করেছে। এ দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং তাদেরকে নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন।' দ্র. আল কুরআন, ৫ : ১৫-১৬

৯ আল কুরআন, ৬ : ৫৫; ৭ : ২; ৩১ : ১-৪; ৩৯ : ২

৩. স্রষ্টার অবদান স্মরণিকার জ্ঞান তথা 'ইলমুত তাযকির বি-আলা-ইল্লাহ (علم التذكير بآلاء الله) : আল্লাহর অনুগ্রহ, অবদান ও কুদরতি নিদর্শনাদি সম্পর্কিত জ্ঞান। এ প্রকারে আকাম ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, সর্বোপরি স্রষ্টার নর্ববিধ গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪. ইতিহাস শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান তথা 'ইলমুত তাযকির বি আইয়্যামিল্লাহ (علم التذكير بأيام الله) : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান। এ প্রকারে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার অতীত সংঘর্ষ ও রেষারেষির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। সে সঙ্গে হক ও সত্যপ্রিয়তার উজ্জ্বল পরিণাম, মিথ্যা এবং বাতিলের শোচনীয় পরিণতি সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে এবং যথাক্রমে উৎসাহিত উদ্দীপিত ও সতর্ক সাবধান করা হয়েছে।

৫. মৃত্যু ও তৎপরবর্তী কালের স্মরণিকা জ্ঞান তথা 'ইলমুত তাযকির বিল মাউত (علم التذكير بالْموت وما بعده) : মৃত্যুর অবস্থা, মানুষের অক্ষমতা, মৃত্যুর পর জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ, রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের আগমন-উপস্থিতি, কিয়ামতের আলামত, হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণ, দাজ্জালের আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মা'জুজের অভিযান, হযরত ইসরাফিল আ.-এর শিঙ্গায় ফুঁক, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্যের ওজন, আমলনামা, মু'মিনের সাথে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ, আযাব ও শাস্তির নানাবিধ প্রকার, জান্নাতের নিয়ামতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ প্রকার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। মানুষকে আত্মসতর্ক এবং আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য উদ্দীপিত করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।[১০]

পরিশেষে পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো এবং এর বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, কুরআনের বিষয়বলির বৈশিষ্ট্য ও এর বাচনভঙ্গি একটি বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী। এর সমর্থকদের উদ্দীপিত করার মতো সম্মোহক ও বিরোধীদের প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আল-কুরআনের বক্তব্য যেন বিপ্লবী নেতার ঝংকারময় ভাষণ। মনন, মগজ, বুদ্ধি ও বিবেককে উদ্বুদ্ধ করার মতো এবং ভাবাবেগের প্লাবন সৃষ্টি করার যোগ্য। দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আল-কুরআনে পরিপূর্ণ রয়েছে দরদি মন নিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করার মতো আবেগ ও আবেদনময় আহ্বান। ইসলামি দা'ওয়াতের বিশেষ অধ্যায়ে যেসব বিষয় মন-মগজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন তা বারবারই উল্লেখ করা হয়েছে। বারবার একই ভাষা বা শব্দে, নতুন ভঙ্গিতে ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একটা কথাকে পূর্ণরূপে হজম করানোর জন্যই তা উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহর গুণাবলি, তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, কিতাব, ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি এমন গুরুত্বপূর্ণ যে এ সবের পুনরুক্তি ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক এবং ইসলামি দা'ওয়াতের সকল স্তরে এর প্রয়োজন রয়েছে। সবশেষে দেখা যায় সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ যেন মহান আল্লাহ তা'আলার তৈরি ইসলামি দা'ওয়াতের একটা নীল নকশা। এ নীল নকশা অনুযায়ী ইসলামের বিরাট সৌধ গড়ার দায়িত্ব যে মহা প্রকৌশলীকে দেয়া হয়েছে তিনিই হলেন মহানবী মুহাম্মাদ সা.। তিনি আল-কুরআনে প্রদত্ত পরিকল্পণাকে বাস্তবায়িত করে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপায়ন করে গেছেন।

---

১০ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ., অনূঃ মাওলানা মাহদী হাসান, আল ফাওযুল কাবীর(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৩), ১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের সূরাসমূহের নামকরণ

আল-কুরআনের সূরাগুলো হলো শক্ত পাথর দ্বারা নির্মিত প্রাচীর। আর পবিত্র কুরআন হলো সে প্রাচীর ঘেরা মহানগরী। অধিকাংশ সূরার একটা মাত্র নাম রয়েছে। কোনো কোনো সূরার দুই বা ততোধিক নাম রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

সূরা আল-ফাতিহা (সূচনা, The Opening) : এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোনো বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করা হয়। সূরা ফাতিহার অন্যান্য নামগুলো হলো– ফাতিহাতুল কিতাব, ফাতিহাতুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, আস-সাব'উল মাসানি, আল-ওয়াফিয়া, আল-কানয, আল-কাফিয়া, আল-আসাস, আন-নূর, সূরাতুল হামদ, সূরাতুশ শুকর, আর-রুকইয়া, আশ-শিফা, আশ-শাফিয়া, সূরাতুস সলাত, সূরাতুদ দু'আ, সূরাতুস সুওয়াল, সূরাতু তা'লিমিল মাসআলা, সূরাতুল মুনাজাত, আল-কুরআনুল আযিম।[১১]

সূরা আল-বাক্বারাহ (গাভী, The Cow) : এ সূরার অষ্টম রুকুতে ৬৭ থেকে ৭১ নং আয়াতে গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এ নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল-বাকারা। কুরআন মাজিদে প্রত্যেকটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোনো পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সম্ভারের দিক দিয়ে আরবি ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটা তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশি সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন। সেখানে এ ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য নবী কারিম সা. মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এ সূরার নামকরণ আল বাকারা করার অর্থ এ নয় যে, এখানে গাভী সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করা হয়েছে। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে গাভীর কথাও বলা হয়েছে। সূরা বাকারার অন্যান্য নামগুলো হলো– ফুসতাতুল কুরআন, সানামুল কুরআন, সূরাতুয যাহরাওয়াইন।[১২]

সূরা আলে-ইমরান (ইমরানের পরিবার, The Family of Imran) : এ সূরার ৩৩ নং আয়াতে 'আলে ইমরানের' কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার অন্যন্য নাম হলো– ত্বয়্যিবাহ (তাওরাতে), সূরাতুয যাহরাওয়াইন।[১৩]

---

১১ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৪৯-৩৫৫

১২ বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৪২৭ হি.), পৃ. ১৮৯

১৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

সূরা আন-নিসা (মহিলাগণ, The Women) : এ সূরাকে সূরা আন-নিসা বলে নামকরণ করার কারণ হলো অন্যান্য বিধি-বিধান আলোচনা করার সাথে সাথে নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান তথা– বিবাহ, মোহর, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে এ সূরাতে আলোকিত হয়েছে। এ সূরার অন্য নাম আন-নিসা আত-তুলা।[১৪]

সূরা আল-মায়িদা (খাবার টেবিল, The Table Spread With Food) : এ সূরার ১৫শ রুকু‘র[১৫]

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ.

আয়াতে উল্লিখিত ‘মায়িদাহ’ শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামের মতো এ সূরার নামের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ সূরার অন্যান্য নাম হলো– আল-‘উকূদ, আল-মুনকিযাহ।[১৬]

সূরা আল-আন‘আম (চতুষ্পদ জন্তু, The Cattle) : এ সূরার ১৬ ও ১৭ রুকূ‘তে কোনো কোনো আন‘আমের (গৃহপালিত পশু) হারাম হওয়া এবং কোনো কোনোটির হালাল হওয়া সম্পর্কিত আরববাসীদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারযুক্ত ধারণা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাকে আল-আন‘আম নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আল-আ’রাফ (উঁচু স্থান, The Heights or The Wall With Elevations) : এ সূরার ৫ম রুকূ‘র ৪৬ ও ৪৭ নং আয়াতে ‘আসহাবে আ’রাফ’ বা আ‘রাফবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। সে জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে ‘আল আ’রাফ’। অন্য কথায় বলা যায় যে, এ সূরাকে সূরা আ’রাফ বলার তাৎপর্য হচ্ছে এ যে, যে সূরার মধ্যে আ‘রাফের কথা বলা হয়েছে, এটা সে সুরা।

সূরা আল-আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, The Spoils of War) : এ সূরার প্রথম আয়াতে ‘আনফাল’ বা গনিমতের সম্পদের উল্লেখ করা হয়েছে। সে জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে ‘আল আনফাল’। অন্য কথায় বলা যায় যে, এ সূরাকে সূরা আনফাল বলার তাৎপর্য হচ্ছে এ যে, যে সূরার মধ্যে গনিমতের মালের বর্ণনা করা হয়েছে, এটা সেই সুরা। এ সূরার অন্য একটি নাম রয়েছে। তাহলো– সূরাতু বদর।[১৭]

---

১৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু‘জামু ‘উলুমিল কুরআন*(দামিশক : দারুল কলম, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২ হি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

১৫ আল-কুরআন, ৫ : ১১২

১৬ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

১৭ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৫৭

সূরা আত-তাওবা (অনুশোচনা করা, The Repentance) : এ সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত– আত-তাওবাহ ও আল-বারা'আতু। তাওবা নামকরণের কারণ হলো– এ সূরার ১৪শ রুকূ'র ১১৮ নং আয়াতে কতিপয় ঈমানদারের গুনাহ মাফ করার ঘটনা বলা হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে বারাআত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ সূরার অন্যান্য নাম হলো– বারাআত, আল-ফাদিহাহ, সূরাতুল আযাব, আল-মুকাশকিশাহ, আল-মুনাক্কিরাহ, আল-হাফিরাহ, আল-মুসিরাহ, আল-মুবা'সিরাহ, আল-মুখযিনাহ, আল-মুনাক্কিলাহ, আল-মুশাররিদাহ, আল-মুদামদিমাহ।[১৮]

সূরা ইউনুস (নবী ইউনুস আ., Prophat Jonah) : যথারীতি সূরার ৯৮ নং আয়াত থেকে নিছক আলামত হিসেবে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।[১৯] এ আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে হযরত ইউনুস (আ.)-এর কথা এসেছে কিন্তু মূলত এ সূরার আলোচ্য বিষয় হযরত ইউনুস আ.-এর কাহিনী নয়।

সূরা হুদ (নবী হুদ আ., Prophet Hud) : সূরার ১৩শ আয়াতের وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا বাক্যাংশের 'হুদ' শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা ইউসুফ (নবী ইউসুফ আ., Prophet Joseph) : কুরআন মাজিদের সুন্দরতম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সূরা ইউসুফে। এ সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই হযরত ইউসুফ আ. এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এজন্য এ সূরাটিকে সূরা ইউসুফ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা রা'দ (বজ্রপাত, The Thunder) : সূরার ১৩ নং আয়াতের وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ বাক্যাংশে 'আর্ রা'দ' অর্থাৎ মেঘগর্জনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আর-রা'দ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ নামকরণের অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় রা'দ বা মেঘগর্জনের বিষয় নিয়েই শুধু আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা শুধু আলামত হিসেবে একথা প্রকাশ করে যে, এ সূরায় 'রা'দ' উল্লিখিত হয়েছে বা 'রা'দ'-এর কথা বলা হয়েছে।

সূরা ইবরাহিম (নবী ইবরাহিম আ., Prophet Abraham) : সূরার ৩৫ নং আয়াতে উল্লিখিত وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا আয়াতাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামকরণের অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় হযরত ইবরাহিম আ.-এর জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বরং অধিকাংশ সূরার নামের মতো এখানেও আলামত হিসেবে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এটা এমন একটা সূরা যেখানে ইবরাহিম আ.-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১৮ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

১৯ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ দ্র. আল-কুরআন, ১০ : ৯৮

সূরা আল-হিজর (পাথুরে উপত্যকা, The Rocky Tract) : সূরার ৮০ নং আয়াত-এর ‘আল-হিজ্‌র শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আন-নাহল (মৌমাছি, The Bees) : সূরার ৬৮ নং আয়াতের وَأَوْحٰى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ আয়াতাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এটাও নিছক আলামত ভিত্তিক, নয়তো নাহ্‌ল বা মৌমাছি এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। এ সূরার অন্য নাম হলো– সূরাতুন নি‘আম।[২০]

সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরাঈলের বংশধর, Family of Israil) : সূরার ৪ নং আয়াতের অংশ বিশেষ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ থেকে বনি ইসরাঈল নাম গৃহীত হয়েছে। বনী ইসরাঈল এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। বরং এ নামটিও কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো প্রতীক হিসেবেই রাখা হয়েছে। এ সূরার অন্যান্য নাম হলো– সূরাতুল ইসরা, সূরাতু সুবহান।[২১]

সূরা আল-কাহ্‌ফ (গুহা, The Cave) : প্রথম রুকূ‘র ৯ আয়াত إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ নাম দেবার মানে হচ্ছে এই যে, এটা এমন একটা সূরা যার মধ্যে আল-কাহ্‌ফ শব্দ এসেছে। এ সূরার অন্যান্য নাম হলো– সূরাতু আসহাবিল কাহফ, আল-হায়িলাহ (তাওরাতে)।[২২]

সূরা মারইয়াম (মরিয়াম আ., Mary) : সূরার وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ আয়াত থেকে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে।[২৩] এর মানে হচ্ছে, এটা এমন সূরা যার মধ্যে হযরত মারইয়াম আ.-এর কথা বলা হয়েছে।

সূরা ত্বহা (ত্বহা, Ta-Ha) : সূরার প্রথমে ত্বহা শব্দকে সূরাটির নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এ সূরা অন্য একটা নাম হলো সূরাতুল কালিম।[২৪]

সূরা আল-আম্বিয়া (নবীগণ, The Prophets) : কোনো বিশেষ আয়াত থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর কথা আলোচিত হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে ‘আল-আম্বিয়া’। এটাও সূরার বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং নিছক সূরা চিহ্নিত করার একটি আলামত মাত্র।

সূরা আল-হাজ্জ (হজ্জ, The Pilgrimage) : চতুর্থ রুকূ‘র দ্বিতীয় আয়াত وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা আল-মু’মিনূন (বিশ্বাসীগণ, The Believers) : প্রথম আয়াত قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

---

২০ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

২১ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৫৯

২২ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬০

২৩ আল-কুরআন, ১৯ : ১৬

২৪ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬০

সূরা আন-নূর (আলো, The Light) : পঞ্চম রুকূ‘র প্রথম আয়াত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা আল-ফুরকান (সত্য-মিথ্যার ব্যবধানকারী, The Criterion) : প্রথম আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো এ নামটিও বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং আলামত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবুও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামটির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

সূরা আশ-শু‘আরা (কবিগণ, The Poets) : সূরার ২২৪ আয়াতের وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ থেকে সূরার নামটি গৃহীত হয়েছে। এ সূরা অন্য নামটা হলো সূরাতুল জামি‘আহ।[২৫]

সূরা আন-নামল (পিপীলিকা, The Ants) : দ্বিতীয় রুকূ‘র ১৮ নং আয়াতে حَتّٰى إِذَا أَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ এর কথা বলা হয়েছে। সূরার নাম এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এমন সূরা যাতে নামল এর কথা বলা হয়েছে। অথবা যার মধ্যে নামল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অন্য নাম সূরাতু সুলাইমান।[২৬]

সূরা আল-ক্বাসাস (কাহিনীমালা, The Narration) : সূরার ২৫ আয়াতের وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ আয়াতাংশ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরায় الْقَصَصَ শব্দটি এসেছে। আভিধানিক অর্থে ক্বাসাস বলতে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা বুঝায়। কারণ এর মধ্যে হযরত মুসা আ.-এর কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আল-‘আনকাবূত (মাকড়সা, The Spider) : সূরার ৪১ আয়াতের অংশবিশেষ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে ‘আনকাবুত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সেই সূরা।

সূরা আর-রূম (রোমান জাতি, The Romans) : দ্বিতীয় আয়াত غُلِبَتِ الرُّوْمُ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা লুকমান (লুকমান আ., Luqman) : এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ‘তে লুকমান হাকিমের উপদেশাবলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন। এ সুবাদে এ সূরাকে লুকমান নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আস-সাজদাহ্ (সিজদাবনত হওয়া, The Prostration) : সূরার ১৫ নং আয়াতে সাজদাহর যে বিষয়বস্তু এসেছে তাকেই এ সূরার শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরা অন্য নামটা হলো সূরাতুল মাদাজি‘ ।[২৭]

সূরা আল-আহযাব (বাহিনী, The Confederates) : এ সূরাটির নাম ২০ নং আয়াত يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا থেকে গৃহীত হয়েছে।

---

২৫ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬০

২৬ প্রাগুক্ত।

২৭ প্রাগুক্ত।

সূরা সাবা (সাবা, Sheba) : সূরার ১৫ নং আয়াতের لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ অংশ থেকে সূরাটার নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এটা এমন একটা সূরা যেখানে 'সাবা'-এর কথা বলা হয়েছে।

সূরা আল ফাতির (স্রষ্টা, The Originator) : প্রথম আয়াতের 'ফাতির' শব্দটিকে এ সূরার শিরোনাম করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'ফাতির' শব্দটি এসেছে। এর অন্য নাম الْملائكة। এবং এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই ব্যবহৃত হয়েছে।[২৮]

সূরা ইয়াসিন (ইয়াসিন, Ya-Sin) : যে দু'টি হরফ দিয়ে সূরার সূচনা করা হয়েছে তাকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার অন্যান্য নামগুলো হলো– কলবুল কুরআন, আল-মু'ইম্মাহ (তাওরাতে), আল-মুদাফি'আহ, আল-কাদিয়াহ।[২৯]

সূরা আছ-ছফ্‌ফাত (সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান, Those Ranged In Ranks) : প্রথম আয়াতের 'ওয়াস-সফফাতি' শব্দ থেকেত সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা ছদ (সোয়াদ, Sad) : সূরার শুরুর হরফ 'ছদ'কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আয-যুমার (দলে দলে, The Groups) : আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ 'যুমারা' শব্দ থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এটি সে সূরা যার মধ্যে 'যুমার' শব্দের উল্লেখ আছে। অন্য নামটা হলো সূরাতুল গুরাফ।[৩০]

সূরা আল-মু'মিন (বিশ্বাসী, The Believer) : সূরার ২৮ নং আয়াতের وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ অংশ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সে সূরা যার মধ্যে সেই বিশেষ মু'মিন ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য নাম সূরাতুল গাফির, সূরাতুত তাওল।[৩১]

সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ (হা-মিম-সিজদা, Ha-mim The Prostration) : দু'টি শব্দের সমন্বয়ে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। একটি শব্দ حم ও অপরটি السجدة। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা শুরু হয়েছে হা মীম শব্দ দিয়ে এবং এর ৩৮ নং আয়াতে সাজদাহর আয়াত আছে। এর অন্য নাম ফুচ্ছিলাত, সূরাতুল মাসাবিহ।[৩২]

সূরা আশ-শূরা (পরামর্শ, The Consultation) : সূরার ৩৮ আয়াতের وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামের তাৎপর্য হলো, এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'শূরা' শব্দটি রয়েছে।

সূরা আয-যুখরুফ (অলংকৃত স্বর্ণ, The Gold Adornments) : সূরার ৮৫ আয়াতের 'ওয়া যুখরুফান' শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে 'যুখরুফ' শব্দ এসেছে এটা সেই সূরা।

সূরা আদ-দুখান (ধোঁয়া. The Smoke) : সূরার ১০ম আয়াত يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ এর 'দুখান' শব্দকে এ সূরার শিরোনাম বানানো হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার মধ্যে 'দুখান' শব্দটি আছে।

---

২৮ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬১

২৯ প্রাগুক্ত।

৩০ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬২

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩২ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬২

সূরা আল-জাছিয়া (হামাগুড়ি দেয়া, The Kneeling) : ২৮শ আয়াতের وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'জাসিয়াহ' শব্দ আছে। অন্য নাম সূরাতুশ শারি'আহ, সূরাতুদ দাহর।[৩৩]

সূরা আল-আহক্বফ (বাঁকা বালির পাহাড়, The Curved Sand-Hills) : সূরার ২১শ আয়াতের إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَه بِالْأَحْقَافِ বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা মুহাম্মদ (নবী মুহাম্মদ সা., Prophet Muhammad) : সূরার ২য় আয়াতের অংশ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে মুহাম্মাদ সা. এর মহান নামটি উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরার আরো একটি বিখ্যাত নাম 'কিতাল'। এ নামটি ২০ নং আয়াতের الْقِتَالُ। শব্দটি থেকে গৃহীত হয়েছে।[৩৪]

সূরা আল-ফাতহ্ (বিজয়, The Victory) : সূরার একেবারে প্রথম আয়াত إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এটি এ সূরার শুধু নামই নয় বরং বিষয়বস্তু অনুসারে এর শিরোনামও। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়ার সন্ধির আকারে নবী কারিম সা. ও মুসলিমদেরকে যে মহান বিজয় দান করেছিলেন এতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আল-হুযুরাত (প্রকোষ্ঠ, The Dwellings) : সূরার ৪র্থ আয়াতের مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে 'আল হুযুরাত' শব্দ আছে এটি সেই সূরা।

সূরা ক্বফ (ক্বফ, Qaf) : সূরার প্রথম বর্ণটিই এর নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা 'ক্বফ' বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। অন্য নাম হলো সূরাতুল বাসিকাত।[৩৫]

সূরা আয-যারিয়াত (ধুলাবালি উড়ানো বিক্ষিপ্ত বাতাস, The Winds That Scatter) : সূরার প্রথম শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা الذاريات। শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে।

সূরা আত-তুর (পর্বতমালা, The Mount) : সূরার প্রথম শব্দ وَالطُّوْرِ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা আন-নাজম (নক্ষত্র, The Star) : সূরার একেবারে প্রথম শব্দ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى থেকে গৃহীত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটিও সূরার শিরোনাম নয়। শুধুমাত্র পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ এ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আল-ক্বমার (চন্দ্র, The Moon) : সূরার সর্বপ্রথম আয়াতের اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এভাবে নামকরণের তাৎপর্য হচ্ছে এটি সেই সূরার যার মধ্যে الْقَمَرُ। শব্দটি এসেছে। অন্য নাম ইকতারাবা, আল-মুবায়্যিদাহ (তাওরাতে)।[৩৬]

---

৩৩ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩৪ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬২

৩৫ প্রাগুক্ত।

৩৬ প্রাগুক্ত।

সূরা আর-রহমান (পরম দয়ালু, The Most Gracious) : প্রথম শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, এটিই সেই সূরা যা "আর-রহমান" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামের গভীরভাবে মিল রয়েছে। কারণ এ সূরার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের পরিচায়ক গুণাবলি ও তার বাস্তব ফলাফলের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য নাম আরুসুল কুরআন।[৩৭]

সূরা আল-ওয়াকি'আহ (ঘটনাবলী, The Event) : সূরার সর্বপ্রথম আয়াতের 'ওয়াকি'আহ' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আল-হাদিদ (লোহা, The Iron) : সূরার ২৫ নং আয়াত থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা আল-মুজাদিলাহ (অভিযোগকারিণী, The Woman Who Disputes) : اَلْمُجَادَلَةُ এবং اَلْمُجَادِلَةُ উভয়টি এ সূরার নাম। নামটি প্রথম আয়াতের تُجَادِلُكَ শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই যেহেতু সে মহিলার কথা উল্লেখ আছে, যে তার স্বামীর 'যিহারে'র ঘটনা রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে পেশ করে পীড়াপীড়ি করেছিলো যে, তিনি যেন এমন এক উপায় বলে দেন যাতে তার এবং তার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ তা'আলা তার এ পীড়াপীড়িকে اَلْمُجَادَلَةُ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। তাই এ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দটিকে যদি اَلْمُجَادِلَةُ পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে 'আলোচনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকারিনী।' অন্য নাম সূরাতুয যিহার।[৩৮]

সূরা আল-হাশর (সমবেত হওয়া, The Gathering) : সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার মধ্যে 'আল হাশর' শব্দের উল্লেখ আছে। অন্য নাম সূরাতু বনি নাদির।[৩৯]

সূরা আল-মুমতাহানাহ (পরীক্ষিত মহিলা, The Woman To be Examined) : যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে চলে আসবে এবং মুসলমান হওয়ার দাবি করবে এ সূরার ১০ নম্বর আয়াতে তাদের পরীক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমতাহিনাহ। মুমতাহানা এবং মুমতাহিনা এ দু'ভাবেই শব্দটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, যে স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা। অন্য নাম সূরাতুল ইমতিহান, সূরাতুল মাওয়াদ্দাহ।[৪০]

সূরা আছ-ছফ (কাতার, The Row) : সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِه صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'আস ছফ্' শব্দটি আছে। অন্য নাম সূরাতুল হাওয়ারিয়্যিন।[৪১]

সূরা আল-জুমু'আহ্ (শুক্রবার, Friday) : ৯ নং আয়াতের إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ আয়াতাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে যদিও জুমু'আর নামাযের আহকাম বা

---

৩৭ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬২

৩৮ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৩

৩৯ প্রাগুক্ত।

৪০ প্রাগুক্ত।

৪১ প্রাগুক্ত।

বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু জুমু'আর সামগ্রিকভাবে এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়। বরং অন্যান্য সূরার নামের মত এটিও এ সূরার প্রতিকী বা পরিচয়মূলক নাম।

সূরা আল-মুনাফিকূন (কপটেরা, The Hypocrites) : প্রথম আয়াতের إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ অংশ থেকে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এ সূরার নাম ও এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এ সূরায় মুনাফিকদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সূরা আত-তাগাবুন (আপোষে লাভ-ক্ষতি, Mutual Loss and Gain) : সূরার ৯ম আয়াতের ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ কথাটির 'তাগাবুন' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'তাগাবুন' শব্দটি আছে।

সূরা আত-ত্বলাক্ব (বিচ্ছিন্ন, The Divorce) : এ সূরার নামই শুধু الطلاق নয়, বরং এটি এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে কেবল ত্বলাকের হুকুম আহকামই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস একে সূরা النساء القصرى অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা বলে অভিহিত করেছেন।[৪২]

সূরা আত-তাহরিম (নিষিদ্ধ করা, The Prohibition) : সূরার প্রথম আয়াতের يٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ শব্দ থেকে এ সূরার নাম তাহরিম গৃহীত হয়েছে। এটিও সূরার বিষয়-ভিত্তিক শিরোনাম নয়। বরং এ নামের অর্থ হচ্ছে এ সূরার মধ্যে তাহরিম সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। অন্য নাম সূরাতুল মুতাহাররিম, সূরাতু লিমা তুহাররিমু।[৪৩]

সূরা আল-মুলক (সাম্রাজ্য, Dominion) : সূরার প্রথম আয়াতাংশ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর আল মুলক শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ অন্যান্য নাম হলো– সূরাতু তাবারাকা, সূরাতুল মানি'আহ, সূরাতুল মুনজিয়্যাহ, সূরাতুল মুজাদিলাহ, সূরাতুল ওয়াকিয়াহ, সূরতুল মান্না'আহ।[৪৪]

সূরা আল-ক্বলাম (কলম, The Pen) : এ সূরাটির দু'টি নাম; সূরা 'নূন' এবং 'আল কলম'। দু'টি শব্দই সূরার শুরুতে আছে।

সূরা আল-হাক্বাহ্ (অবশ্যম্ভাবী, The Inevitable) : সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সূরা আল-মা'আরিজ (সোপানসমূহ, The Ways of Ascent) : সূরার তৃতীয় আয়াতের مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ শব্দটি থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। অন্য নাম সূরাতু সাআলা, সূরাতুল মাওয়াকি'।

সূরা নূহ (নবী নূহ আ., Prophet Noah) : এ সূরার নাম সূরা 'নূহ'। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও 'নূহ'। কারণ এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ আ. এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

---

৪২ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৩

৪৩ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৪

৪৪ প্রাগুক্ত।

সূরা আল-জ্বিন (জ্বিন জাতি, The Jinn) : এ সূরার নাম সূরা ‘আল-জ্বিন’। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও ‘আল-জ্বিন’। কারণ এতে কুরআন শুনে জ্বিনদের নিজেদের জাতির কাছে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ ও দা‘ওয়াতের কাজ করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আল-মুয্যাম্মিল (কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, The One Wrapped in Garments) : সূরার প্রথম আয়াতের الْمزمل। শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

সূরা আল-মুদ্দাসসির (চাদর আচ্ছাদিত ব্যক্তি, The One Enveloped) : প্রথম আয়াতের الْمدثر। শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিও শুধু সূরার নাম। এর বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম নয়।

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্ (পুনরুত্থান, The Resurrection) : সূরার প্রথম আয়াতের اَلْقِيَامَةِ। শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটার নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আদ-দাহর (যুগ, Period of Time) : সূরার একটি নাম আল-ইনসান এবং আরেকটি নাম আদ-দাহর। দু‘টি নামই এর প্রথম আয়াতের هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ এবং حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ আয়াতাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে।[৪৫]

সূরা আল-মুরসালাত (সঞ্চালিত বায়ু প্রবাহ, Those Sent Forth) : প্রথম আয়াতের وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আন-নাবা (সংবাদ, The News) : দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ আয়াতাংশের ‘আন নাবা’ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এটি কেবল নামই নয়, এ সূরার সমগ্র বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ নাবা শব্দের অর্থ হচ্ছে কিয়ামত ও আখিরাতের সংবাদ। আর এ সূরার এরই উপর সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রিভূত করা হয়েছে। অন্যান্য নাম সূরাতু আম্মা, সূরাতুস তাসাউল, সূরাতুল মু‘সারাত।[৪৬]

সূরা আন নাযি‘আত (উৎপাটনকারী, Those Who Pull Out) : সূরার প্রথম শব্দ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আবাসা (তিনি ভ্রু সংকুচিত করলেন, He Frowned) : এ সূরার প্রথম শব্দ عَبَسَ وَتَوَلّٰى শব্দ থেকে এর নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আত তাকভির (গুটিয়ে নেয়া, The Winding Round and Nosing its Light) : সূরার প্রথম বাক্যের كُوِّرَتْ শব্দটি থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। তাকভীর (تكوير) হচ্ছে মূল শব্দ। তা থেকে একবচন নামপুরুষ স্ত্রীলিঙ্গে অতীত কালের কর্মবাচ্য অর্থে كُوِّرَتْ এর অর্থ হচ্ছে, গুটিয়ে ফেলা। এ নামকরণের অর্থ হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে গুটিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

---

৪৫ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৪

৪৬ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৬

সূরা আল-ইনফিতার (ফেটে যাওয়া, The Cleaving) : প্রথম আয়াতের শব্দ اِنْفَطَرَتْ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে اِنْفِطَارٌ অর্থাৎ ফেটে যাওয়া। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এ সূরায় আকাশের ফেটে যাওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে।

সূরা আল-মুত্বফফিফীন (ওজন ও মাপে কারচুপিকারীরা, Those Who Deal in Fraud): প্রথম আয়াত وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আল-ইনশিক্বক্ব (বিদীর্ণ হওয়া, The Splitting Asunder) : প্রথম আয়াতের اِنْشَقَّتْ শব্দটি থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে اِنْشِقَاقٌ শব্দ। ইনশিক্বক্ব মানে ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ নামকরণের মাধ্যমে একথা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এটি এমন একটি সূরা যার মধ্যে আকাশের ফেটে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

সূরা আল বুরূজ (কক্ষপথবিশিষ্ট-নক্ষত্রখচিত, The Big Stars) : প্রথম আয়াতের اَلْبُرُوْجِ শব্দটাকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আত-ত্বরিক্ব (রাতে আত্মপ্রকাশকারী, The Night-Comer) : প্রথম আয়াতের وَالطَّارِقِ শব্দটাকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল-আ'লা (মহিমাময়, The Most High) : প্রথম আয়াতে উপস্থাপিত 'আ'লা' শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল গশিয়াহ (আচ্ছন্নকারী বিপদ, The Overwhelming) : প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةِ শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আল ফাজর (ভোর, The Break of day) : প্রথম শব্দ وَالْفَجْرِ কে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল বালাদ (মহানগরী, The City) : প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'আল বালাদ' শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আশ-শামস্ (সূর্য, The Sun) : সূরার প্রথম শব্দ আশ শাম্সকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল-লাইল (রাত, The Night) : সূরার প্রথম শব্দ আল লাইলকে এ সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আদ-দুহা (পূর্বাহ্ন, The Forenoon): সূরার প্রথম শব্দ 'ওয়াদদুহা' কে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আলাম নাশরাহ (উন্মুক্ত করা, The Opening Forth) : সূরার প্রথম শব্দ দু'টিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আত তীন (ডুমুর, The Fig) : সূরার প্রথম শব্দ 'আততীন' কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল আলাক্ব (জমাটবদ্ধ রক্ত, The Clot) : সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'আলাক' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আল ক্বদর (মহিমান্বিত রজনী, The Night of Decree) : প্রথম আয়াতের 'আল ক্বদর' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সূরা আল বাইয়িনাহ্ (সুস্পষ্ট প্রমাণ, The Clear Evidence) : প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ 'আল বাইয়িনাহ্' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। এর অন্যান্য নাম হলো– সূরাতু লাম

ইয়াকুন, সূরাতু আহলিল কিতাব, সূরাতুল কায়্যিমাহ, সূরাতুল বারিয়্যাহ, সূরতুল ইনফিকাক।[৪৭]

সূরা আল-যিলযাল (ভূমিকম্প, The Earthquake) : প্রথম আয়াতের 'যিলযালাহা' শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আল আদিয়াত (ধাবমান ঘোড়াসমূহ, Those That Run) : প্রথম শব্দ 'আল আদি'আত' কে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আল-ক্বরি'আহ্ (মহাপ্রলয়, The Striking Hour) : প্রথম শব্দ 'আল-কারি'আহ' কে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এটা কবল নামই নয় বরং এর বক্তব্য বিষয়ের শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে শুধু কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে।

সূরা আত-তাকাছুর (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা, The Piling Up) : প্রথম শব্দ 'আলহাকুমুত তাকাছুর' কে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল-আছর (কাল, The Time) : প্রথম আয়াতের 'আল আছর' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল-হুমাযাহ্ (পরনিন্দুক, The Slanderer) : প্রথম আয়াতের হুমাযাহ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল ফীল (হাতী, The Elephant) : প্রথম আয়াতের 'আসহাবিল ফীল' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা কুরাইশ (কুরাইশ বংশ, Quraish) : প্রথম আয়াতের কুরাইশ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল মা'উন (নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, The Small Kindnesses) : প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অন্য নাম হলো– সূরাতু আরাআইতা, সূরাতুদ দীন।[৪৮]

সূরা আল কাউছার (জান্নাতী ঝর্ণা, The River in Paradise) : প্রথম আয়াতের মধ্য থেকে আল কাউসার শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

সূরা আল কাফিরূন (অবিশ্বাসীরা, The Disbelievers) : প্রথম আয়াতের আল কাফিরূন শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অন্য নাম হলো– সূরাতুল মুকাশকিশাহ, সূরাতুল 'ইবাদাহ।[৪৯]

সূরা আন নাছর (সাহায্য, The Help) : প্রথম আয়াতে উল্লিখিত নাছর শব্দকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর অন্য নাম সূরাতুত তাওহিদ' ।[৫০]

সূরা আল লাহাব (অগ্নিস্ফূলিঙ্গ, Lahab) : প্রথম আয়াতের লাহাব শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর অন্য নাম হলো– সূরাতু তাব্বা, সূরাতুল মাসাদ।[৫১]

সূরা আল ইখলাছ (নিষ্ঠা, The Purity) : ইখলাস শুধু এ সূরার নামই নয়, এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্ভেজাল তাওহিদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মাজিদের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোনো শব্দের মাধ্যমে তার নামকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সূরাটিতে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি এ সূরাটির

৪৭ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৭

৪৮ প্রাগুক্ত।

৪৯ প্রাগুক্ত।

৫০ প্রাগুক্ত।

৫১ প্রাগুক্ত।

বক্তব্য অনুধাবন করে এর শিক্ষার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহিদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে। এর অন্য নাম হলো– সূরাতুল আসাস।[৫২]

মু'আওবিযাতাইন (সূরা আল-ফালাক্ব- ঊষাকাল, The Daybreak ও সূরা আন-নাস– মানবজাতি, Mankind) : কুরআন মাজিদে শেষ সূরা দু'টি সূরা নাস ও ফালাক্ব আলাদা আলাদা দু'টি সূরা ঠিকই এবং মূল লিপিতে এ সূরা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত গভীর এবং উভয়ের বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে এত বেশি নিবিড় সম্পর্ক রাখে যার ফলে এদের একটি যুক্ত নাম 'মু'আওবিযাতাইন' (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দু'টি সূরা) রাখা হয়েছে। ইমাম বাইহাকি তাঁর 'দালায়েল নবুওয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন, এ সূরা দু'টি নাযিল হয়েছে একই সাথে। তাই উভয়ের যুক্ত নাম রাখা হয়েছে 'মু'আওবিযাতাইন'। এদের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি ও বক্তব্য সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভুক্ত। এ সূরা দু'টোর অপর একটা নাম আছে। তাহলো– সূরাতুল মুশাকশিকাতাইন।[৫৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মানবজাতির জন্য সর্বশেষ হিদায়াতের বাণী বাহক ঐশীগ্রন্থ। এ গ্রন্থে ১১৪টি সূরা রয়েছে। প্রত্যেকটি সূরার নির্দিষ্ট নাম রয়েছে। হাদিস ও তাফসির গ্রন্থে দেখা গেছে কোনো কোনো সূরার একাধিক নাম রয়েছে এবং সেসব নামের মাঝে উক্ত সূরার একটা সুন্দর অর্থ ফুটে উঠেছে।

---

৫২ আস-সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৭

৫৩ প্রাগুক্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের সূরাসমূহের বিশেষ প্রেক্ষাপট

আল-কুরআন সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধানদাতা। মানবতার যাবতীয় প্রয়োজনে ইলমুল অহির এ অবদান অনস্বীকার্য। দল-মত নির্বিশেষে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন সুস্পষ্ট সমাধান দিতে বিবিধ প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে। নিম্নে আল-কুরআনের সূরাভিত্তিক বিশেষ প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো :

সূরা আল-ফাতিহা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১ম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫ম এবং সূরা মুদ্দাসসিরের পরে নাযিল হয়।[৫৪] এ সূরা মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদিসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটাই মুহাম্মাদ সা.এ উপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিলো। সেগুলো সূরা 'আলাক', সূরা 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাসসির' ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫৫]

সূরা আল-বাক্বারাহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা দ্বিতীয় ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮৭তম এবং সূরা মুতাফফিফীনের পরে নাযিল হয়।[৫৬] সূরা বাক্বারার বেশির ভাগ মদিনায় হিজরাতের পর মাদানি জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর সামান্য অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী কারিম সা.-এর জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।[৫৭]

সূরা আলে-ইমরান : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩য় ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮৯তম এবং সূরা আল-আনফালের পরে নাযিল হয়।[৫৮] এ সূরাতে মোট ৪টি ভাষণ রয়েছে। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু করে চতুর্থ রুকু'র প্রথম দু'আয়াত পর্যন্ত এবং এটি বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।[৫৯]

---

৫৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*(দামিশক : দারুল কলম, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২ হি.), পৃ. ২০২

৫৫ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*(রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি.), খ.১, পৃ. ১০৮

৫৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৫৭ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*(বৈরুত : ইদারাতুল তিবা'আতিল মুনিরিয়্যাহ, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৯৮-১০০

৫৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৫৯ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বিলি আয়িল কুরআন*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫ হি.), খ.২, পৃ. ২০৭-২০৮

দ্বিতীয় ভাষণটি,[৬০] إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ إِبْرٰهِمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ম হিজরিতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়। তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকূ'র শুরু থেকে দ্বাদশ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এগুলো নাযিল হয়। চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত। উহুদ যুদ্ধের পর এগুলো নাযিল হয়।

সূরা আন-নিসা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪র্থ ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯২তম এবং সূরা আল-মুমতাহিনার পরে নাযিল হয়।[৬১] এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সম্ভবত তৃতীয় হিজরির শেষের দিক থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরির শেষের দিকে অথবা পঞ্চম হিজরির প্রথম দিকের সময়-কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এ সূরার বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়।[৬২] যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোনো আয়াত থেকে কোনো আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছিলো এবং তার নাযিলের সময়টা কি ছিলো, তবুও কোনো কোনো বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও এমন সব ইঙ্গিত করা হয়েছে যার সহায়ক বর্ণনা থেকে এগুলোর নাযিলের সময় জানা যায়। তাই এগুলোর সাহায্যে এসব বিধান ও ইঙ্গিত সম্বলিত এ ভাষণগুলোর একটা সীমা নির্দেশ করা যায়।

যেমন উত্তরাধিকার বণ্টন ও এতিমদের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়। তখন সত্তর জন মুসলিম শহিদ হয়েছিলেন। এ ঘটনার ফলে মদিনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহিদগণের মিরাস কিভাবে বণ্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। এরই ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে, প্রথম চারটি রুকু' ও পঞ্চম রুকু'র প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়েছিলো।

যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ভয়ের নামায (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামায পড়া) পড়ার রিওয়ায়াত হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরিতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ১৫ নং রুকু'র যে ভাষণে সালাতুল খাওফের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছিলো।

চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে মদিনা থেকে বনি নাযিরকে বহিষ্কার করা হয়। তাই যে ভাষণটিতে ইহুদিদেরকে এ মর্মে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, 'আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পিছন দিকে ফিরিয়ে দেবার আগে ঈমান আনো' সেটি এর পূর্বে কোনো নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিলো বলে শক্তিশালী ধারণা করা যেতে পারে।

---

৬০ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ জগতবাসীর মধ্যে আদম, নূহ, ইবরাহিমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।' দ্র. আল-কুরআন, ৩ : ৩৩

৬১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

৬২ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*(রিয়াদ : বাদশাহ ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪৩০ হি.), পৃ. ৭৭-৮২

বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিলো। তাই ৭ম রুকু'র যে ভাষণটিতে তায়াম্মুমের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেটি এ সময়ই নাযিল হয়েছিলো।

সূরা আল-মায়িদা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫ম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **১১২**তম এবং সূরা আল-ফাতিহার পরে নাযিল হয়।[৬৩] হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ৬ হিজরির শেষের দিকে অথবা ৭ হিজরির প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়।[৬৪] সূরায় আলোচ্য বিষয় থেকে সুস্পষ্ট হয় এবং হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা নিম্নরূপ :

ষষ্ঠ হিজরির যিলকদ মাসে চৌদ্দশ' মুসলিমকে নিয়ে নবী কারিম সা. উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বনি কুরাইশ কাফিররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আরবের প্রাচীনতম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে উমরাহ করতে দিলো না। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর তারা এতটুকু মেনে নিলো যে, আগামী বছর আপনারা আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার জন্য আসতে পারেন। এ সময় একদিকে মুসলমানদের কাবাঘর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করার নিয়ম-কানুন বলে দেয়ার প্রয়োজন ছিলো, যাতে পরবর্তী বছর পূর্ণ ইসলামি শান-শওকতের সাথে উমরাহর সফর করা যায় এবং অন্য দিকে তাদেরকে এ মর্মে ভালোভাবে তাকিদ করারও প্রয়োজন ছিলো যে, কাফির শত্রুদল তাদের উমরাহ করতে না দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তার জবাবে অগ্রবর্তী হয়ে যেন আবার কাফিরদের উপর কোনো অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম না করে বসে। কারণ অনেক কাফির গোত্রকে হজ্জ সফরের জন্য মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হতো। মুসলিমদেরকে যেভাবে কা'বা যিয়ারত করতে দেয়া হয়নি সেভাবে তারাও এ ক্ষেত্রে জোর পূর্বক এসব কাফির গোত্রের কা'বা যিয়ারতের পথ বন্ধ করে দিতে পারত। এ সূরার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ যে ভাষণটি অবতারণা করা হয়েছে সেখানে এ প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। **১৩** রুকূ'তে আবার এ প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম রুকূ' থেকে নিয়ে চৌদ্দ রুকূ' পর্যন্ত একই ভাষণের ধারাবাহিকতা চলেছে। এ ছাড়াও এ সূরার মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয়বস্তু পাওয়া যায় তা সবই একই সময়ের বলে মনে হয়।

বর্ণনার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্ভবত এটা একই সঙ্গে নাযিল হয়েছে। আবার এর কোনো কোনো আয়াত পরবর্তীকালে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হতেও পারে এবং বিষয়বস্তুর একাত্মতার কারণে সেগুলোকে এ সূরার বিভিন্ন স্থানে জায়গা মত জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও সামান্যতম শূন্যতাও অনুভূত হয় না। ফলে একে দু'টি বা তিনটি ভাষণের সমষ্টি মনে করার অবকাশ নেই।

---

৬৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৬৪ মাহমুদ ইবন উমর আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*(বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪৩০ হি.), পৃ. ২৭৬-২৭৮

সূরা আল আন'আম : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬ষ্ঠ ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫৫তম এবং সূরা আল-হিজরের পরে নাযিল হয়।[৬৫] হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা মতে এ সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো। হযরত মু'আয ইবন জাবাল রা.-এর চাচাত বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ বলেন, ' রাসূলুল্লাল্লাহ সা. উটনির পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হতে থাকে। তখর আমি তাঁর উটনির লাগাম ধরে ছিলাম। বোঝার ভারে উটনির অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো যেন মনে হচ্ছিল এই বুঝি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।' হাদিসে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে রাতে এ সূরাটি নাযিল হয় সে রাতেই রাসূলুল্লাল্লাহ সা. এটাকে লিপিবদ্ধ করেন। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়, এ সূরাটি মাক্কি যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদের বর্ণনাটিও একথার সুস্পষ্ট সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ তিনি ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। হিজরতের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করার আগে নিছক তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে মক্কায় নবী সা.-এর খিদমতে হাযির হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকবেন তাঁর মক্কায় অবস্থানের শেষ বছরে। এর আগে ইয়াসরিববাসীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়নি যার ফলে তাদের একজন মহিলা তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে যেতে পারে।[৬৬]

সূরা আল-আ'রাফ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭ম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩৯তম এবং সূরা সোয়াদের পরে নাযিল হয়।[৬৭] এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সূরাটি সূরা আন'আমের প্রায় সমসময়ে নাযিল হয়। অবশ্য সূরা আ'রাফ আগে না সূরা আন'আম আগে নাযিল হয় তা নিশ্চয়তার সাথে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে এ সূরায় প্রদত্ত ভাষণের বচনভংগী থেকে এটি যে ঐ সময়ের সাথে সম্পর্কিত তা পরিষ্কার বুঝা যায়।[৬৮]

সূরা আল-আনফাল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮ম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮৮তম এবং সূরা আল-বাক্বারার পরে নাযিল হয়।[৬৯] এ সূরাটি দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়।[৭০] ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংঘটিত এ প্রথম যুদ্ধের উপর এতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায়, সম্ভবত এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত এবং একই সঙ্গে এ ভাষণটি নাযিল করা হয়। তবে এর কোনো কোনো আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভুত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারাবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে।

---

৬৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৬৬ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

৬৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৬৮ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৭৪-৭৬

৬৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৭০ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৫-৬

কিন্তু দু'-তিনটি আলাদা আলাদা ভাষণকে এর সাথে জুড়ে দিয়ে একটি অখণ্ড ভাষণে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে মনে করা হতে পারে এমন কোনো বিষয়ের সন্ধান এ সমগ্র ভাষণে কোথাও পাওয়া যাবে না।

সূরা আত-তাওবাহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯ম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **১১৩**তম এবং সূরা আল-মায়িদার পরে নাযিল হয়।[৭১] এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। এর নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ হিজরির যিলকদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়।[৭২] নবী কারিম সা. সে বছর হযরত আবু বকর রা.-কে আমিরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়।

সূরা ইউনুস : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১০**ম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **৫১**তম এবং সূরা বনি ইসরাঈলের পরে নাযিল হয়।[৭৩] এ সূরাটি কখন নাযিল হয়, এ সম্পর্কিত কোনো হাদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষের দিকে নাযিল হয়।[৭৪] কারণ, এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামি দা'ওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে বরদাশত করতে রাযি ছিলো না। উপদেশ-অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদেরকে যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সতর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোনো ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্ট্যই তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরার হিজরতের প্রতি কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো না কোনো ইঙ্গিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে।

সূরা হুদ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১১**তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫২তম এবং সূরা ইউনুসের পরে নাযিল হয়।[৭৫] এ সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, এটা সূরা ইউনুসের সমসময়ে নাযিল হয়েছিলো। এমনকি তার অব্যবহিত পরেই যদি নাযিল হয়ে থাকে তবে তাও বিচিত্র নয়। কারণ, ভাষণের মূল বক্তব্য একই। তবে সতর্ক করে দেয়ার ধরনটা তার চেয়ে বেশি কড়া। হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর রা. নবী কারিম সা. কে বলেন– 'আমি দেখেছি আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি?' জবাবে তিনি বলেন, 'সূরা হূদ ও তারই মতো বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।' এ থেকে অনুমান করা যায়, যখন একদিকে কুরাইশ বংশীয় কাফিররা

---

৭১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৭২ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
৭৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২
৭৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬
৭৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

নিজেদের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে নবী কারিম সা.-এর সত্যের দা'ওয়াতকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক এসব সতর্কবাণী নাযিল হচ্ছিল, তখনকার সময়টা তাঁর কাছে কত কঠিন ছিলো।[৭৬] সম্ভবত এহেন অবস্থায় সর্বক্ষণ এ আশংকা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলো যে, আল্লাহর দেয়া অবকাশ কখন না জানি খতম হয়ে যায় এবং সে শেষ সময়টি এসে যায় যখন আল্লাহ কোনো জাতির উপর আযাব নাযিল করে তাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে এ সূরাটি অধ্যয়ন করার সময় মনে হতে থাকে যেন একটি বন্যার বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং যে অসতর্ক জনবসতিটি এ বন্যার গ্রাস হতে যাচ্ছে তাকে শেষ সাবধান বাণী শুনানো হচ্ছে।[৭৭]

সূরা ইউসুফ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১২**তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫৩তম এবং সূরা হুদের পরে নাযিল হয়।[৭৮] এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, এটিও নবী সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে নাযিল হয়েছে। তখন কুরাইশ বংশের লোকেরা নবী কারিম সা.-কে হত্যা বা দেশান্তর করবে, না বন্দী করবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এ সময় মক্কার কাফির সমাজের কোনো কোনো লোক (সম্ভবত ইহুদিদের ইঙ্গিত) নবী কারিম সা.-কে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে, বনী ইসরাঈলরা কি কারণে মিসরে চলে গিয়েছিলো? যেহেতু আরববাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানত না, তাদের কথা-কাহিনী ও পৌরাণিক বৃত্তান্তসমূহে কোথাও এর কোনো উল্লেখই পাওয়া যেতো না এবং নবী কারিম সা.-এর নিজের মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত কোনো কথা শোনা যায়নি, তাই তারা আশা করছিলো, তিনি এর কোনো বিস্তারিত জবাব দিতে পারবেন না অথবা এ সময় টালবাহানা করে কোনো ইহুদিকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে তাঁর বুযুর্গি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষায় উল্টো তারাই পরাজিত হলো। আল্লাহ কেবল সঙ্গে সঙ্গেই ইউসুফ আ.-এর এ ঘটনা সম্পূর্ণ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং এ ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফ আ.-এর ভাইদের মতো নবী সা. এর সাথে যে ব্যবহার করছিলো ঠিক তার সদৃশ ঘটনা উপস্থাপিত করলেন।[৭৯]

সূরা রা'দ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১৩**তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **৯৬**তম এবং সূরা মুহাম্মাদের পরে নাযিল হয়।[৮০] ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ রুকূ'র বিষয়বস্তু সাক্ষ্য দিচ্ছে, এ সূরাটিও সূরা ইউনুস, হুদ ও আ'রাফের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে।[৮১] বর্ণনাভঙ্গি থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী কারিম সা. দাওয়াত শুরু করার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ তাঁকে লাঞ্ছিত করার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মু'মিনরা বারবার এ আকাঙ্খা পোষণ

---

৭৬ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ১-৩

৭৭ মুফতী মুহাম্মদ শাফী রহ., অনূঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন*(মদীনা মুনাওয়ারাঃ বাদশাহ ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৬১৯

৭৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৭৯ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ১৭০-১৭২

৮০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

৮১ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪০১-৪০২

করতে থাকে, হায়! যদি কোনো প্রকার অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার মাধ্যমে এ লোকগুলোকে সত্য-সরল পথে আনা যায়। অন্যদিকে আল্লাহ মুসলিমদেরকে এ মর্মে বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখানোর এ পদ্ধতি আমার এখানে প্রচলিত নেই আর যদি ইসলামের শত্রুদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন কোনো ব্যাপার নয় যার ফলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ৩১ নং আয়াত থেকে জানা যায়, বারবার কাফিরদের হঠকারিতার এমন প্রকাশ ঘটেছে যারপর ন্যায়সংগতভাবে একথা বলা যায় যে, যদি কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরাও উঠে আসেন তাহলেও এরা মেনে নেবে না বরং এ ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা করে নেবে। এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে।

সূরা ইবরাহিম : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭২তম এবং সূরা নূহের পরে নাযিল হয়।[৮২] সূরাটির সাধারণ বর্ণনা পদ্ধতি মক্কার শেষ যুগের সূরাগুলোর মতো। তাই এটা সূরা রা'দের নিকটবর্তী কালে অবতীর্ণ বলে মনে হয়।[৮৩] বিশেষ করে ১৩ নং আয়াতে– 'এবং অস্বীকারকারীরা নিজেদের রাসূলদের বললো, তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মীয় জাতিসত্তার মধ্যে, অন্যথায় আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে' শব্দাবলি থেকে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সে সময় মক্কায় মুসলমানদের উপর জুলুম-নিপীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। মক্কাবাসীরা অতীতের কাফির জাতিগুলোর মতো তাদের দেশের মু'মিন সমাজকে দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলো। এ জন্য অতীতে তাদের মতো যেসব জাতি একই কর্মনীতি অবলম্বন করেছিলো তাদেরকে যে ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছিলো তাদেরকেও সেই একই হুমকি দেয়া হয়েছিলো– 'আমি জালিমদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ব।' অন্যদিকে মু'মিনদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই সান্ত্বনা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়– 'এ জালিমদেরকে খতম করার পর আমি এ ভূখণ্ডে তোমাদের বসতি স্থাপন করাবো।' এভাবে শেষ রুকূ'র আলোচ্য বিষয় থেকেও অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে।

সূরা আল-হিজর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫৪তম এবং সূরা ইউসুফের পরে নাযিল হয়।[৮৪] বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে আরো পরিষ্কার বুঝা যায়, এ সূরাটি সূরা ইবরাহিমের সমসময়ে নাযিল হয়।[৮৫] এর পটভূমিতে দু'টি বিষয় পরষ্কিার দেখা যাচ্ছে। যথা–

এক. নবী কারিম সা.-এর দা'ওয়াতের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। যে জাতিকে তিনি দা'ওয়াত দিচ্ছেন তাদের অবিরাম হঠকারিতা, বিদ্রুপ, বিরোধিতা, সংঘাত ও জুলুম-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরপর বুঝানোর সুযোগ কমে এসেছে এবং তার পরিবর্তে সতর্ক করা ও ভয় দেখানোর পরিবেশই বেশি সৃষ্টি হয়েছে।

---

৮২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৮৩ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৮৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৮৫ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭-৫৬০

দুই. নিজের জাতির কুফরি, স্থবিরতা ও বিরোধীতার পাহাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নবী কারিম সা. ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি বারবার হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তা দেখে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁর মনে সাহস যুগয়েছেন।

সূরা আন-নাহল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭০তম এবং সূরা আল-কাহফের পরে নাযিল হয়।[৮৬] বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ স্বাক্ষ্য-প্রমাণ এর নাযিল হওয়ার সময়-কালের উপর আলোকপাত করে। যেমন, ৪১ নং আয়াতের وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ اللهِ مِنْم بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا। আয়াতাংশ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সময় হাবশার হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ১০৬ নং আয়াতের مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْم بَعْدِ إِيْمَانِه আয়াতাংশ থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম-নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো যে, যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শারি'আতের বিধান কি হবে। ১১২-১১৪ আয়াতগুলোর– وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً .. .. .. إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ আয়াতগুলো পরিষ্কার এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, নবী কারিম সা.-এর নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এ সূরার ১১৫ নং আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ নং আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ নং আয়াতে এ সূরার ১১৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা দু'টির নাযিলের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিলো। এসব স্বাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরাটিও মাক্কি জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়।[৮৭]

সূরা বনী ইসরাঈল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫০তম এবং সূরা আল-ক্বাসাসের পরে নাযিল হয়।[৮৮] প্রথম আয়াতটিই একথা ব্যক্ত করে দেয় যে, মি'রাজের সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। হাদিস ও সিরাতের অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হিজরতের এক বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিলো। তাই এসূরাটিও নবী কারিম সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।[৮৯]

সূরা আল-কাহ্ফ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬৯তম এবং সূরা আল-গশিয়ার পরে নাযিল হয়।[৯০] সূরা কাহাফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মাক্কি যুগের এ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ সময় জুলুম,

---

৮৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
৮৭ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৬৫-৬৮
৮৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৮৯ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ২-৩
৯০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

নিপীড়ন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলিমরা হাবশায় হিজরত করেনি। তখন যেসব মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছিলো তাদেরকে আসহাবে কাহফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের হিম্মত বেড়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, ঈমানদাররা নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য ইতিপূর্বে কি করেছে।[৯১]

সূরা মারইয়াম : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪৪তম এবং সূরা আল-ফাতিরের পরে নাযিল হয়।[৯২] হাবশায় হিজরতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়।[৯৩] বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে জানা যায়, মুসলিম মুহাজিরদেরকে যখন হাবশার শাসক নাজ্জাশির দরবারে ডাকা হয় তখন হযরত জাফর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরাটি তিলাওয়াত করেন।

সূরা ত্বোয়া-হা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪৫তম এবং সূরা মারইয়ামের পরে নাযিল হয়।[৯৪] সূরা মারইয়াম যে সময় নাযিল হয় এ সূরাটি তার কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়।[৯৫] সম্ভবত হাবশায় হিজরাতকালে অথবা তার পরবর্তীকালে এটা নাযিল হয়। তবে হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই যে এটা নাযিল হয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। হযরত উমর রা. খাব্বাবের সঙ্গে গিয়ে নবী কারিম সা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এটি হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরের ঘটনা।

সূরা আল-আম্বিয়া : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৩তম এবং সূরা ইবরাহিমের পরে নাযিল হয়।[৯৬] বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাযিলের সময়কাল ছিলো মাক্কি জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ নবী কারিম সা. এর মাক্কি জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে অবস্থার যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে উঠে না।[৯৭]

সূরা আল-হাজ্জ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০৩তম এবং সূরা আন-নূরের পরে নাযিল হয়।[৯৮] এ সূরায় মাক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে আছে। এ কারণে মুফাসসিরগণের মাঝে এর মাক্কি বা মাদানি হওয়া নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর একটি অংশ মাক্কি যুগের শেষের দিকে এবং অন্য অংশটি মাদানি যুগের প্রথম দিকে নাযিল হবার কারণে এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গিতে এ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এজন্য উভয় যুগের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। গোড়ার দিকের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি

---

৯১ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৭৭-৮০

৯২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৯৩ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৯৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৯৫ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০-৬৫২

৯৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৯৭ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ২৬৬-২৬৮

৯৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে।[৯৯] এ ব্যাপারে বেশি নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ অংশটি মাক্কি জীবনের শেষ যুগে হিজরতের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ অংশটি ২৪ নং আয়াতে এসে শেষ হয়ে গেছে। এরপর ২৫ নং আয়াত থেকে হঠাৎ বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পাল্টে গেছে এবং পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটা মদিনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছে।

সূরা আল-মু'মিনূন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৪তম এবং সূরা আল-আম্বিয়ার পরে নাযিল হয়।[১০০] বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়।[১০১] প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী কারিম সা. ও কাফিরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফিরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫-৭৬ নং আয়াত থেকে পরিষ্কার স্বাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, মাক্কি যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দখা দিয়েছিলো বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবন যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার আগেই উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবন আবদুল কারির বরাত দিয়ে হযরত উমর রা.-এর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অহি নাযিলের সময় নবী কারিম সা.-এর অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী কারিম সা. বলেন, এ সময় আমার উপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদণ্ডে পুরোপুরি পৌঁছে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শুনান।

সূরা আন-নূর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০২তম এবং সূরা আল-হাশরের পরে নাযিল হয়।[১০২] এ সূরাটি যে বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত।[১০৩] কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়িশা রা.-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসঙ্গে এটি নাযিল হয়।[১০৪] দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ ঘটনাটা ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটা ৫ হিজরি সনে আযহাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরিতে আযহাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পর্দার বিধান কুরআন মাজিদের দু'টি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটা সূরা হচ্ছে এটা এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে সুরা আহযাব। আর আহযাব যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে

৯৯ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ. ১০৯-১১০

১০০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

১০১ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৩৪৯-৩৫১

১০২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

১০৩ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

১০৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮-৭৪০

কারোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহযাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, পর্দার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহযাবে নাযিলকৃত নির্দেশসমূহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরার নির্দেশগুলো। আর যদি বনি মুস্তালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহযাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পর্দার বিধানে ইসলামি আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরি।

ইবন সা'দ রা. বর্ণনা করেন, বনি মুস্তালিক যুদ্ধ হিজরি ৫ সনের শা'বান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় স্বাক্ষ্য হচ্ছে এ যে, হযরত আয়িশা রা.-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আয়িশা রা. থেকে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনো কোনোটিতে হযরত সা'দ ইবন উবাদাহ রা. ও হযরত সা'দ ইবন মু'আয রা.-এর বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদিস অনুযায়ী হযরত সা'দ ইবন মু'আয রা.-এর ইন্তিকাল হয় বনি কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরিতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সূরা আল-ফুরকান : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪২তম এবং সূরা ইয়াসিনের পরে নাযিল হয়।[১০৫] বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, এ সূরাটিও সূরা মু'মিনূন ইত্যাদি সূরাগুলোর সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রাসূল সা.-এর মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবন জারির ও ইমাম রাযি যাহ্হাক ইবন মুযাহিম ও মুকাতিল ইবন সুলাইমানের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটা সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয়। এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময় মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময়।[১০৬]

সূরা আশ-শু'আরা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪৭তম এবং সূরা আল-ওয়াক্বি'আর পরে নাযিল হয়।[১০৭] বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যাচ্ছে এবং হাদিস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরাটির নাযিলের সময়কাল হচ্ছে মক্কার মধ্যবর্তীকালীন যুগ। ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনামতে প্রথমে সূরা ত্ব হা নাযিল হয়, তারপর ওয়াকি'আহ এবং এরপর সূরা শু'আরা।[১০৮] আর সূরা ত্বহা সম্পর্কে জানা আছে, এটি হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছিলো।[১০৯]

সূরা আন-নামল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪৮তম এবং সূরা আশ-শু'আরার পরে নাযিল হয়।[১১০] বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে এ সূরা

---

১০৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫

১০৬ আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ২৮-৩০

১০৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১০৮ আল্লামা আলুসি, *রূহুল মা'আনি*(বৈরুত : ইদারাতুত তিবা'আতিল মুনিরিয়্যাহ, তা.বি.), খ.১৯, পৃ. ৬৪

১০৯ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ. ৮৭-৯০

১১০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

মক্কার মধ্যযুগের সূরাগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। হাদিস থেকেও এর সমর্থন মেলে। ইবন আব্বাস রা. ও জাবের ইবন যায়েদ রা.-এর বর্ণনা হচ্ছে, 'প্রথমে নাযিল হয় সূরা আশ শু'আরা তারপর আন নামল এবং তারপর আল ক্বাসাস।'[১১১]

সূরা আল-ক্বাসাস : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪৯তম এবং সূরা আন-নামলের পরে নাযিল হয়।[১১২] সূরা নামলের ভূমিকায় ইবসে আব্বাস রা. ও জাবের ইবন যায়েদ রা. একটি উক্তি উদ্ধৃতি রয়েছে। তাতে দেখা যায়, সূরা শু'আরা, সূরা নামল ও সূরা ক্বাসাস একের পর এক নাযিল হয়। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায়ই একই সময় নাযিল হয়।[১১৩]

সূরা আল-'আনকাবূত : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ২৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮৫তম এবং সূরা আর-রূমের পরে নাযিল হয়।[১১৪] সূরা 'আনকাবুতের ৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিলো।[১১৫] অধিকন্তু বিষয়বস্তুগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ও একথাই সমর্থন করে। যেহেতু, এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকির প্রকাশ হয় মদিনায়, সেহেতু কোনো কোনো মুফাসসির ধারণা করে নিয়েছেন যে, সূরাটির প্রথম দশটি আয়াত হচ্ছে মাদানি এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মাক্কি। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকির কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফিরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকি অবলম্বন করেছিলো। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকির ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদিনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলিমদেরকে হিজরত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোনো কোনো মুফাস্‌সির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন। অথচ মদিনায় হিজরতের আগে মুসলিমগণ হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোনো হাদিসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর উপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ অভ্যন্তরীণ বিষয় মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি ইশারা করে যে যুগে মুসলিমদের হাবশায় হিজরত সংঘটিত হয়েছিলো।

সূরা আর-রূম : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮৪তম এবং সূরা আল-ইনশিক্বকের পরে নাযিল হয়।[১১৬] শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, 'নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।' সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিলো জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন। এসব এলাকায় রোমানদের উপর ইরানিদের বিজয়

---

১১১ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ১৫৪-১৫৭
১১২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
১১৩ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৫-৮
১১৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
১১৫ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬
১১৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিলো। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটা সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

সূরা লুকমান : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫৭তম এবং সূরা আস-সফ্‌ফাতের পরে নাযিল হয়।[১১৭] এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন ইসলামের দা'ওয়াতের কণ্ঠরোধ এবং তার অগ্রগতির পথরোধ করার জন্য জুলুম-নিপীড়নের সূচনা হয়ে গিয়েছিলো এবং এ জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছিলো। কিন্তু তখনও বিরোধিতার তোড়জোড় ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি।[১১৮] সূরার ১৪ ও ১৫ নং আয়াত থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার যথার্থই আল্লাহর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা যদি তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা কখনোই মেনে নিবে না। এ কথাই সূরা 'আনকাবূতে বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, দু'টি সূরাই একই সময় নাযিল হয়। কিন্তু উভয় সূরার বর্ণনা রীতি ও বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে অনুমান করা যায় সূরা লুকমান প্রথম নাযিল হয়। কারণ এর পশ্চাতভূমে কোনো তীব্র আকারের বিরোধিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিপরীত পক্ষে সূরা 'আনকাবূত পড়লে মনে হবে তার নাযিলের সময় মুসলমানদের উপর কঠোর জুলুম নিপীড়ন চলছিলো।[১১৯]

সূরা আস-সাজদাহ্ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৫তম এবং সূরা আল-মু'মিনুনের পরে নাযিল হয়।[১২০] বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায়, এর নাযিল হবার সময়টা হচ্ছে মক্কার মধ্যযুগ এবং তারও একেবারে শুরুর দিকে। কারণ পরবর্তী যুগে নাযিলকৃত সূরাগুলোর পশ্চাতভূমিতে যেমন জুলুম-নিপীড়নের প্রচণ্ডতা দেখা যায় এবং এ সূরাটির পটভূমিতে সে ধরনের প্রচণ্ডতা অনুপস্থিত।[১২১]

সূরা আল-আহযাব : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯০তম এবং সূরা আলে ইমরানের পরে নাযিল হয়।[১২২] এ সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এক. আহযাব যুদ্ধ। এটি ৫ হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। দুই. বনি কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরির যিলকাদ মাসে এটা সংঘটিত হয়।[১২৩] তিন. হযরত যয়নব রা.-এর সাথে নবী সা.-এর বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিলকাদ মাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

---

১১৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫
১১৮ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৪-৮২৫
১১৯ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ. ৫৫-৫৭
১২০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
১২১ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২১, পৃ. ১১৫-১১৮
১২২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১২৩ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ১৫৬-১৫৭

সূরা সাবা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫৮তম এবং সূরা লুকমানের পরে নাযিল হয়।[১২৪] কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিলের সঠিক সময়কাল জানা যায় না। তবে বর্ণনাধারা থেকে অনুভূত হয়, এটা ছিলো মক্কার মাঝামাঝি যুগ অথবা প্রাথমিক যুগ।[১২৫] যদি মাঝমাঝি যুগ হয়ে থাকে, তাহলে সেটি ছিলো তার একেবারে প্রথম দিকের সময়। তখন পর্যন্ত জুলুম-নিপীড়নের তীব্রতা দেখা দেয়নি এবং তখনো কেবলমাত্র ঠাট্টা-তামাশা, বিদ্রুপ, গুজব ছড়ানো এবং মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দেয়ার মাধ্যমে ইসলামি আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো।

সূরা আল ফাতির : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪৩তম এবং সূরা আল-ফুরক্বানের পরে নাযিল হয়।[১২৬] বক্তব্য প্রকাশের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সম্ভবত মক্কা মুকাররমার মধ্যযুগে সূরাটা নাযিল হয়। এ যুগেরও এমন সময় সূরাটি নাযিল হয় যখন ঘোরতর বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং নবী কারিম সা.-এর দা'ওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সব রকমের অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল।[১২৭]

সূরা ইয়াসিন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪১তম এবং সূরা জ্বিনের পরে নাযিল হয়।[১২৮] বর্ণনাভঙ্গি দেখে অনুভব করা যায়, এ সূরার নাযিল হবার সময়টি হবে নবী কারীমের সা. নবুওয়াত লাভ করার পর মক্কায় অবস্থানের মধ্যবর্তী যুগের শেষের দিনগুলো। অথবা এটি হবে তাঁর মক্কায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিনগুলোর একটি সূরা।[১২৯]

সূরা আস সফ্‌ফাত : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫৬তম এবং সূরা আল-আন'আমের পরে নাযিল হয়।[১৩০] বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে মনে হয়, এ সূরাটি সম্ভবত মাক্কি যুগের মাঝমাঝি সময়ে বরং সম্ভবত ঐ মধ্য যুগেরও শেষের দিকে নাযিল হয়। বর্ণনাভঙ্গি থেকে পঙ্কিার বুঝা যাচ্ছে যে, পশ্চাতভূমিতে বিরোধিতা চলছে প্রচন্ড ধারায় এবং নবী সা. ও তাঁর সাহাবিগণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন।[১৩১]

সূরা সোয়াদ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩৮তম এবং সূরা আল-ক্বমারের পরে নাযিল হয়।[১৩২] কোনো কোনো হাদিস অনুযায়ী দেখা যায়, এ সূরাটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিলো যখন নবী কারিম সা. মক্কা মুকাররমায় প্রকাশ্যে দা'ওয়াত

---

১২৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
১২৫ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
১২৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
১২৭ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৯-৮৮০
১২৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১-৩৪২
১২৯ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১-৪
১৩০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১৩১ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৩, পৃ. ৬৪-৬৬
১৩২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

শুরু করেছিলেন এবং এ কারণে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এ হিসেবে প্রায় নবুওয়াতের চতুর্থ বছরটি এর নাযিল হবার সময় হিসেবে গণ্য হয়। অন্যান্য হাদিসে একে হযরত উমর রা. এর ঈমান আনার পরের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর উমর রা. হাবশায় হিজরতের পর ঈমান আনেন, একথা সবার জানা। আর এক ধরনের হাদিস থেকে জানা যায়, আবু তালিবের শেষ রোগগ্রস্ততার সময় যে ঘটনা ঘটে তারই ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হয়। একে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর নাযিলের সময় হিসেবে ধরতে হয় নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছরকে।

সূরা আয-যুমার : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৩৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৫৯তম এবং সূরা সাবার পরে নাযিল হয়।[১৩৩] এ সূরা হাবশা হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবন আবি তালিব ও তার সঙ্গী-সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো।[১৩৪]

সূরা আল-মু'মিন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬০তম এবং সূরা আয-যুমারের পরে নাযিল হয়।[১৩৫] ইবন আব্বাস ও জাবের ইবন যায়েদ রা. বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরা, সূরা যুমার নাযিল হওয়ার পর পরই নাযিল হয়েছে।[১৩৬]

সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬১তম এবং সূরা আল-মু'মিনের পরে নাযিল হয়।[১৩৭] নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে হযরত হামযার রা. ঈমান আনার পর এবং হযরত উমরের রা. ঈমান আনার পূর্বে।[১৩৮] নবী সা. এর প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কায়যীর বর্ণনাসূত্রে এ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিলো এবং মসজিদের অন্য কোণে রাসূলুল্লাহ সা. একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হযরত হামযা রা. ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিলো।[১৩৯]

কতিপয় মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকেও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে শব্দগত কিছু মতপার্থক্য আছে। ঐ সব বর্ণনার কোনো কোনোটাতে এ কথাও আছে যে, নবী কারিমসা. তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়

فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ.

---

১৩৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

১৩৪ আল্লামা আলুসি, *রূহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৩, পৃ. ২২৬

১৩৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

১৩৬ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৯-৯৫১

১৩৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

১৩৮ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৩৩৭-৩৩৯

১৩৯ ইবন হিশাম, অনুঃ আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবনে হিশাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮), পৃ. ৬৫-৬৬

'এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির মত অকস্মাৎ আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

এ আয়াতটি পড়লেন তখন 'উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের উপর হাত চেপে ধরে বলল– 'আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের কওমের প্রতি সদয় হও।' পরে কুরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের বর্ণনা করেছে, এ বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদ সা.-এর মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের উপর আযাব নাযিল না হয় তা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।[১৪০]

সূরা আশ-শূরা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬২তম এবং সূরা হা-মীম-আস-সাজদার পরে নাযিল হয়।[১৪১] নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে। কারণ, এ সূরাটিকে সূরা হা মীম আস-সাজদার এক রকম সম্পূরক বলে মনে হয়। যে ব্যক্তিই মনোযোগ সহকারে প্রথমে সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ পাঠ করবে এবং তারপর এ সূরা পাঠ করবে সেই এ বিষয়টি অনুধাবন করবে পারবে। সে দেখবে এ সূরাটিতে কুরাইশ নেতাদের অন্ধ ও অযৌক্তিকতা বিরোধিতার উপর বড় মোক্ষম আঘাত হানা হয়েছিলো। এভাবে পবিত্র মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকায় অবস্থানকারী যাদের মধ্যেই নৈতিকতা, শিষ্ঠাচার ও যুক্তিবাদিতার কোনো অনুভূতি আছে তারা জানতে পারবে জাতির উচ্চস্তরের লোকেরা কেমন অন্যায়ভাবে মুহাম্মাদ সা. এর বিরোধিতা করেছে আর তাদের মোকাবিলায় তাঁর কথা কত ভারসাম্যপূর্ণ, ভূমিকা কত যুক্তিসঙ্গত এবং আচার-আচরণ কত ভদ্র। ঐ সতর্কীকরণের পরপরই এ সূরা নাযিল করা হয়েছে।[১৪২] ফলে এটি যথাযথভাবে দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছে এবং একান্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে মুহাম্মাদ সা. এর আন্দোনের বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছে। কাজেই যার মধ্যেই সত্য প্রীতির কিছুমাত্র উপকরণ আছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহির প্রেমে যে ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হয়ে যায়নি তার পক্ষে এর প্রভাবমুক্ত থাকা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার।

সূরা আয-যুখরুফ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬৩তম এবং সূরা আশ-শূরার পরে নাযিল হয়।[১৪৩] কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, যে যুগে সূরা আল-মু'মিন, হা মীম সাজদাহ ও আশ শূরা নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। মক্কার কাফিররা যে সময় নবী সা. এর প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো সেই সময় যে সূরাগুলো নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও তারই একটি বলে মনে করা হয়। সেই সময় মক্কার কাফিররা সভায় বসে বসে নবী কারিম সা.-কে কিভাবে হত্যা

---

১৪০ তাফসীরে ইবন কাসির, খ.৪, পৃ. ৯০-৯১; আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, খ.৩, পৃ. ৬২

১৪১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

১৪২ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৫, পৃ. ১০-১২

১৪৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করত। তাঁকে হত্যা করা জন্য একটি আক্রমণ সংঘটিতও হয়েছিলো।[১৪৪] ৭৯ ও ৮০ আয়াতে এ পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

সূরা আদ-দুখান : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬৪তম এবং সূরা আয-যুখরুফের পরে নাযিল হয়।[১৪৫] কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ স্বাক্ষ্য বলছে, যে সময় সূরা 'যুখরুফ' ও তার পরবর্তী কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছিলো। এ সূরাটাও সে যুগে নাযিল হয়েছিলো।[১৪৬] তবে এটি ঐগুলোর অল্প কিছুকাল পরে নাযিল হয়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফিরদের বৈরী কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে তখন নবী সা. এই বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত আমাকে একটি দুর্ভিক্ষ দিয়ে সাহায্য কর। নবী সা. মনে করেছিলেন, এদের উপর বিপদ আসলে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভালো কথা শুনার জন্য মন নরম হবে। আল্লাহ নবীর সা. দু'আ কবুল করলেন। গোটা অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ নেমে এলো যে, সবাই অস্থির হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ নেতা– হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ যাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন– নবী সা. এর কাছে এসে আবেদন জানাল যে, নিজের কওমকে এ বিপদ থেকে বাচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। এ অবস্থায় আল্লাহ এ সূরাটা নাযিল করেন।

সূরা আল-জাছিয়া : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬৫তম এবং সূরা আদ-দুখানের পরে নাযিল হয়।[১৪৭] এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিসে বর্ণিত হয়নি। তবে এর বিষয়বস্ত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এটি সূরা 'দুখান' নাযিল হওয়ার অল্প দিন পরই নাযিল হয়েছে। এ দুটি সূরার বিষয়বস্তু এতটা সাদৃশ্য বর্তমানে যে সূরা দু'টোকে যুগ্ম বলে মনে হয়।[১৪৮]

সূরা আল আহক্বফ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬৬তম এবং সূরা আল-জাছিয়ার পরে নাযিল হয়।[১৪৯] এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়কাল ২৯ থেকে ৩২ নং আয়াতে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নিরূপিত হয়। ঐ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাদিস ও সিরাত গ্রন্থসমূহের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ অনুসারে নবী কারিম সা. যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে নাখলা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছিলো। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুসারে হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবী কারিম সা. তায়েফ গমন করেছিলেন। সুতরাং এ সূরা যে নবুওয়াতের ১০ম বছরের শেষ দিকে অথবা ১১শ বছরের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিলো তা নিরূপিত হয়।[১৫০]

---

১৪৪ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৫০৭-৫০৯
১৪৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯
১৪৬ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬
১৪৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১৪৮ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৪-১০০৫
১৪৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৫০ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ. ১৭৮-১৮১

সূরা মুহাম্মদ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯৫তম এবং সূরা আল-হাদীদের পরে নাযিল হয়।[১৫১] সূরার বিষয়বস্তু স্বাক্ষ্য দেয় যে, সূরাটি হিজরতের পরে এমন এক সময় মদিনায় নাযিল হয়েছিলো যখন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো বটে কিন্তু কার্যত যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি।[১৫২]

সূরা আল-ফাতহ্ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **১১১**তম এবং সূরা আল-জুমু‘আর পরে নাযিল হয়।[১৫৩] ৬ষ্ঠ হিজরির যুলকা‘দা মাসে মক্কার কাফিরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর নবী কারিম সা. যখন মদিনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন সে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়।[১৫৪] এ ব্যাপারে সমস্ত বর্ণনাকারী একমত।

সূরা আল-হুযুরাত : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৪৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০৬তম এবং সূরা আল-মুজাদালার পরে নাযিল হয়।[১৫৫] বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সূরার বিষয়বস্তু থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরা বিভিন্ন পরিবেশে ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া হুকুম-আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, ঐ সব হুকুম-আহকামের বেশির ভাগই মাদানি যুগে নাযিল হয়েছে। যেমন, ৪র্থ আয়াত সম্পর্কে তাফসিরকারদের বর্ণনা হচ্ছে আয়াতটি বনু তামীম গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো যার প্রতিনিধি দল এসে নবী কারিম সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরা বা গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলো। সমস্ত সীরাত গ্রন্থে হিজরি ৯ম সনকে এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫৬] অনুরূপ ৬ষ্ঠ আয়াত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদিসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা ওয়ালিদ ইবন উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো– রাসূললুল্লাহ সা. যাকে বনু মুস্তালিক গোত্র থেকে যাকাত আদায় করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। একথা সবারই জানা যে, ওয়ালিদ ইবন উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম হয়েছিলেন।

সূরা ক্বাফ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩৪তম এবং সূরা আল-মুরসালাতের পরে নাযিল হয়।[১৫৭] ঠিক কোন্ সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি মাক্কি যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।[১৫৮] মাক্কি যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নবুওয়াতের তৃতীয় সন থেকে শুরু করে পঞ্চম সন পযন্ত বিস্তৃত। এ যুগের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় কাফিরদের বিরোধিতা বেশ কঠোরতা লাভ করেছিলো। কিন্তু তখনও জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি।

---

১৫১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু‘জামু ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
১৫২ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা‘আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ৩৬-৩৮
১৫৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু‘জামু ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
১৫৪ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫১-৫৩
১৫৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু‘জামু ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
১৫৬ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫
১৫৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু‘জামু ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
১৫৮ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৩-১০৪৪

সূরা আয-যারিয়াত : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬৭তম এবং সূরা আল-আহক্বফের পরে নাযিল হয়।[১৫৯] বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে সময় নবী সা. এর ইসলামি আন্দোলনের মোকাবিলা অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে অত্যন্ত জোরে শোরেই করা হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু জুলুম ও নিষ্ঠুরতার যাঁতাকলে নিষ্পেষণ শুরু হয়নি, ঠিক এ যুগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিলো। এ কারণে যে যুগে সূরা ক্বফ নাযিল হয়েছিলো এটিও সে যুগের নাযিল হওয়া সূরা বলে প্রতীয়মান হয়।[১৬০]

সূরা আত-তুর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৬তম এবং সূরা আস-সাজদার পরে নাযিল হয়।[১৬১] বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীন স্বাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, মাক্কি জীবনের যে যুগে সূরা আয যারিয়াত নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও সে যুগে নাযিল হয়েছিলো। সূরাটি পড়তে গিয়ে একথা অবশ্যই মনে হয় যে, এটি নাযিল হওয়ার সময় নবী সা. এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তবে তখনও চরম জুলুম-অত্যাচার শুরু হয়েছিলো বলে মনে হয় না।[১৬২]

সূরা আন-নাজম : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২৩তম এবং সূরা আল-ইখলাসের পরে নাযিল হয়।[১৬৩] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসাঈতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যে সূরাটিতে সাজদাহর আয়াত নাযিল হয়েছে, সেটি হচ্ছে আন-নাজ্‌ম। এ হাদিসের যে অংশসমূহ আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ, আবু ইসহাক এবং যুহায়ের ইবন মুয়াবিয়া কর্তক ইবন মাসউদের রিওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, এটা কুরআন মাজিদের প্রথম সূরা যা রাসূলুল্লাহ সা. কুরাইশদের এক সমাবেশে– ইবন মারদুইয়ের বর্ণনা অনুসারে হারাম শরীফের মধ্যে শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফির ও ঈমানদার সব শ্রেণির লোক উপস্থিত ছিলো। অবশেষে তিনি সাজদাহর আয়াত পড়ে সাজদাহ করলে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সাজদাহ করে। এমনকি মুশরিকদের বড় বড় নেতা যারা তাঁর বিরোধিতার অগ্রভাগে ছিলো তারাও সাজদাহ না করে থাকতে পারেনি। ইবন মাসউদ রা. বর্ণনা করেন; আমি কাফিরদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমাইয়া ইবন খালফকে দেখলাম, সে সাজদাহ করার পরিবর্তে কিছু মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে আমি নিজ চোখে তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

ইবন সা'দ বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে নবুওয়াতের ৫ম বছরের রজব মাসে সাহাবা কিরামের একটি ছোট্ট দল হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরে ঐ বছর রমযান মাসেই এ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. কুরাইশদের জনসমাবেশে সূরা নাজম পাঠ করে শুনান এবং এতে কাফির ও ঈমানদার সবাই তাঁর সাথে সাজদায় পড়ে যায়। হাবশায় মুহাজিরদের কাছে এ কাহিনী এভাবে পৌঁছে যে, মক্কার কাফিররা মুসলমান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে তাদের মধ্যকার

---

১৫৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
১৬০ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ. ১৯-২৫
১৬১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৬২ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৭, পৃ. ২৬-২৯
১৬৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

কিছুলোক নবুওয়াতের ৫ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে আসার পর জানতে পারেন যে, জুলুম-নির্যাতন আগের মতই চলছে। অবশেষ হাবশায় দ্বিতীয় বারের মত হিজরত সংঘটিত হয়। এতে প্রথমবারের হিজরতের তুলনায় অনক বেশী লোক মক্কা ছেড়ে চলে যায়। এভাবে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের ৫ম বছরে নাযিল হয়েছিলো।[১৬৪]

সূরা আল-ক্বমার : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩৭তম এবং সূরা আত-ত্বারিকের পরে নাযিল হয়।[১৬৫] এ সূরার মধ্যে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এ থেকেই এর নাযিলের সময়কাল চিহ্নিত হয়ে যায়।[১৬৬] মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার এ ঘটনা হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় মিনা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।

সূরা আর-রহমান : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯৭তম এবং সূরা আর-রা'দের পরে নাযিল হয়।[১৬৭] তাফসির বিশারদগণ সাধারণত: এ সূরাটিকে মাক্কি বলে আখ্যায়িত করেন।[১৬৮] যদিও হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, ইকরিমা ও কাতাদা রা. থেকে কোনো কোনো হাদিসে এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ সূরা মদিনায় অবতীর্ণ তা সত্ত্বেও প্রথমত ঐ সব সম্মানিত সাহাবা থেকে আরও কিছু সংখ্যক হাদিসে বিপরীত বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ সূরার বিষয়বস্তু মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের তুলনায় মক্কায় অবতীর্ণ সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি বিষয়বস্তুর বিচারে এটি মাক্কি যুগেরও একেবারে প্রথম দিকের বলে মনে হয়। তাছাড়া বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কাতে নাযিল হয়েছিলো। মুসনাদে আহমদে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বর্ণনা করেছেন– কা'বা ঘরের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত আমি হেরেম শরীফের মধ্যে সে কোণে মুখ করে রাসূলুল্লাহ সা. কে নামায পড়তে দেখেছি। তখনও পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ– 'তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে বলে দাও' নাযিল হয়নি। সে নামাযে মুশরিকরা তাঁর মুখ থেকে فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ কথাটি শুনেছিলো। এ থেকে জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা আল হিজরের পূর্বেই নাযিল হয়েছিলো।

তিরমিযি, হাকেম ও হাফেজ আবু বকর বায্যার হযরত জাবির ইবন বায্যার রা. থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনার ভাষা হচ্ছে– সূরা আর রাহমানের তিলাওয়াত শুনে যখন লোকজন চুপ করে থাকলো তখন নবী কারিম সা. বললেন– 'যে রাতে কুরআন শোনার জন্য জ্বিনরা একত্রিত হয়েছিলো, সে রাতে আমি জ্বিনদের এ সূরা শুনিয়েছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে এর উত্তম জবাব দিচ্ছিল। যখনই আমি আল্লাহ

---

১৬৪ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৪২-১৪৫
১৬৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬
১৬৬ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮
১৬৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
১৬৮ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৯

তা'আলার এ বাণী শুনাচ্ছিলাম- 'হে জ্বিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।' তখন তারা জবাবে বলছিলো– 'হে আমাদের রব, আমরা তোমার কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না। সব প্রশংসা কেবল তোমারই।'

এ হাদিস থেকে জানা যায়, সূরা আহক্বাফে (২৯ থেকে ৩২ নং আয়াত) রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখ থেকে জ্বিনদের কুরআন শোনার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সে সময় নবী কারিম সা. নামাযে সূরা আর রাহমান পাঠ করেছিলেন। এটা নবুওয়াতের ১০ম বছরের ঘটনা। সে সময় নবী কারিম সা. তায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যদিও অপর কিছু সংখ্যক হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর জানা ছিলো না যে, জ্বিনেরা তাঁর নিকট হতে কুরআন শরিফ শুনছে। বরং আল্লাহ তা'আলা পরে তাকে অবহিত করেছিলেন যে, জ্বিনেরা তাঁর কুরআন শরিফ তিলাওয়াত শুনছিলো কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নবী কারিম সা.-কে যেভাবে জ্বিনদের কুরআন শরিফ তিলাওয়াত শোনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন অনুরূপভাবে তাঁকে একথাও জানিয়েছিলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় তারা তার কি জবাব দিচ্ছিলো। এরূপ হওয়াটা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

এসব বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, সূরা আর-রাহমান সূরা আল-হিজর ও সূরা আহকাফের পূর্বে নাযিল হয়েছিলো।[১৬৯]

সূরা আল-ওয়াকি'আহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪৬তম এবং সূরা ত্বোয়া-হার পরে নাযিল হয়।[১৭০] হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস সূরাসমুহ নাযিলের যে পরম্পরা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন, প্রথমে সূরা ত্বাহা নাযিল হয়, তারপর আল-ওয়াকি'আ এবং তারও পরে সূরা আশ-শুআরা। ইকরামাও এ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবন হিশাম ইবন ইসহাক থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত উমর রা. যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সূরা ত্বহা তিলাওয়াত হচ্ছিল। তাঁর উপস্থিতির আভাস পেয়ে সবাই কুরআনের আয়াত লিখিত পাতাসমূহ লুকিয়ে ফেললো। হযরত উমর রা. প্রথমেই ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করার জন্য বোন এগিয়ে আসলে তাঁকেও এমন প্রহার করলেন যে, তাঁর মাথা ফেটে গেলো। বোনের শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর রা. অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন, তোমরা যে সহিফা লুকিয়ে রেখেছো তা আমাকে দেখাও। তাতে কি লেখা আছে দেখতে চাই। শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে আপনি অপবিত্র 'কেবল পবিত্র লোকেরাই ঐ সহিফা হাতে নিতে পারে।' একথা শুনে হযরত উমর রা. গিয়ে গোসল করলেন এবং তারপর সহিফা নিয়ে পাঠ করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা ওয়াকি'আহ নাযিল হয়েছিলো। কারণ ঐ সূরার মধ্যে لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ। আয়াতাংশ আছে। আর একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত উমর রা. হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১৭১]

---

১৬৯ সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৩৬

১৭০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

১৭১ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ. ১৯৪-১৯৫

সূরা আল হাদিদ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯৪তম এবং সূরা আয-যিলযালের পরে নাযিল হয়।[১৭২] সর্বসম্মত মতে এটি মদিনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদাইবিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছিলো। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফিররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামি রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছিলো এবয় ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিল না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ম আয়াতে অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'যারা বিজয়ের পর নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনই ঐসব লোকের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না বরং বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে।' ইবন মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত হাদিস একথাই সমর্থন করে। তিনি أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ আয়াত নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময় ৪র্থ ও ৫ম হিজরি সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল বলে নির্ধারিত হয়।[১৭৩]

সূরা আল-মুজাদালাহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০৫তম এবং সূরা আল-মুনাফিকুনের পরে নাযিল হয়।[১৭৪] মুজাদালার এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিলো তা কোনো রেওয়ায়াতেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিত আছে যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, এ সূরা আহযাব যুদ্ধের (৫ম হিজরির শাওয়াল মাস) পরে নাযিল হয়। পালিত পুত্র যে প্রকৃতই পুত্র হয় না সে বিষয়ে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবে যিহার সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছিলেন– وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ. 'তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে যিহার কর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।'[১৭৫]
কিন্তু যিহার করা যে, একটি গুনাহ বা অপরাধ সেখানে তা বলা হয়নি। এ কাজের শার'ঈ বিধান কি সেখানে তাও বলা হয়নি। পক্ষান্তরে এ সূরায় যিহারের সমস্ত বিধি-বিধান বলে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় বিস্তারিত এ হুকুম আহকাম ঐ সংক্ষিপ্ত হিদায়াতের পরেই নাযিল হয়েছে।[১৭৬]

সূরা আল-হাশর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৫৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০১তম এবং সূরা আল-বাইয়্যিনার পরে নাযিল হয়।[১৭৭] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে সা'ঈদ ইবন যুবায়ির থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-কে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল

---

১৭২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
১৭৩ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৭, পৃ. ১৬৪-১৬৬
১৭৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
১৭৫ আল-কুরআন, ৩৩ : ৪
১৭৬ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৩৭-২৩৮
১৭৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

হয়েছিলো তেমনি সূরা হাশর বনু নাযির যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবন যুবায়ের তার দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবন আব্বাস রা.-এর বক্তব্য এরূপ– 'বল যে, এটা সূরা নাযির'। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরি, ইবন যায়েদ, ইয়াযিদ ইবন রূমান, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার ঐকমত্যভিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনু নাযির গোত্রেরই লোক। ইয়াযিদ ইবন রূমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনু নাযির যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো।[১৭৮]

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিলো? এ সম্পর্কে ঈমাম যুহরি উরওয়া ইবন যুবায়ির রা.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু ইবন সা'দ, ইবন হিশাম এবং বালাযুরি একে হিজরি চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মা'উনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়েছিলো। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মা'উনা'র মর্মান্তিক ঘটনা উহুদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিলো; আগে নয়।

সূরা আল-মুমতাহিনাহ্ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯১তম এবং সূরা আল-আহযাবের পরে নাযিল হয়।[১৭৯] এ সূরায় এমন দু'টি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে যার সময়-কাল ঐতিহাসিকভাবে জানা। প্রথমটি হযরত হাতেব ইবন বালতা'আর রা. ঘটনা। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে একটি গোপন পত্রের মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের এ মর্মে অবহিত করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কে, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসতে শুরু করেছিলো এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো, সন্ধির শর্ত অনুসারে মুসলমান পুরুষদের মত তাদেরও কি কাফিরদের হাতে সমর্পণ করতে হবে? এ দু'টি ঘটনার উল্লেখ থেকে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধির এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে নাযিল হয়েছিলো। এ দু'টি ঘটনা ছাড়াও সূরার শেষের দিকে তৃতীয় আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহলো, ঈমান গ্রহণের পর বাই'য়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহিলারা যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর খিদমতে হাজির হবে তখন তিনি তাদের কাছ থেকে কি কি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিবেন? সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান হল, তা মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। কারণ মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের পুরুষদের মত তাদের নারীরাও বিপুল সংখ্যায় একসাথে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছিল। তাদের নিকট থেকে সামষ্টিকভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন তখন অবশ্যম্ভাবী ছিলো।[১৮০]

---

১৭৮ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

১৭৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

১৮০ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৭-১১০২

সূরা আছ-ছফ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০৯তম এবং সূরা আত-তাগাবুনের পরে নাযিল হয়।[১৮১] কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।[১৮২]

সূরা আল-জুমু'আহ্ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১১০তম এবং সূরা আছ-ছফের পরে নাযিল হয়।[১৮৩] প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ৭ হিজরিতে সম্ভবত খায়বার বিজয়ের সময় অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছিলো। বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবন জারির হযরত হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বার বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। ইবন হিশামের বর্ণনা অনুসারে ৭ হিজররি মুহাররম মাসে আর ইবন সা'দেরও বর্ণনা অনুসারে জমাদিউল উলা মাসে খায়বার বিজিত হয়েছিলো। অতএব যুক্তির দাবি হল, ইহুদিদের এই সর্বশেষ দুর্গটি বিজিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বোধন করে এ আয়াতগুলো নাযিল করে থাকবেন কিংবা খায়বারের পরিণাম দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদি জনপদ যখন ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে গিয়েছিলো তখন হয়ত এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো হিজরতের পরে অল্পদিনের মধ্যে নাযিল হয়েছিলো।[১৮৪] কেননা নবী সা. মদিনা পৌঁছার পর পঞ্চম দিনেই জুমু'আর নামায কায়েম করেছিলেন। এ রুকূ'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, আয়াতটি জুমু'আর নামায আদায় করার ব্যবস্থা হওয়ার পর এমন এক সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে যখন মানুষ দ্বীনি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশের আদব-কায়দা ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তখনও পুরো প্রশিক্ষণ লাভ করেনি।

সূরা আল-মুনাফিকূন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০৪তম এবং সূরা আল-হাজ্জের পরে নাযিল হয়।[১৮৫] বনু মুস্তালিক যুদ্ধাভিযান থেকে রাসূলুল্লাহ সা. এর ফিরে আসার সময় পতিমধ্যে অথবা মদিনায় পৌঁছার অব্যবহিত পরে এ সূরা নাযিল হয়েছিলো। ৬ষ্ঠ হিজরির শা'বান মাসে বনু মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।[১৮৬] এভাবে এর নাযিল হওয়ার সময় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সূরা আত-তাগাবুন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০৮তম এবং সূরা আত-তাহরিমের পরে নাযিল হয়।[১৮৭] মুকাতিল ও কালবি বলেন, সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদিনায় অবতীর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং আতা ইবন ইয়াসির বলেন, প্রথম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১৪ থেকে শেষ পর্যন্ত মদিনায় অবতীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ।

---

১৮১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
১৮২ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৮, পৃ. ৭৭-৮০
১৮৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
১৮৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৮, পৃ. ৯২-৯৪
১৮৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮
১৮৬ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৯৮-৩০০
১৮৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

যদিও সূরার মধ্যে এমন কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত সূরাটি মাদানি যুগের প্রাথমিক দিকে নাযিল হয়েছে। এ কারণে সূরাটিতে কিছুটা মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য এবং কিছুটা মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।[১৮৮]

সূরা আত-ত্বলাক্ব : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯৯তম এবং সূরা আদ-দাহরের পরে নাযিল হয়।[১৮৯] হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেছেন যে, সূরা বাকারার যেসব আয়াতে সর্বপ্রথম ত্বলাক সম্পর্কিত হুকুম আহকাম দেয়া হয়েছিলো সেসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।[১৯০] সূরার বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ও তা প্রমাণ করে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল কোন্‌টি তা নির্ণয় করা যদিও কঠিন, কিন্তু বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে এতটুকু অন্তত জানা যায় যে, লোকজন সূরা বাকারার বিধি-নিষেধগুলো বুঝতে যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতও তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হতে থাকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এসব নির্দেশ নাযিল করলেন।

সূরা আত-তাহরিম : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০৭তম এবং সূরা আল-হুযুরাতের পরে নাযিল হয়।[১৯১] এ সূরার মধ্যে তাহরিম সম্পর্কিত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনাসমূহে দু'জন মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা দু'জনই নবী কারিম সা.-এর স্ত্রী। তাঁদের একজন হলেন হযরত সাফিয়া রা. এবং অন্যজন হযরত মারিয়া কিবতিয়া রা.। তাঁদের মধ্যে একজন অর্থাৎ সাফিয়া রা. খায়বার বিজয়ের পরে নবীর সা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সর্বসম্মত মতে খায়বার বিজিত হয় ৭ম হিজরিতে। দ্বিতীয়জন হযরত মারিয়া রা-কে মিসরের শাসক মুকাওকিস ৭ম হিজরি সনে নবী কারিম সা.-এর খিদমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ৮ম হিজরির যুলহাজ্জ মাসে তাঁরই গর্ভে রাসূল সা.-এর পুত্রসন্তান হযরত ইবরাহিম রা. জন্মলাভ করেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ বিষয়টি প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম অথবা ৮ম হিজরির কোনো এক সময় নাযিল হয়েছিলো।[১৯২]

সূরা আল-মুলক : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৭তম এবং সূরা আত-তুরের পরে নাযিল হয়।[১৯৩] এ সূরাটি কোন্ সময় নাযিল হয়েছিলো তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।[১৯৪]

সূরা আল-ক্বলাম : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২য় এবং সূরা আল-আলাক্বের পরে নাযিল হয়।[১৯৫] এটিও মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া

---

১৮৮ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬

১৮৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

১৯০ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৪-১১১৫

১৯১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

১৯২ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৮, পৃ. ১৭৭-১৮৫

১৯৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

১৯৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৯, পৃ. ২-৪

১৯৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

সূরাসমূহের অন্যতম।[১৯৬] তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন মক্কা নগরীতে রাসূলুল্লাহ সা. এর বিরোধিতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

সূরা আল-হাক্কাহ্ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৬৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৮তম এবং সূরা আল-মুলকের পরে নাযিল হয়।[১৯৭] এ সূরাটিও মাক্কি জীবনের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। এর বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায়, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরোধিতা শুরু হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনও তা তেমন তীব্র হয়ে উঠেনি।[১৯৮] মুসনাদে আহমদ হাদিস গ্রন্থে হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রাসূলুল্লাহ সা. কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম। কিন্তু আমার আগেই তিনি মসজিদে হারামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম যে তিনি নামাযে সূরা হাক্কাহ পাঠ করছেন। আমি তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, শুনতে লাগলাম। কুরআনের বাচনভঙ্গি আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিলো। সহসা আমার মন বলে উঠল। লোকটি নিশ্চয়ই কবি হবেন। কুরাইশরাও তো তাই বলে। সে মুহূর্তেই রাসূল সা.-এর মুখে এ কথাটি উচ্চারিত হল– 'এ একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী। কোনো কবির কাব্য নয়।' আমি মনে মনে বললাম– কবি না হলেও গণক হবেন। তখনই তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হল– 'এ গণকের কথাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা করে থাক। এ কথা তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।' এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হযরত উমর রা.-এর এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিলো। কারণ এ ঘটনার বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে বিভিন্ন সময়ের কিছু ঘটনা তাঁকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলছিলো। অবশেষে তাঁর মনের উপর চূড়ান্ত আঘাত পড়ে তাঁর আপন বোনের বাড়িতে। আর এ ঘটনাই তাঁকে ঈমানের মনযিলে পৌঁছিয়ে দেয়।

সূরা আল-মা'আরিজ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৯তম এবং সূরা আল-হাক্কার পরে নাযিল হয়।[১৯৯] বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা আল-হাক্কাহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও মোটামুটি সে একই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিলো।[২০০]

সূরা নূহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭১তম এবং সূরা আন-নাহলের পরে নাযিল হয়।[২০১] এটাও রাসূলুল্লাহ সা. এর মাক্কি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর দা'ওয়াত ও তাবলিগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের শত্রুতামূলক আচরণ বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছিলো তখন এ সূরাটি নাযিল হয়।[২০২]

---

১৯৬ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫
১৯৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
১৯৮ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬
১৯৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২০০ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৮-১১৪১
২০১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
২০২ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৮, পৃ. ২৯৮-৩০০

সূরা আল-জ্বিন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪০তম এবং সূরা আল-আ'রাফের পরে নাযিল হয়।[২০৩] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে উকাযের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের ইমামতি করেন। সে সময় একদল জ্বিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনোযোগসহ কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকে।[২০৪] ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা মতে এ সূরায় বর্ণিত সফরে জ্বিনদের কুরআন শোনার ঘটনা তখন ঘটেছিলো যখন তিনি মক্কা থেকে উকায যাচ্ছিলেন। এসব কারণে যে বিষয়টি সঠিক বলে জানা যায় তাহলো, সূরা আহক্বাফ এবং সূরা জ্বিন একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন সফরে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দু'টো ঘটনা।

সূরা আল মুয্যাম্মিল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩য় এবং সূরা আল-ক্বলামের পরে নাযিল হয়।[২০৫] এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনা থেকেও বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মাক্কি জীবনের কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিলো? হাদিসের বর্ণনাসমূহ এবং পুরো রুকূ'টির বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।[২০৬]

প্রথমত: এতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের গুরু-দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেলো যে, এ নির্দেশটি রাসূল সা.-এর নবুওয়াতের একেবারে প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়েছিলো যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো।

দ্বিতীয়ত: এর মধ্যে তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশি রাত পর্যন্ত কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মাজিদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিলো যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত: প্রথম রুকূ'তে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং মক্কার কাফিরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূ'টি যখন নাযিল হয়েছিলো তখন রাসূলুল্লাহ সা. ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্র আকার ধারণ করেছিলো।

দ্বিতীয় রুকূ' সম্পর্কে মুফাসসিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটাও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদিনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূ'টির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোনো প্রশ্নই ছিলো না। একে ফরযকৃত যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উপর একটি নির্দিষ্ট যাকাত দেয়া মদিনাতে ফরয হয়েছে।

---

২০৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২০৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৯, পৃ. ৮১-৮৩

২০৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

২০৬ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

সূরা আল মুদ্দাসসির : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৪র্থ এবং সূরা আল-মুয্যাম্মিলের পরে নাযিল হয়।[২০৭] এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিলো।[২০৮] গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছে এ বিষয়টি সর্বসম্মত স্বীকৃত যে, রাসূল সা.-এর উপর সর্বপ্রথম যে অহি নাযিল হয়েছিলো তা ছিলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, এ প্রথম অহি নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর কোনো অহি নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহি নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাসসিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিলো।[২০৯]

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩১তম এবং সূরা আল-ক্বারি'আর পরে নাযিল হয়।[২১০] কোনো হাদিস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ নং আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে রাসূলুল্লাহ সা. কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, 'এ অহিকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহ্বা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।' এরপর ২০শ আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫শ আয়াত পর্যন্ত চলছিলো। যে সময় হযরত জিবরাঈল আ. এ সূরাটি রাসূল সা. কে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখ আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদিসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সা. সবেমাত্র অহি নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং অহি গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনও গড়ে উঠেনি। কুরআন মাজিদে এর আরও দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্ব হা যেখানে রাসূলুল্লাহ সা. কে সম্বধন করে বলা হয়েছে,

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضٰى إِلَيْكَ وَحْيُه.

'আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহি পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।'[২১১]

দ্বিতীয়টি সূরা আ'লায়। এখানে নবী সা. কে স্বান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى 'আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর তুমি আর ভুলবে না।'[২১২] পরবর্তী সময়ে রাসূল সা. অহি ভালোভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।[২১৩]

---

২০৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

২০৮ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫

২০৯ আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ইবন হিশাম, অনূঃ আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবন হিশাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন ১৯৯৮), পৃ. ৫৮

২১০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

২১১ আল-কুরআন, ৭৫ : ১১৪

২১২ আল-কুরআন, ৮৭ : ৬

২১৩ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬০-১১৬২

সূরা আদ-দাহর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯৮তম এবং সূরা আর-রহমানের পরে নাযিল হয়।[২১৪] তাফসিরকারদের অধিকাংশই বলেছেন যে, এটা মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। আল্লামা যামাখশারি রহ., ইমাম রাযি, কাযি বায়যাবি, আল্লামা নিজামউদ্দিন নিশাপুরি, হাফেয ইবন কাসির এবং আরো অনেক তাফসিরকার এটাকে মাক্কি সূরা বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক মুফাসসিরের মতে পুরো সূরাটাই মাদানি। আবার কারো কারো মতে এটা মাক্কি সূরা হলেও এর ৮ম থেকে ১০ম পর্যন্ত আয়াতগুলো মদিনায় নাযিল হয়েছে। অবশ্য এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মাদানি সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এটা যে মক্কায় অবতীর্ণ শুধু তাই নয়, বরং মাক্কি যুগেরও সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে পর্যায়টি আসে সে সময় নাযিল হয়েছিলো। ৮ম থেকে ১০ম পর্যন্ত আয়াতগুলো গোটা সূরার বর্ণনাক্রমের সাথে এমনভাবে গাঁথা যে, যদি কেউ পূর্বাপর মিলিয়ে তা পাঠ করে তাহলে তার মনেই হবে না যে, এর আগের এবং পরের বিষয়বস্তু ১৫-১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিলো এবং এর কয়েক বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে।[২১৫]

সূরা আল মুরসালাত : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩৩তম এবং সূরা আল-হুমাযার পরে নাযিল হয়।[২১৬] এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পায় যে, এটা মাক্কি যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিলো। এর আগের দু'টো সূরা অর্থাৎ সূরা কিয়ামাহ ও সূরা দাহর এবং পরের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা আননাবা ও নাযি'আত যদি এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সূরাগুলো সব একই যুগে অবতীর্ণ।[২১৭] আর এর বিষয়বস্তুও একই যা বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের মন-মগজে বদ্ধমূল করা হয়েছে।

সূরা আন-নাবা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮০তম এবং সূরা আল-মা'আরিজের পরে নাযিল হয়।[২১৮] এ সূরার পূর্বে সূরা আল মুরসালাতের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করা যায় যে, সূরা আল-কিয়ামাহ থেকে আন-নাযি'আত পর্যন্ত সবক'টি সূরার বিষয়বস্তুর পরস্পরের সাথে একটা মিল আছে এবং এ সবগুলোই মক্কা মুকাররমার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিলো বলে প্রবল ধারণা করা হয়।[২১৯]

সূরা আন নাযি'আত : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮১তম। সূরা আন-নাবার পরে নাযিল হয়।[২২০] হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ এর পরে এ সূরাটি নাযিল হয়।[২২১]

সূরা আবাসা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২৪তম এবং সূরা আন-নাজমের পরে নাযিল হয়।[২২২] একবার নবী কারিম সা.-এর মজলিসে মক্কা

---

২১৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২১৫ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ১১৮-১২০
২১৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
২১৭ আল্লামা আলুসি, *রূহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৯, পৃ. ১৬-১৭১
২১৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬
২১৯ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৩৯-৪৪০
২২০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
২২১ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩
২২২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

মুকাররমার বড় বড় কয়েকজন লোক বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবি ইবন উম্মে মাকতূম রা. তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এ প্রশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে বাঁধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী কারিম সা. বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এ ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময়কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[২২৩]

সূরা আত তাকভির : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭ম এবং সূরা আল-লাহাবের পরে নাযিল হয়।[২২৪] বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট জানা যায়, এটি মক্কা মুকাররমার প্রথম যুগের নাযিলকৃত সূরারগুলোর অন্তর্ভূক্ত।[২২৫]

সূরা আল-ইনফিতার : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮২তম এবং সূরা আন-নাযি'আতের পরে নাযিল হয়।[২২৬] এ সূরার ও সূরা আত তাকবীরের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়। এথেকে বুঝা যায়, এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে।[২২৭]

সূরা আল মুত্বফফিফীন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮৬তম এবং সূরা আল-'আনকাবুতের পরে নাযিল হয়।[২২৮] এ সূরার বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটা মক্কা মুকাররমায় প্রথম দিকে নাযিল হয়।[২২৯] সে সময় আখিরাত বিশ্বাসকে মক্কাবাসীদের মনে পাকা-পোক্তভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য একের পর এক সূরা নাযিল হচ্ছিল। সূরাটা ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন মক্কার লোকেরা পথে-ঘাটে, বাজারে, মজলিসে-মাহফিলে মুসলিমদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলো এবং তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছিলো। তবে জুলুম-নিপীড়ন ও মারপিট করার যুগ তখনও শুরু হয়নি। কোনো কোনো মুফাসসির এ সূরাকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী কারিম সা. যখন মদিনায় এলেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজন ও পরিমাপে কম দেয়ার রোগ ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো। তখন আল্লাহ নাযিল করেন وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ সূরাটি।[২৩০]

সূরা আল ইনশিক্বক্ব : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮৪তম এবং নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮৩তম এবং সূরা আল-ইনফিতারের পরে নাযিল হয়।[২৩১] এ সূরাটাও মক্কা মুকাররমার প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলো অন্তর্ভুক্ত।[২৩২] এ সূরার মধ্যে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার অভ্যন্তরীণ বক্তব্য ও বিষয়াবলি থেকে একথা জানা যায় যে, যখন এ সূরাটা নাযিল হয় তখন জুলুম-নিপীড়নের ধারাবাহিকতা শুরু হয়নি। তবে কুরআনের দা'ওয়াতকে তখন মক্কায়

---

২২৩ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৮-১১৮০
২২৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
২২৫ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ২২৬-২৩০
২২৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২২৭ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ৬২-৬৪
২২৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২২৯ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৭৮-৪৮০
২৩০ সুনানে নাসাঈ; সুনানে ইবন মাজাহ; ইবন মারদুইয়া, ইবন জারির, বাইহাকি ফী শু'আবিল ঈমান
২৩১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
২৩২ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯

প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। একদিন কিয়ামত হবে এবং সমস্ত মানুষকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে একথা মেনে নিতে লোকেরা অস্বীকার করছিলো।

সূরা আল বুরূজ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২৭তম এবং সূরা আশ-শামসের পরে নাযিল হয়।[২৩৩] এ সূরার বিষয়বস্তু থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ সূরাটা মক্কা মুকাররমার এমন এক সময় নাযিল হয় যখন মুশরিকদের জুলুম-নিপীড়ন তুঙ্গে উঠেছিলো এবং তারা কঠিনতম শাস্তি দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম বিচ্যুত করার চেষ্টা করছিলো।[২৩৪]

সূরা আত তৃরিক : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩৬তম এবং সূরা আল-বালাদের পরে নাযিল হয়।[২৩৫] বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুকাররমার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কা কাফিররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সা.-এর দা'ওয়াতি কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়েই এ সূরাটা নাযিল হয়। সর্বপ্রথম আকাশের তারকাগুলোকে এ মর্মে স্বাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্বজাহানের কোনো একটি জিনিসও নেই যা কোনো এক সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখো কিভাবে এক বিন্দু শুক্র থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি জীবন্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।[২৩৬] পৃথিবীর মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিলো সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব-নিকেশই হবে এ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য। সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোনো ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।

সূরা আল-আ'লা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৮ম এবং সূরা আত-তাকভিরের পরে নাযিল হয়।[২৩৭] সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।[২৩৮] ষষ্ঠ আয়াতে 'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।' এ আয়াতটাও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটা এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন রাসূলুল্লাহ সা. ভালোভাবে অহি আয়ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি এবং অহি নাযিলের সময় তার কোনো শব্দ ভুলে যাবেন বলে আশংকা করতেন। এ আয়াতের সাথে যদি সূরা 'তৃহা'-এর ১১৪ আয়াত ও সূরা 'কিয়ামাহ'-এর ১৬শ-১৯শ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটা সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভঙ্গি ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লিখিত ঘটনাবলিকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায়, সর্বপ্রথম নবী কারিম সা. কে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা কর না,

---

২৩৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
২৩৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯১-১১৯২
২৩৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
২৩৬ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১-৫
২৩৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২৩৮ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ১০১-১০৩

আমি তোমাকে এ বাণী পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পর যখন সূরা কিয়ামাহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহির শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় 'হে নবী! এ অহিকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য নিজের জিহ্বা সঞ্চালন করো না। এগুলোকে মুখস্ত করানো ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন এগুলো পড়া হয়, তখন মনের পর্দায় বাজতে থাকে– 'তারপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।' শেষবার সূরা ত্বহা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী কারিম সা. আবার এর পরপর নাযিল হওয়া ১১৩ টি আয়াতের কোনো অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয়, 'আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহি সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে না যায়।' এরপর আর কখনও এমনটি ঘটেনি। নবী কারিম সা. আর কখনও এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত নেই।

সূরা আল-গশিয়াহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬৮তম এবং সূরা আয-যারিয়াতের পরে নাযিল হয়।[২৩৯] এ সূরার সমগ্র বিষয়বস্তু এ কথা প্রমাণ করে যে, এটাও প্রথম দিক অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভূক্ত।[২৪০] কিন্তু এটা এমন সময় নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ সা. সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর দা'ওয়াত শুনে তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করছিলো।

সূরা আল-ফাজর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৮৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০তম এবং সূরা আল-লাইলের পরে নাযিল হয়।[২৪১] এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটা এমন যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুকাররমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিলো। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ, ফিরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।[২৪২]

সূরা আল-বালাদ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩৫তম এবং সূরা ক্বাফের পরে নাযিল হয়।[২৪৩] এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মক্কা মুকাররমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতই। তবে এর মধ্যে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযিল হয়েছিলো যখন মক্কার কাফিররা নবী সা. এর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিলো এবং তাঁর উপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালান নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিলো।[২৪৪]

সূরা আশ-শামস : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২৬তম এবং সূরা আল-ক্বদরের পরে নাযিল হয়।[২৪৫] বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে জানা যায়, এ

---

২৩৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
২৪০ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫০৯-৫১০
২৪১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪
২৪২ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩
২৪৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২৪৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০২-১২০৪
২৪৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

সূরাটিও মক্কা মুকাররমার প্রথম দিকে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর বিরোধিতা তুংগে উঠেছিলো।[২৪৬]

সূরা আল-লাইল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯২তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯ম এবং সূরা আ'লার পরে নাযিল হয়।[২৪৭] পূর্ববর্তী সূরা আশ-শামসের সাথে এ সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ-শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এ সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাযিল হয়।[২৪৮]

সূরা আদ-দুহা : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯৩তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১১শ এবং সূরা আল-ফাজরের পরে নাযিল হয়।[২৪৯] এ সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মুকাররমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়।[২৫০] হাদিস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহির অবতরণ বন্ধ ছিলো। এজন্য নবী সা. অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তার মনে এ আশংকা উদয় হচ্ছিল, হয়ত তার এমন ক্রটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহির ধারাবাহিকতা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পিছনে একই কারণ সক্রিয় ছিলো যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে।

সূরা আলাম নাশরাহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১২শ এবং সূরা আদ-দুহার পরে নাযিল হয়।[২৫১] সূরা আদ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়।[২৫২] হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, মক্কা মুকাররমায় আদ দুহার পরেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

সূরা আত-তীন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯৫তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২৮তম এবং সূরা আল-বুরুজের পরে নাযিল হয়।[২৫৩] কাতাদাহ এ সূরাকে মাদানি সূরা বলেন। ইবন আব্বাস রা. থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি বক্তব্যে একে মাক্কি এবং অন্যটিতে মাদানি বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মাক্কি গণ্য করেছেন।[২৫৪] এর মাক্কি হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এ যে, এ সূরায় মক্কা শহরের জন্য 'এ নিরাপদ শহরটি' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদিনায় এটি নাযিল হত তাহলে মক্কার জন্য 'এ শহরটি' বলা ঠিক হত না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটাকে মক্কা মুকাররমারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তর্ভূক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময়

---

২৪৬ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ৭২-৭৫
২৪৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
২৪৮ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ১৪৭-১৪৯
২৪৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
২৫০ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮
২৫১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
২৫২ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬
২৫৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
২৫৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১১-১২১২

কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিলো এমন কোনো চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মাক্কি যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মত একই বর্ণনাভঙ্গি পাওয়া যায়। এ ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

সূরা আল-আলাক্ব : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম। এর পূর্বে কোনো সূরা নাযিল হয়নি।[২৫৫] এ সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি ১ম আয়াত থেকে ৫ম আয়াত পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় অংশটি ৬ষ্ঠ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত। প্রথম অংশটা যে রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহি এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলিম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত পোষণ করেন।[২৫৬]

সূরা আল ক্বদর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯৭তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২৫তম এবং সূরা আবাসার পরে নাযিল হয়।[২৫৭] এর মাক্কি বা মাদানি হবার ব্যাপারে দ্বিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহরুল মুহিত গ্রন্থে দাবি করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানি সূরা। আলী ইবন আহমাদুল ওয়াহেদি তার তাফসিরে বলেছেন, এটি মদিনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা। অন্যদিকে আল মারওয়ারদি বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মাক্কি সূরা। ইমাম সুয়ুতী ইতকান গন্থে একথাই লিখেছেন। ইবন মারদুইয়া ইবনে আব্বাস রা., ইবন যুবাইর রা. ও হযরত আয়িশা রা. থেকে এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছিলো। সূরা বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর মক্কায় নাযিল হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।[২৫৮]

সূরা আল-বাইয়িনাহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯৮তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১০০তম এবং সূরা আত-ত্বালাকের পরে নাযিল হয়।[২৫৯] এ সূরাটারও মাক্কি বা মাদানি হবার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অনেক মুফাসসির বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে এটি মাক্কি সূরা। আবার অনেক মুফাসসির বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে এটি মাদানি।[২৬০] ইবন আব্বাস ও কাতাদাহ রা. থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তি অনুযায়ী এটা মাক্কি এবং অন্য উক্তি অনুযায়ী এটা মাদানি সূরা। হযরত আয়িশা রা. এ সূরাকে মাক্কি গণ্য করেন। বাহরুল মুহিত গ্রন্থ প্রণেতা আবুল হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতা আব্দুল মুনঈম ইবনুল ফারাস মাক্কি হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অন্যদিকে সূরাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কোনো আলামত পাওয়া যায় না যা থেকে এর মাক্কি বা মাদানি হওয়ার ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করা যেতে পারে।

সূরা আল-যিলযাল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৯৯তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৯৩তম এবং সূরা আন-নিসার পরে নাযিল হয়।[২৬১] এর মাক্কি বা মাদানি হওয়ার ব্যাপারে

---

২৫৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
২৫৬ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১১৭-১১৮
২৫৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
২৫৮ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ১৮৮-১৯০
২৫৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২৬০ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৫০-৫৫১
২৬১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

মতবিরোধ রয়েছে। ইবন মাসউদ রা., আতা, জাবির ও মুজাহিদ রহ. বলেন, এটা মাক্কি সূরা। ইবন আব্বাস রা. একটি উক্তিও এর সমর্থন করে। অন্যদিকে কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, এটা মাদানি সূরা।[২৬২] এর মাদানি হওয়ার সমর্থনে ইবন আব্বাস রা.-এরও অন্য একটা উক্তি পাওয়া যায়। ইবন আবি হাতিম হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে যে বর্ণনাটা উদ্ধৃত করেছেন তার থেকেও এর মাদানি হওয়ার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে– যখন فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه আয়াতটা নাযিল হয় তখন আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বললাম– হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার আমল দেখবো? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এ বড় বড় গুণাহগুলোও দেখবো? জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ছোট ছোট গুণাহগুলোও? তিনি বললেন হ্যাঁ। একথা শুনে আমি বললাম, তাহলে আমি মারা পড়েছি। তিনি বললেন, আনন্দিত হও, হে আবু সাঈদ কারণ প্রত্যেক নেকি তার নিজের মতো দশটা নেকির সমান হবে। এ হাদিস থেকে এ সূরাটির মাদানি হবার ভিত্তিমূলক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূরা আল-আদিয়াত : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১০০ ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১৪শ এবং সূরা আল-আছরের পরে নাযিল হয়।[২৬৩] এ সূরাটা মাক্কি বা মাদানি হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা., জাবির রা., হাসান বসরি, ইকরামা ও আতা বলেন, এটা মাক্কি সূরা।[২৬৪] হযরত আনাস ইবন মালিক ও কাতাদাহ একে মাদানি সূরা বলেন। অন্যদিকে হযরত ইবন আব্বাস রা. থেকে দুই ধরনের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটা মত হচ্ছে এটা মাক্কি সূরা এবং অন্য একটি বক্তব্যে তিনি একে মাদানি সূরা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরার বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটা কেবল মাক্কি সূরাই নয় বরং মাক্কি যুগেরও প্রথম দিকে নাযিল হয়।

সূরা আল ক্বারি'আহ্ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১০১ ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩০তম এবং সূরা কুরাইশের পরে নাযিল হয়।[২৬৫] এ সূরাটা মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। বরং এর বক্তব্য বিষয় থেকে প্রকাশ হয়, এটিও মক্কা মুকাররমার প্রথম দিকে নাযিলকৃত হয়।[২৬৬]

সূরা আত তাকাছুর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১০২ ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১৬শ এবং সূরা আল-কাউছারের পরে নাযিল হয়।[২৬৭] আবু হাইয়ান ও শাওকানি বলেন, সকল তাফসিরকার এ সূরাকে মাক্কি সূরা গণ্য করেছেন। ইবন জারির, তিরমিজি, ইবন মুনযির প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আলি রা.-এর একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন– 'কবরের আযাব সম্পর্কে আমরা সব সময় সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত 'আলহা-কুমুত তাকাছুর' নাযিল হল।' হযরত আলি রা.-এর এ বক্তব্যকে এ সূরা মাদানি

২৬২ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯
২৬৩ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
২৬৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১৬-১২১৭
২৬৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
২৬৬ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১৬৪-১৬৭
২৬৭ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

হওয়ার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কারণ হচ্ছে এ যে, কবরের আযাবের আলোচনা মদিনায় শুরু হয়। মক্কায় এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয়নি। কিন্তু এ কথাটি আসলে ঠিক নয়।[২৬৮] কুরআনের মাক্কি সূরাগুলোর বিভিন্ন স্থানে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবরের আযাবের কথা বলা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই সেখানে নেই। যেমন সূরা আন'আম ৯৩ আয়াত, আন-নামল ২৮ আয়াত, আল-মু'মিনুন ৯৯-১০০ আয়াত, সূরা মু'মিন ৪৫-৪৬ আয়াত। এগুলো সবই মাক্কি সূরা। তাই হযরত আলি রা.-এর উক্তি থেকে যদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয় তাহলে তা হচ্ছে এ যে, উপরোল্লিখিত মাক্কি সূরাগুলো নাযিলের পূর্বে সূরা আত-তাকাছুর নাযিল হয় এবং এ সূরাটি নাযিল হওয়ার ফলে সাহাবিগণের মধ্যে বিরাজিত কবরের আযাব সম্পর্কিত সংশয় দূর হয়ে যায়। এ কারণে এ হাদিসগুলো সত্ত্বেও মুফাসসিরগণের অধিকাংশই এর মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে একমত; বরং এটা মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।

সূরা আল-আছর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১০৩ ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১৩শ এবং সূরা আশ-শারহর পরে নাযিল হয়।[২৬৯] মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানি বলেছেন। কিন্তু মুফাসসিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মাক্কি সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এ সূরার বিষয়বস্তু প্রমাণ করে, এটা মাক্কি যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হত। এভাবে শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারত না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকত।

সূরা আল-হুমাযাহ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১০৪তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৩২তম এবং সূরা আল-ক্বিয়ামার পরে নাযিল হয়।[২৭০] এ সূরাটির মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে মুফাসসরিগণ একমত পোষণ করেছেন। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে এটিও রাসূলে নবুওয়াত পাওয়ার পর মক্কায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়।[২৭১]

সূরা আল-ফীল : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১০৫ ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১৯শ এবং সূরা আল-কাফিরূনের পরে নাযিল হয়।[২৭২] এ সূরাটির মাক্কি হবার ব্যাপারে সবাই একমত।[২৭৩] এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্কা মুকাররমায় ইসলামের প্রথম যুগে এটা নাযিল হয় বলে মনে হবে।

সূরা কুরাইশ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১০৬তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ২৯তম এবং সূরা আত-তীনের পরে নাযিল হয়।[২৭৪] যাহহাক ও কালবি একে মাদানি বললেও মুফাসসিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সূরার

---

২৬৮ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৬৩
২৬৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
২৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
২৭১ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০১
২৭২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
২৭৩ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২১
২৭৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪

শব্দাবলির মধ্যেও এর মাক্কি হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন 'এ ঘরের রব'। এ সূরাটি মদিনায় নাযিল হলে কাবাঘরের জন্য 'এ ঘর' শব্দ দু'টি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল-ফিলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সম্ভবত আল ফল নাযিল হওয়ার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিলো। উভয় সূরার মধ্যে এ গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের কারণে প্রথম যুগের কোনো কোনো মনীষী এ দু'টি সূরাকে মূলত একটি সূরা হওয়ার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দু'টি সূরাকে একসাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দু'য়ের মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখা ছিলো না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরও শক্তশালী করেছে। তাছাড়া যরত উমর রা. একবার কোনো ভেদ চিহ্ন ছাড়াই এ সূরা দু'টি একাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রা. বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মাজিদের যে অনুলিপি তৈরী করে ইসলামি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে উভয় সূরার মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখা ছিলো। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মাজিদ এ দু'টি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এছাড়াও এ সূরা দু'টির বর্ণনা ভঙ্গি পরস্পর থেকে এত বেশি বিভিন্ন যে, এ দু'টির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হওয়ার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[২৭৫]

সূরা আল মা'উন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১০৭**তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **১৭**শ এবং সূরা আত-তাকাছুরের পরে নাযিল হয়।[২৭৬] ইবন মারদুইয়া ইবন আব্বাস রা. ও ইবন যুবাইরের রা. উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[২৭৭] তাতে তাঁরা এ সূরাটিকে মাক্কি হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবিরও এ একই উক্তি করেছেন।

সূরা আল কাউছার : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১০৮**তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **১৫**শ এবং সূরা আল-'আদিয়াতের পরে নাযিল হয়।[২৭৮] ইবন মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রা. ও হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটা মাক্কি সূরা। কালবী ও মুকাতিল একে মাক্কি বলেন।[২৭৯] অধিকাংশ তাফসিরকারও এ মত পোষণ করেন।

সূরা আল কাফিরূন : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১০৯**তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **১৮**শ এবং সূরা মা'উনের পরে নাযিল হয়।[২৮০] হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, হযরত হাসান বসরি ও ইকরামা বলেন, এটি মাক্কি সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রা. বলেন, মাদানি। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা একে মাক্কি ও মাদানি উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি মাক্কি সূরা। তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মাক্কি হওয়ার কথা প্রমাণ করে।[২৮১]

---

২৭৫ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ২০০-২০৪
২৭৬ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
২৭৭ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ২৪১-২৪৩
২৭৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
২৭৯ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৭৪
২৮০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
২৮১ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩

সূরা আন-নাছর : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১১০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ১১৪তম এবং সূরা আত-তাওবার পরে নাযিল হয়।[২৮২] হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. একে কুরআন মাজিদের শেষ সূরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৮৩] এরপর রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর আর কোনো পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।[২৮৪] হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরিকের মাঝামাঝি সময় মিনায় নাযিল হয়। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর উঠের পিটে সওয়ার হয়ে বিখ্যাত বিদায় হজ্জের ভাষণটি দেন।[২৮৫]

সূরা আন-নাছরের নাযিল হওয়া ও রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তিকালের মধ্যে ৩ মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিলো। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও রাসূলের সা. ওফাতের মাঝখানে এ ক'টি দিনই অতিবাহিত হয়েছিলো। ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা মতে এ সূরাটা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে এবং আমার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে।[২৮৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়াত থেকে বলা হয়েছে, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[২৮৭]

সূরা আল-লাহাব : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ১১১তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৬ষ্ঠ এবং সূরা আল-ফাতিহার পরে নাযিল হয়।[২৮৮] এর মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে তাফসিরকারদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু মাক্কি যুগের কোন্ সময়ে এটা নাযিল হয়েছিলো তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর ইসলামি দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে প্রবল ধারণা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়েছিলো যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে শত্রুতার সীমা পেরিয়ে গিয়েছিলো এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাঁধার সৃষ্টি করেছিলো। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর বংশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শিয়াবে আবু তালিবে (আবু তালিব গিরিপথ) অন্তরীণ করেছিলো এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বংশের লোকদের পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে অবস্থান করছিলো, আবু লাহাব ছিলো রাসূলুল্লাহ সা. এর চাচা আর ভাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারত না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলুম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হত তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিপূর্ণ মনে করত। কারণ ভাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা শোভা পায় না।[২৮৯]

---

২৮২ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

২৮৩ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২৫-১২২৬

২৮৪ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৪ হি.), পৃ. ৩৯৬, হাদিস নং ৩০২৪

২৮৫ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি' আত-তিরমিজি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.) পৃ. ৫৩২, হাদিস নং ৩৩৬২

২৮৬ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৭৮

২৮৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহিহ আল-বুখারি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬, হাদিস নং ৪৯৬৮

২৮৮ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯

২৮৯ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ২৩৪-২৩৬

সূরা আল-ইখলাছ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা **১১২**তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় **২২**তম এবং সূরা আন-নাসের পরে নাযিল হয়।[২৯০] এর মাক্কি ও মাদানি হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সা. কে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয় আমাদের জানান।[২৯১] এ কথায় এ সূরাটি নাযিল হয়। আবুল আলিয়াহ হযরত উবাই ইবনে কাবের রা. বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয় আমাদের জানান এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।[২৯২] হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোনো হাদিস অনুযায়ী লোকেরা) নবী স.-কে বলে, আপনার রবের বংশধারা আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ সুরাটি নাযিল করেন।[২৯৩]

কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে, এ সূরাটা আসলে মাক্কি। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মক্কায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে কুরআনের কোনো বিস্তারিত আয়াত তখন পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনও লোকেরা রাসূলুল্লাহ সা. এর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের বার্তা শুনতে যেতে চাইত, তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত-বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহ্বান জানান হচ্ছে, মক্কায় হযরত বিলালকে রা. তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের উপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিত তখন তিনি 'আহাদ', 'আহাদ' বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিলো।[২৯৪]

মু'আওবিযাতাইন (সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা-আন নাস) : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরা আল-ফালাক্ব **১১৩**তম ও সূরা আন-নাস **১১৪**তম এবং নাযিলের ধারাবাহিকতায় সূরা আল-ফালাক্ব **২০**শ ও সূরা আন-নাস **২১**তম। সূরা আল-ফালাক্ব সূরা ফীলের পরে এবং আন-নাস সূরা ফালাক্বের পরে নাযিল হয়।[২৯৫] হযরত হাসান বসরি, ইকরাম, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি মাক্কি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় একে মাদানি বলা হয়েছে। যে সমস্ত হাদিস এ দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে হযরত উকবা ইবনে আমের রা. বর্ণিত একটি হাদিস হচ্ছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেন, 'তোমরা কি কোনো খবর রাখো, আজ রাতে আমার উপর কেমন ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে? নজিরবিহীন আয়াত! কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস।'[২৯৬]

---

২৯০ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৯১ আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা বলতো, انسبه لنا। (এর বংশধারা আমাদের জানাও) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হত বংশধারার। সে কোন বংশের লোক? কোন গোত্রের সাথে সম্পর্কিত? একথা জানার প্রয়োজন হত। কাজেই তঁরা যখন রাসূলুল্লাহ সা. থেকে তাঁর রব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হল তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাঁকে একই প্রশ্ন করল। তারা প্রশ্ন করল, انسب لنا ربك। অর্থাৎ আপনার রবের নসবনামা (বংশধারা) আমাদের জানান। দ্র. আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ২৬৪

২৯২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহিহ আল-বুখারি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১, হাদিস নং ৫০১৩

২৯৩ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৮২-৫৮৩

২৯৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ২৬৫-২৬৬

২৯৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫, ২৮৩

২৯৬ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৪

হযরত উকবা ইবনে আমের রা. হিজরতের পরে মদিনা তাইয়েবায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলেই এ হাদিসের ভিত্তিতে এ সূরা দু'টিকে মাদানি বলার যৌক্তিকতা দেখা যায়। আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের বর্ণনায় একথাই বিবৃত করেছেন। অন্য যে রিওয়ায়াতগুলো এ বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে সেগুলো ইবন সা'দ, মুহিউস সুন্নাহ বাগবি, ইমাম নাসাঈ, ইমাম বাইহাকি, হাফিয ইবন হাজার, হাফিয বদরুদ্দিন 'আইনি, আবদ ইবনে হুমায়িদ এবং আরও অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে, ইয়াহুদিরা যখন মদিনায় রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর যাদু করেছিলো এবং তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা নাযিল হয়েছিলো। ইবনে সা'দ ওয়াকেদির বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এটি সপ্তম হিজরির ঘটনা। এরই ভিত্তিতে সুফিয়ান ইবন উয়াইনাও এ সূরা দু'টিকে মাদানি বলেছেন।
কোনো সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, অমুক সময় সেটি নাযিল হয়েছিলো। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এ হয় না যে, সেটা প্রথমবার ঐ সময় নাযিল হয়েছিলো। বরং অনেক সময়. এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছিলো, তারপর কোনো বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী কারিম সা.-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিলো। তাফসিরকারদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমেরই। এদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, প্রথমে মক্কায় এমন এক সময় সূরা দু'টো নাযিল হয়ছিলো যখন সেখানে নবী কারিম সা.-এর বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীকালে যখন মদিনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইয়াহুদি ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দু'টো পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। উপরে উল্লিখিত হযরত উকবা ইবনে আমের রা.-এর রিওয়ায়াতে একই কথা বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হুকুমে হযরত জিবরাঈল আ. এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টো সূরা পড়ার হুকুম দিলেন। তাই তাফসিরকারদের মতে এ সূরা দু'টোকে মাক্কি গণ্য করেন তাদের বর্ণনাই বেশি নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে, এ ছাড়া আল-ফালাকের বাকি সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবক'টি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দু'টোকে সম্পর্কিত করার পথে এটাও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মানবজাতির জন্য সর্বশেষ হিদায়াতের বাণী বাহক ঐশীগ্রন্থ। এ গ্রন্থে ১১৪টি সূরা রয়েছে। প্রত্যেকটি সূরার রয়েছে নির্দিষ্ট ও বিশেষ প্রেক্ষাপট। প্রায় সূরার বিশেষ প্রেক্ষাপট হাদিস ও তাফসির গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তবে কোনো কোনো সূরার প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট সূরা বা তার পূর্বাপরের সূরার অর্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করলে আল-কুরআনের একটা সূরার মর্ম উপলব্ধি করার মাধ্যমে অন্য সূরার প্রেক্ষাপট জানা সহজ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়
মাক্কি সূরাসমূহের পরিচিতি ও বিষয়বস্তু

প্রথম পরিচ্ছেদ : মাক্কি সূরার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

কুরআন মাজিদ সর্বস্তরের মানুষের পথপ্রদর্শক। একজন দা‘ঈ কী পদ্ধতিতে দা‘ওয়াত দিবেন তার শিক্ষা তাকে কুরআন মাজিদ থেকেই গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে কুরআন মাজিদের মাক্কি ও মাদানি আয়াত দা‘ঈকে পরিবেশগত সঠিক শিক্ষা দিতে পারে। এ কারণে মাক্কি-মাদানি সূরা বা আয়াতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। বিশিষ্ট মুফাসসির সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ রা. বলেন,

> ‘সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর কিতাবের এমন কোনো সূরা নাযিল হয়নি যা কোথায় নাযিল হয়েছে তা আমি জানি না। আর আল্লাহর কিতাবের এমন কোনো আয়াত নাযিল হয়নি, যা কি ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তা আনি জানি না। যদি আমি এমন কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে জানতাম যিনি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার থেকে অধিক জ্ঞান রাখেন আর উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে তার কাছে যাওয়া যাবে, তাহলে আমি অবশ্যই তার নিকট ভ্রমণ করতাম।’[১]

পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের মাক্কি-মাদানি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুরআনের তাফসির করার সময় এ জ্ঞান তাফসির কারককে প্রভুত সহায়তা প্রদান করে। নাযিলের স্থান জানা থাকলে আয়াতের অর্থ অনুধাবন এবং সঠিক তাফসির করা সহজ হয়। দুই আয়াতের অর্থে কোনো বৈপরিত্য দেখা দিলে মুফাসসিরগণ নাসিখ মানসূখ নির্ণয় করতে পারেন।[২] কেননা পরবর্তী আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের নাসিখ।[৩]

মাক্কি সূরার পরিচয়

মাক্কি সূরার পরিচয়ে মুহাক্কিক আলিমগণের তিনটি পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে :

ক. যেখানেই নাযিল হোক না কেনো, যে সকল সূরা রাসূল সা. এর মদিনায় হিজরতের পূর্বে মাক্কি জীবনে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে মাক্কি সূরা বলে, যদিও তা মক্কার বাইরে নাযিল হয়। পক্ষান্তরে হিজরতের পর যা নাযিল হয়েছে তা মাদানি, যদিও তা মদিনার বাইরে অবতীর্ণ হয়।

---

১ والله الذى لا إله غيره، ما تزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نوبت؟ ولا نولت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت؟ ولو أعلم، أن أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل لركبت إليه. দ্র. মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল বুখারি, *সহিহ বুখারি*(দোহা : ওয়াকফ ও ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩০ হি.), খ.৮, পৃ. ৫১৭, হাদিস নং ৫০০২; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৪ হি.), হাদিস নং ২৪৬৩; মান্না‘ খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী ‘উলূমিল কুরআন*(কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ), পৃ. ৪৬

২ ‘শারি‘আতের কোনো হুকুম শারি‘আতের অন্য কোনো দলিলের ভিত্তিতে রহিত করে দেয়া। অর্থাৎ যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা শারি‘আতের একটি হুকুম প্রবর্তন করেন। পরবর্তী যুগে আবার আল্লাহ তা‘আলা অন্য কোনো হিকমতের লক্ষ্যে এ হুকুম রহিত করে নতুন একটা হুকুম প্রবর্তন করেছেন। এ রহিত করণকে আরবিতে নাসখ বলে। পূর্ববর্তী যে হুকুমকে রহিত করা হয় তাকে মানসূখ বলে। আর নতুন প্রবর্তিত হুকুমকে নাসিখ বলে।’ দ্র. মুহাম্মদ আব্দুল আযিম আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী ‘উলূমিল কুরআন*(বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৫ হি.), খ.২, পৃ. ১৯৩

৩ মান্না‘ আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী ‘উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

কাজেই হিজরতের পর মক্কা বা 'আরাফায় যা নাযিল হয়েছে তা মাদানি। যেমন, মক্কা বিজয়ের বছর কা'বার অভ্যন্তরে নাযিল হয়,[৪]

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا.

অনুরূপভাবে বিদায় হজ্জের সময় জুমু'আর দিনে আরাফার ময়দানে নাযিল হয়,[৫]

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

সূরা নাছর মক্কায় নাযিল হয়েও হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে বিধায় এটা মাদানি সূরা হিসেবে গণ্য; মাক্কি সূরা নয়।

খ. মক্কা মুকাররমা এবং এর আশপাশের এলাকায় যে সূরা বা আয়াত নাযিল হয়েছে তাকে মাক্কি বলে। যেমন– মিনা, 'আরাফা, হুদাইবিয়া। পক্ষান্তরে মদিনা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় যা নাযিল হয়েছে তাকে মাদানি বলা হয়। যেমন– উহুদ, কুবা, সালা', বদর ইত্যাদি স্থান। এ সংজ্ঞায় স্থানের দৃষ্টিতে মাক্কি বা মাদানি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এমন কিছু আয়াত আছে যা এ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয় না। যেমন– সূরা তাওবার আয়াত,[৬]

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ.

এ আয়াতটি তাবুকে নাযিল হয়। অনুরূপভাবে সূরা আয-যুখরুফের আয়াত,[৭]

وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا ۖ أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ.

এ আয়াতটি লাইলাতুল ইসরাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে নাযিল হয়। এ দু'টি এবং অনুরূপ আয়াতকে মাক্কিও বলা যাবে না এবং মাদানিও বলা যাবে না। কাজেই উল্লিখিত সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ নয়।

(গ) যাতে মক্কাবাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে তাকে মাক্কি বলা হয় এবং যাতে মদিনাবাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে তাকে মাদানি বলা হয়। এ সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা হয়, যে সকল আয়াতে يٰأَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাক্কি। আর যে সকল আয়াতে يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাদানি।

অধিকাংশ মক্কাবাসী কাফির ছিলো বলে তাদের يٰأَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধন করা হয়। অবশ্য অন্যান্যরাও এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ মদিনাবাসী ঈমানদার ছিলেন বলে তাদের يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। অন্যান্যরাও এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত। কোনো কোনো আলিম يٰبَنِىْ اٰدَمَ দ্বারা যে সম্বোধন করা হয়েছে তাকেও মাক্কি বলে অভিহিত করেছেন।[৮] এ প্রসঙ্গে আবু উবাইদ রহ. তাঁর فضائل القرآن গ্রন্থে মাইমুন ইবন মিহরান থেকে বর্ণনা করেন,[৯]

---

৪ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তার উপযুক্ত প্রাপকের নিকট অর্পণ করো।' দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

৫ আল-কুরআন, ৫ : ৩

৬ আল-কুরআন, ৯ : ৪২

৭ আল-কুরআন, ৪৩ : ৪৫

৮ জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতি, *আল-ইতকান ফী 'উলুমিল কুরআন*(মদিনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪২০ হি.), খ.১, পৃ. ৯

৯ 'কুরআন মাজিদে يأيها الناس অথবা يا بنى آدم বলে যে সম্বোধন আছে তা মাক্কি। আর যাতে يأيها الذين اٰمنوا বলে সম্বোধন আছে তা মাদানি।' দ্র. আয-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৬০

ما كان في القرآن يٰأيها الناس، أو يا بني اٰدم فإنه مكي، وما كان يٰأيها الذين اٰمنوا، فإنه مدني.
এ সংজ্ঞার আলোকে দু'টি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়–
এক. উল্লিখিত দু'টি সম্বোধন মূলক বাক্যের কোনো একটি ছাড়াই অধিকাংশ সূরার সূচনা করা হয়েছে। যেমন–

সূরা আল-আহযাবের প্রারম্ভে রয়েছে,[১০]

يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

সূরা মুনাফিকুনের শুরুতে রয়েছে,[১১] إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ.

দুই. মাদানি সূরার সূচনা করা হয়েছে, يٰأَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা এবং মাক্কি সূরার সূচনা করা হয়েছে, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১২]

يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ.

এটা সূরা নিসার প্রথম আয়াত। আয়াতটা মাদানি।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১৩]

يٰأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

এটাও মাদানি আয়াত। অথচ উক্ত আয়াত দু'টোর প্রারম্ভে يٰأَيُّهَا النَّاسُ রয়েছে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১৪]

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ.

এটা মাক্কি আয়াত। অথচ এখানে সূচনা করা হয়েছে, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা।
উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, মাক্কি-মাদানি সূরার সংজ্ঞার তিনটি পরিভাষার মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই সঠিক ও স্বার্থক সংজ্ঞা। আল্লামা যারকাশি রহ. বলেন,

'প্রসিদ্ধ মতে, হিজরতের পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাই মাক্কি, যদিও তা মদিনার কোনো এলাকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর হিজরতের পরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মাদানি, যদিও তা মক্কার কোনো স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে।'[১৫]

---

১০ 'হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।' দ্র. আল-কুরআন, ৩৩ : ১

১১ 'মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসলো তখন বললো, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি তো অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।' দ্র. আল-কুরআন, ৬৩ : ১

১২ 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে।' দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ১

১৩ 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।' দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২১

১৪ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু' করো, সিজদা করো, তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো এবং কল্যাণধর্মী কাজ করো, যাতে তোমরা সফলতা লার্জন করতে পারো।' দ্র. আল-কুরআন, ২২ : ৭৭

মাক্কি সূরার সংখ্যা ও তালিকা

আল-কুরআনের মোট সূরা সংখ্যা ১১৪টির মধ্যে ৮৬টি সূরা মাক্কি।[১৬] এ সূরাগুলোর নাযিল ও গ্রন্থিত ক্রমধারা অনুযায়ী সূরার নাম, রুকু ও আয়াত সংখ্যা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো :

নাযিলের ধারা	গ্রন্থিত ধারা	সূরার নাম	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
১	৯৬	সূরা আল-আলাক্ব	১	১৯
২	৬৮	সূরা আল-ক্বলাম	২	৫২
৩	৭৩	সূরা আল-মুয্যাম্মিল	২	২০
৪	৭৪	সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির	২	৫৬
৫	১	সূরা আল-ফাতিহা	১	৭
৬	১১১	সূরা আল-লাহাব	১	৫
৭	৮১	সূরা আত-তাকভির	১	২৯
৮	৮৭	সূরা আল-আ'লা	১	১৯
৯	৯২	সূরা আল-লাইল	১	২১
১০	৮৯	সূরা আল-ফাজর	১	৩০
১১	৯৩	সূরা আদ-দুহা	১	১১
১২	৯৪	সূরা আশ-শরহ	১	৮
১৩	১০৩	সূরা আল-আছর	১	৩
১৪	১০০	সূরা আল-আদিয়াত	১	১১
১৫	১০৮	সূরা আল-কাউছার	১	৩
১৬	১০২	সূরা আত-তাকাছুর	১	৮
১৭	১০৭	সূরা আল-মা'উন	১	৭
১৮	১০৯	সূরা আল-কাফিরূন	১	৬
১৯	১০৫	সূরা আল-ফীল	১	৫
২০	১১৩	সূরা আল-ফালাক্ব	১	৫
২১	১১৪	সূরা আন-নাস	১	৬
২২	১১২	সূরা আল-ইখলাছ	১	৪
২৩	৫৩	সূরা আন-নাজম	৩	৬২
২৪	৮০	সূরা আবাসা	১	৪২
২৫	৯৭	সূরা আল-ক্বদর	১	৫
২৬	৯১	সূরা আশ-শামস্	১	১৫
২৭	৮৫	সূরা আল-বুরূজ	১	২২
২৮	৯৫	সূরা আত-তীন	১	৮
২৯	১০৬	সূরা কুরাইশ	১	৪
৩০	১০১	সূরা আল-ক্বরি'আহ্	১	১১
৩১	৭৫	সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্	২	৪০
৩২	১০৪	সূরা আল-হুমাযাহ্	১	৯
৩৩	৭৭	সূরা আল-মুরসালাত	২	৫০
৩৪	৫০	সূরা ক্বফ	৩	৪৫

---

১৫ الْمشهور أن الْمكى ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بالْمدينة، والْمدنى ما نزل بعد الهجرة، وإن كان بمكة. দ্র. বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৪২৭ হি.), পৃ. ১৯৬

১৬ 'বিশুদ্ধ মতে মাক্কি সূরার সংখ্যা ৮৫টি।' দ্র. আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

নাযিলের ধারা	গ্রন্থিত ধারা	সূরার নাম	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৩৫	৯০	সূরা আল-বালাদ	১	২০
৩৬	৮৬	সূরা আত-ত্বরিক্ব	১	১৭
৩৭	৫৪	সূরা আল-ক্বমার	৩	৫৫
৩৮	৩৮	সূরা সোয়াদ	৫	৮৮
৩৯	৭	সূরা আল-আ'রাফ	২৪	২০৬
৪০	৭২	সূরা আল-জ্বিন্ন	২	২৮
৪১	৩৬	সূরা ইয়াসিন	৫	৮৩
৪২	২৫	সূরা আল-ফুরকান	৬	৭৭
৪৩	৩৫	সূরা আল-ফাতির	৫	৪৫
৪৪	১৯	সূরা মারইয়াম	৬	৯৮
৪৫	২০	সূরা ত্বোয়াহা	৮	১৩৫
৪৬	৫৬	সূরা আল-ওয়াকি'আহ	৩	৯৬
৪৭	২৬	সূরা আশ-শু'আরা	১১	২২৭
৪৮	২৭	সূরা আন-নামল	৭	৯৩
৪৯	২৮	সূরা আল-ক্বাসাস	৯	৮৮
৫০	১৭	সূরা বনি ইসরাঈল	১২	১১১
৫১	১০	সূরা ইউনুস	১১	১০৯
৫২	১১	সূরা হুদ	১০	১২৩
৫৩	১২	সূরা ইউসুফ	১২	১১১
৫৪	১৫	সূরা আল-হিজর	৬	৯৯
৫৫	৬	সূরা আল-আন'আম	২০	১৬৫
৫৬	৩৭	সূরা আস-সফ্‌ফাত	৫	১৮২
৫৭	৩১	সূরা লুকমান	৪	৩৪
৫৮	৩৪	সূরা সাবা	৬	৫৪
৫৯	৩৯	সূরা আয-যুমার	৮	৭৫
৬০	৪০	সূরা আল-মু'মিন	৯	৮৫
৬১	৪১	সূরা হা মীম আস-সাজদাহ	৬	৫৪
৬২	৪২	সূরা আশ-শূরা	৫	৫৩
৬৩	৪৩	সূরা আয-যুখরুফ	৭	৮৯
৬৪	৪৪	সূরা আদ-দুখান	৩	৫৯
৬৫	৪৫	সূরা আল-জাছিয়া	৪	৩৭
৬৬	৪৬	সূরা আল-আহক্বফ	৪	৩৫
৬৭	৫১	সূরা আয-যারিয়াত	৩	৬০
৬৮	৮৮	সূরা আল-গশিয়াহ্‌	১	২৬
৬৯	১৮	সূরা আল-কাহ্‌ফ	১২	১১০
৭০	১৬	সূরা আন-নাহল	১৬	১২৮
৭১	৭১	সূরা নূহ	২	২৮
৭২	১৪	সূরা ইবরাহীম	৭	৫২
৭৩	২১	সূরা আল-আম্বিয়া	৭	১১২
৭৪	২৩	সূরা আল-মু'মিনূন	৬	১১৮
৭৫	৩২	সূরা আস-সাজদাহ্‌	৩	৩০
৭৬	৫২	সূরা আত-তুর	২	৪৯
৭৭	৬৭	সূরা আল-মুলক	২	৩০
৭৮	৬৯	সূরা আল-হাক্কাহ্‌	২	৫২
৭৯	৭০	সূরা আল-মা'আরিজ	২	৪৪
৮০	৭৮	সূরা আন-নাবা	২	৪০

নাযিলের ধারা	গ্রন্থিত ধারা	সূরার নাম	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৮১	৭৯	সূরা আন-নাযি‘আত	২	৪৬
৮২	৮২	সূরা আল-ইনফিতার	১	১৯
৮৩	৮৪	সূরা আল-ইনশিক্বক্ব	১	২৫
৮৪	৩০	সূরা আর-রূম	৬	৬০
৮৫	২৯	সূরা আল-‘আনকাবূত	৭	৬৯
৮৬	৮৩	সূরা আল-মুত্বফফিফীন	১	৩৬
		মোট	**৩৫৬**	**৪৬১৩**

এ ১১৪টি সূরার মধ্যে ১৭টি সূরা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। এর মধ্যে ৫টি সূরা নিয়ে ব্যাপক মতভেদ আছে। বাকি ১২টির মধ্যে অধিকাংশের মতে ৪টি মাদানি ও ৮টি মাক্কি সূরা।

যে ৫টি সূরা সম্পর্কে ব্যাপক মতভেদ আছে, তাহলো- (১) আল-বাইয়্যিনাহ্ (৯৮), (২) আল-‘আদিয়াহ্ (১০০), (৩) আল-মা‘ঊন (১০৭), আল-ফালাক্ব (১১৩) ও আন-নাস (১১৪)।

অধিকাংশের মতে, যে ৮টি সূরা মাক্কি, তাহলো– (১) আত-তীন (৯৫), (২) আল-ক্বদর (৯৭), (৩) আত-তাকাছুর (১০২), (৪) আল-আছর (১০৩), (৫) কুরাইশ (১০৬), (৬) আল-কাউছার (১০৮), (৭) আল-কাফিরূন (১০৯) ও (৮) আল-ইখলাছ (১১২)।

তাফহীমুল কুরআনে সূরাগুলোর ভূমিকায় মাওলানা মওদূদী রহ. সূরাসমূহের নাযিল হওয়ার সময় নিয়ে যে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন তাতে মাত্র ২৫টি সূরা মাদানি বলে প্রমাণিত হয়। সে হিসেবে (১১৪-২৫) ৮৯টি সূরাই মাক্কি বলে সাব্যস্ত হয়। অবশ্য তিনি তাফহীমুল কুরআনে ৫৫ ও ৯৯ নং সূরার শিরোনামে মাদানি লিখেছেন। যদিও তিনি গবেষণায় মাক্কি প্রমাণ করেছেন। আবার ১০ম সূরার শিরোনামে মাক্কি লিখেও গবেষণায় মাদানি প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তাঁর তরজমায়ে কুরআন মাজীদে ১৩ ও ৭৬ নং সূরার শিরোনামে মাদানি লিখেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ মুহাক্কিক উলামার মতে, মাক্কি সূরার সংখ্যা ৮৬টি ও মাদানি সূরার সংখ্যা ২৮টি। মাওলানা মওদূদী রহ. তাফহীমুল কুরআনে ২৭টি এবং তরজমায়ে কুরআনে মজীদে ২৯টি সূরার শিরোনামে মাদানি লিখেছেন।

কিছু সূরার প্রথম ভাগ মাক্কি হওয়ায় পরবর্তী অংশ মাদানি হওয়া সত্ত্বেও মাক্কি হিসেবে পরিচিত। যেমন, সূরা মুযযাম্মিল।

কুরআনের শেষ দুই পারায় অধিকাংশই মাক্কি সূরা রয়েছে। ২৯ পারার ১১টি সূরা সবগুলো এবং ৩০ পারার ৩৭টি সূরার মধ্যে ৩৪টিই মাক্কি। মোট ৮৬টি মাক্কি সূরার ৪৫টি শেষ দুই পারায় এবং বাকি ৪১টি সূরা সমগ্র কুরআনে ছড়িয়ে রয়েছে।

মক্কায় সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা কোনটি এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, সূরা আল-‘আনকাবূত সর্বশেষ মাক্কি সূরা। ইমাম দাহহাক ও আতা রহ. বলেন, সূরা আল-মু’মিনূন সর্বশেষ মাক্কি সূরা। মুজাহিদ রহ. বলেন, সূরা আত-তাতফিফ সর্বশেষ মাক্কি সূরা।

মাক্কি সূরাসমূহের মধ্যে ৩৫টি সূরা এমন রয়েছে, যাদের ১৫৪টি আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ও আয়াতগুলো হলো :

ক্রমিক	নাযিলের ধারা	মাক্কি সূরার নাম	মাদানি আয়াতসমূহ	আয়াত সংখ্যা
১	২	সূরা আল-ক্বলাম	১৭-৩৩, ৪৮-৫০	২০
২	৩	সূরা আল-মুয্যাম্মিল	১০-১১, ২০	৩
৩	১৭	সূরা আল-মা'উন	৪-৭	৪
৪	২৩	সূরা আন-নাজম	৩২	১
৫	৩৩	সূরা আল-মুরসালাত	৪৮	১
৬	৩৪	সূরা ক্বফ	৩৮	১
৭	৩৭	সূরা আল-ক্বমার	৪৪-৪৬	৩
৮	৩৯	সূরা আল-আ'রাফ	১৬৩-১৭০	৮
৯	৪১	সূরা ইয়াসিন	৪৫	১
১০	৪২	সূরা আল-ফুরকান	৬৮-৭০	৩
১১	৪৪	সূরা মারইয়াম	৫৮, ৭১	২
১২	৪৫	সূরা ত্বোয়াহা	১৩০-১৩১	২
১৩	৪৬	সূরা আল-ওয়াকি'আহ	৮১-৮২	২
১৪	৪৭	সূরা আশ-শু'আরা	১৯৭, ২২৪-২২৭	৫
১৫	৪৯	সূরা আল-ক্বাসাস	৫২-৫৫, ৮৫	৫
১৬	৫০	সূরা বনি ইসরাঈল	২৬, ৩২, ৩৩, ৫৭, ৭৩-৮০	১২
১৭	৫১	সূরা ইউনুস	৪৯, ৯৪-৯৬	৪
১৮	৫২	সূরা হুদ	১২, ১৭, ১১৪	৩
১৯	৫৩	সূরা ইউসুফ	১-৩, ৭	৪
২০	৫৪	সূরা আল-হিজর	৮৭	১
২১	৫৫	সূরা আল-আন'আম	২০, ২৩, ৯১, ৯৩, ১১৪, ১৪১, ১৫১-১৫৩	৯
২২	৫৭	সূরা লুকমান	২৭-২৯	৩
২৩	৫৮	সূরা সাবা	৬	১
২৪	৫৯	সূরা আয-যুমার	৫২-৫৪	৩
২৫	৬০	সূরা আল-মু'মিন	৫৬-৫৭	২
২৬	৬২	সূরা আশ-শূরা	২৩-২৫, ২৭	৪
২৭	৬৩	সূরা আয-যুখরুফ	৫৪	১
২৮	৬৫	সূরা আল-জাছিয়া	১৪	১
২৯	৬৬	সূরা আল-আহক্বফ	১০, ১৫, ৩৫	৩
৩০	৬৯	সূরা আল-কাহ্‌ফ	২৮, ৮৩-১০১	২০
৩১	৭০	সূরা আন-নাহল	১২৬-১২৮	৩
৩২	৭২	সূরা ইবরাহীম	২৮-২৯	২
৩৩	৭৫	সূরা আস-সাজদাহ্‌	১৬-২০	৫
৩৪	৮৪	সূরা আর-রূম	১৭	১
৩৫	৮৫	সূরা আল-'আনকাবূত	১-১১	১১
			মোট	**১৫৪**

মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য

সাহাবি ও তাবি'ঈগণের বর্ণনার মাধ্যমেই জানা যায় যে, কোন্‌ সূরা ও কোন্‌ আয়াত মাক্কি এবং কোন্‌ সূরা ও কোন্‌ আয়াত মাদানি। সাহাবি এবং তাবি'ঈগণের বর্ণনা ছাড়াও মাক্কি-

মাদানি চিহ্নিত করার আরো কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেমন– যে সকল আয়াতে বদর যুদ্ধের ঘটনা বিবৃত হয়েছে সেগুলো যে মাদানি তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার যে সকল আয়াতে বিশেষভাবে মক্কার মুশরিকদের সাথে কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো মাক্কি বলে স্বীকৃত। কাজেই দেখা যায়, কখনো অনুমান এবং কখনো দলিলের ভিত্তিতে আয়াতকে মাক্কি-মাদানি নির্ধারণ করা হয়। এ কারণেই মাক্কি-মাদানি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কুরআন মাজিদের কোনো কোনো সূরা সম্পূর্ণরূপে মাক্কি আবার কোনো সূরা সম্পূর্ণরূপে মাদানি। যেমন– সূরা মুদ্দাসসিরের সকল আয়াত মাক্কি এবং সূরা আলে-ইমরানের সকল আয়াত মাদানি। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন– সূরা আল-আ'রাফের ১৬৩-১৭০ আয়াত মাদানি। অনুরূপভাবে সূরা আল-হাজ্জ মাদানি। তবে এর ৫২-৫৫ পর্যন্ত চারটা আয়াত মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে নাযিল হয়েছে বিধায় সেগুলোকে মাক্কি বলে গণ্য করা হয়।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সূরার অধিকাংশ আয়াতের ভিত্তিতে তার মাক্কি-মাদানি হওয়া নির্ধারিত হয়। আবার যে সূরার প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে তা মাক্কি। যদিও তার পরবর্তী কিছু কিছু আয়াত হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। নিচে মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. যে সূরাতে كَلَّا (কখনো নয়) শব্দ রয়েছে তা মাক্কি।[১৭] এসব আয়াত কুরআন মাজিদের শেষ পনেরো পারায় তেত্রিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৮] 'আল্লামা দারিনি রহ. বলেন,[১৯]

وَمَا نَزَلَتْ كَلاَّ بِيَثْرِبَ فَاعْلَمَنْ * وَلَمْ تَأْتِ فِى الْقُرْاٰنِ فِىْ نِصْفِهِ الأَعْلٰى.

আল-'উমামি মাক্কি আয়াতে كَلَّا শব্দের ব্যবহারের হিকমত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

'কুরআনুল কারিমের শেষ অর্ধেকের অধিকাংশই মক্কায় নাযিল হয়েছে, আর মক্কার অধিকাংশ অধিবাসী ছিলো কঠোর স্বভাবের। এ জন্য তাদের মতামতকে কঠোর ও শক্তভাবে প্রত্যখ্যান করার উদ্দেশ্যে كَلَّا শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। অপর দিকে কুরআন মাজিদের প্রথম অর্ধেকের অধিকাংশ আয়াত মদিনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়। এখানে ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের মতামত প্রত্যাখ্যান করে কুরআন মাজিদের আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু তারা ছিলো মদিনাতে তুলনামূলকভাবে দূর্বল ও কম প্রতিপত্তিশালী। তাই তাদের ক্ষেত্রে كَلَّا শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।'[২০]

---

১৭ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪০; আয-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৬

১৮ আল-কুরআন, ১৯ : ৭৯, ৮২; ২৩ : ১০০; ২৬ : ১৫, ৬২; ৩৪ : ২৭; ৭০ : ১৫, ৩৯; ৭৪ : ১৬, ৩২, ৫৩, ৫৪; ৭৫ : ১১, ২০, ২৬; ৭৮ : ৪, ৫; ৮০ : ১১, ২৩; ৮২ : ৯; ৮৩ : ৭, ১৪, ১৫, ১৮; ৮৯ : ১৭, ২১; ৯৬ : ৬, ১৫, ১৯; ১০২ : ৩, ৪, ৫; ১০৪ : ৬

১৯ 'তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, ইয়াসরিব তথা মদিনায় كلا নাযিল হয়নি। আর কুরআন মাজিদের প্রথম অর্ধেকেও এ শব্দ আসেনি।' দ্র. আয-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৭

২০ "قال العمانی: وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة، وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم بخلاف النصف الأول، وما نزل منه فى اليهود لم

২. যে সূরায় সিজদার আয়াত রয়েছে তা মাক্কি।[২১] শুধু সূরা হাজ্জ ব্যতিত। কারণ হানাফি মাযহাব মতে সূরা হাজ্জ-এ একটা সিজদার আয়াত রয়েছে এবং ইমাম শাফি‘ঈ রহ.-এর মতে, সূরা হাজ্জ-এ দুইটি সিজদার আয়াত রয়েছে। এরপরও সূরা হাজ্জ মাদানি।[২২]

৩. যে সূরার শুরুতে حروف التهجى রয়েছে তা মাক্কি সূরা। তবে সূরা বাকারা ও আলে-‘ইমরান এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা এ দু’টি সূরার শুরুতে حروف التهجى (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ) বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সূরা দু’টি মাদানি। এছাড়া সূরা রা‘দ-এর শুরুতেও حروف التهجى আছে। এ সূরাটির ক্ষেত্রে ‘আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আলি ইবন তালহা রা.-এর মতে, এটি মাক্কি সূরা। হযরত আনাস রা.-এর মতে, এটা মাদানি সূরা।[২৩]

৪. সূরা বাকারা ব্যতিত অন্য যে সূরায় হযরত আদম আ. এবং ইবলিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা মাক্কি।[২৪]

৫. সূরা বাকারা ব্যতিত অন্য যে সূরায় পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাহিনী উল্লেখ আছে তা মাক্কি।[২৫]

৬. যে সূরায় يٰأَيُّهَا النَّاسُ আছে এবং يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নেই তা মাক্কি সূরা। তবে সূরা হাজ্জ মাক্কি না মাদানি এ বিষয়ে ‘আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে।[২৬]

৭. সকল মুফাস্‌সাল সূরা মাক্কি।[২৭] ইমাম তাবারানি রহ. ইবন মাস‘উদ রা. থেকে বর্ণনা করেন,[২৮]

نزل المْفصل بمكة، فمكثنا حججا نقرؤه ولا ينزل غيره.

অবশ্য কোনো কোনো মুফাস্‌সাল সূরা হিজরতের পর মদিনায় নাযিল হয়েছে। যেমন– সকল ‘আলিমের মতে, সূরা নাছর মাদানি সূরা। এমনকি এটা সর্বশেষে অবতীর্ণ সূরা। কাজেই

"يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم." দ্র. আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৭

২১ আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৭

২২ "ہر وہ سورت جس مین کوئی سجدہ کی آیت آتی ہی مکی ہی." দ্র. মাওলানা তকি উসমানি, *‘উলূমুল কুরআন*(করাচি : মাকতাবাতে দারুল উলূম করাচি, ৭ম মুদ্রণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৬২

২৩ আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৭

২৪ যারকাশি, *আল-বুরহান ফী ‘উলুমিল কুরআন* প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪০

২৫ প্রাগুক্ত।

২৬ প্রাগুক্ত।

২৭ ‘সূরা ক্বাফ থেকে শুরু করে আল-কুরআনের শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলা হয়। এ সূরাগুলোর মাঝে অধিক বিরতি ও ছেদ থাকার কারণে এবং কোনো কোনোটি খুব ছোট হওয়ার কারণে এগুলোকে মুফাসসাল বলে। আবার ফাসলুন শব্দের অর্থ এমন কথা যা খণ্ডিত হয়নি, যাতে ক্রটি-বিচ্যুতি নেই। অতএব কারো কারো মতে, এ সব সূরার মধ্যে খুব কম হুকুমই মানসূখ হয়েছে বলে এগুলোকে মুফাসসাল বলে।’ দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫), পৃ. ২৩

২৮ ‘মুফাসসাল সূরাসমূহ মক্কায় নাযিল হয়। আমরা বছরের পর বছর ধরে তা পাঠ করতে থাকি। সেখানে তা ছাড়া অন্য সূরা নাযিল হয়নি।’ দ্র. যারকাশি, *আল-বুরহান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪০; আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ রা.-এর বর্ণিত বক্তব্যের অর্থ, অধিকাংশ মুফাস্সাল সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে; সকল সূরা নয়।[২৯]

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য : বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে মাক্কি সূরা বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. মাক্কি আয়াতে প্রতিমা পূজা ও শিরকের উপর তীব্র আক্রমণ হানা হয়েছে। মুশরিকদের অন্তর থেকে প্রতিমা পূজা ও শিরকের প্রভাব মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক থেকে তাদের নিকট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।[৩০] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

‘হে মানবজাতি! একটা উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, তা মনোযোগ সহকারে শোনো। তোমরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেগুলোর কাছে আবেদন-নিবেদন করো সেগুলো একত্রে সমবেত হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। এগুলোর নিকট থেকে মাছি যা কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় এগুলো তাও উদ্ধার করতে মোটেই সক্ষম নয়। প্রার্থনাকারী এবং যেগুলোর নিকট প্রার্থনা করা হয় উভয়ই কতো শক্তিহীন, কতো দুর্বল।’[৩১]

২. মাক্কি সূরায় আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং অবিশ্বাসীদের দেহে সত্যের পক্ষে যেসব সাক্ষী বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রকৃতিতে হিদায়াতের পক্ষে যেসব প্রমাণাদি রয়েছে সেসব কিছু তাদের চোখের সামনে একত্ববাদের দলিল স্বরূপ তুলে ধরেন। বর্ণনাভঙ্গির ধরন বারবার পরিবর্তন করে এসব দলিলের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর রবুবিয়্যাত এবং আখিরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়।[৩২]

৩. মাক্কি আয়াতে অবিশ্বাসীদের নিকৃষ্ট অভ্যাস ও কুৎসিত আচরণ যেমন– হত্যা, রক্তপাত, জীবন্ত দাফন, সম্ভ্রম লুণ্ঠন, ইয়াতিমের সম্পদ কুক্ষিগত করণ ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৩৩]

৪. মাক্কি আয়াতে উত্তম চরিত্রের মূল বুনিয়াদ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, কুফর, ফিসক, নাফরমানি, মূর্খতা, বদমেজাজি প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অপর পক্ষে ঈমান, আনুগত্য, জ্ঞান, ভালবাসা, দয়া, একনিষ্ঠতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা,অন্তরের নির্মলতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩৪]

৫. মাক্কি আয়াত হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় এবং ভাষা অলংকারে পরিপূর্ণ। মাক্কি সূরার আয়াতসমূহ ছোট ছোট ও ছন্দময়। আর ভাব-ব্যঞ্জনায় অতুলনীয়।

৬. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭. জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

৮. মানুষের সুপ্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৯. দা‘ওয়াত ও প্রচারকার্যের উপর জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে।

---

২৯ আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০২

৩০ প্রাগুক্ত।

৩১ আল-কুরআন, ২২ : ৭৩

৩২ আয-যারকানি, *মানাহিলুল ‘ইরফান ফী ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০২-২০৩

৩৩ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০২

৩৪ প্রাগুক্ত।

১০. গাম্ভীর্যপূর্ণ ও কঠিন শব্দের প্রয়োগে জোর দেয়া হয়েছে।

১১. বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর কসম করা হয়েছে।

১২. আয়াতসমূহ সহজে মুখস্ত হওয়ার যোগ্য এবং সাহিত্যমান অতি উন্নত।

১৩. মাক্কি সূরাসমূহে প্রসিদ্ধ বস্তুসমূহের নামে শপথের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

মাক্কি যুগের প্রথম দিকের সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য : মাক্কি যুগের প্রথম দিকের সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ–

১. রাসূল সা. কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

২. জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ও সঠিক আকিদা সৃষ্টির প্রয়াস, ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা। ফলে দেখা গেছে মাক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের অনুশীলন প্রচুর।

৩. প্রাথমিক সূরাসমূহের ভাষা স্বচ্ছ, ঝর্ণাধারার ন্যায় ঝরঝরে, ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্ত হওয়ার যোগ্য, অতি উন্নত সাহিত্য।

৪. মাক্কি সূরাসমূহে ব্যক্তি গঠনের হিদায়াতে পরিপূর্ণ। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান নেই। শুধু শেষ দিকে সমাজ গঠনের ইংগিতমূলক কথা 'ম্যানিফেস্টো' আকারে বিদ্যমান রয়েছে। অতীতে বিভিন্ন জাতির নিকট নবী-রাসূলগণের আগমন ও তাদের প্রতি জনগণের আচরণের ভিত্তিতে তাদের উত্থান ও পতনের বিবরণ (ইতিহাস জানার জন্য নয়; ইতিহার থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য) বিদ্যমান রয়েছে।

৫. কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতার বিভিন্ন অবস্থায় ধৈর্যের উপদেশ, বিরোধিতার জবাব এবং মুকাবিলা করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি আল-কুরআনের সূরাগুলো প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত– মাক্কি ও মাদানি। মাক্কি সূরাতে দ্বীনের দা'ওয়াত সম্বলিত যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলে ইসলামের দা'ঈগণ তাদের দা'ওয়াতি কার্যক্রমে সফলকাম হবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মাক্কি ও মাদানি সূরার পার্থক্য

মাক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য ও নাযিলের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মাক্কি ও মাদানি সূরার মাঝে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। শিরকমুক্ত ও তাওহিদে বিশ্বাসী মু'মিন ব্যক্তিদের প্রেক্ষাপট ও নির্ভেজাল জাহিলিয়াতে লিপ্ত অন্ধাকারাচ্ছন্ন মানবতার পেক্ষাপট কখনোই এক হতে পারে না। অবস্থাভেদে ও আইনগত বিবেচনায় মাক্কি ও মাদানি সূরার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে নিম্নে প্রদত্ত সারণির মাধ্যমে তা আলোচনা করা হলো :

মাক্কি সূরা	মাদানি সূরা
মাক্কি সূরাসমূহ হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে।	মাদানি সূরাসমূহ হিজরতের পর নাযিল হয়েছে।
মাক্কি সূরায় كَلَّا (কখনো নয়) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।	মাদানি সূরায় كَلَّا (কখনো নয়) শব্দ ব্যবহৃত হয়নি।
শুধুমাত্র সূরা হজ্জ ব্যতীত সমস্ত সিজদার আয়াতগুলো মাক্কি সূরাতে বিদ্যমান।	সূরা হজ্জ ব্যতীত অন্য কোনো মাদানি সূরায় সিজদার আয়াত নেই।
যে সূরার শুরুতে حروف التهجى রয়েছে তা মাক্কি সূরা। তবে সূরা বাকারা ও আলে-'ইমরান এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা এ দু'টি সূরার শুরুতে حروف التهجى (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ) বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সূরা দু'টি মাদানি। এছাড়া সূরা রা'দ-এর শুরুতেও حروف التهجى আছে। এ সূরাটির ক্ষেত্রে 'আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আলি ইবন তালহা রা.-এর মতে, এটি মাক্কি সূরা। হযরত আনাস রা.-এর মতে, এটা মাদানি সূরা।[৩৫]	সূরা বাকারা ও আলে-'ইমরান ব্যতীত কোনো মাদানি সূরার শুরুতে হরূফে মুক্বাত্তা'আত ব্যবহৃত হয়নি।
মাক্কি সূরাসমূহে হযরত আদম আ. ও ইবলিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে সূরা বাক্বারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম।[৩৬]	সূরা বাক্বারা ছাড়া কোনো মাদানি সূরায় হযরত আদম আ. ও ইবলিসের ঘটনা বর্ণিত হয়নি।
মাক্কি সূরাসমূহে পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। তবে সূরা বাক্বারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম।[৩৭]	সূরা বাক্বারা ছাড়া অন্য কোনো মাদানি সূরায় পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাহিনীর উল্লেখ নেই।
মাক্কি সূরায় يٰأَيُّهَا النَّاسُ আছে এবং يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নেই। তবে সূরা হাজ্জ মাক্কি না মাদানি এ বিষয়ে 'আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে।[৩৮]	মাদানি সূরায় আল্লাহ তা'আলা يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ব্যবহার করেছেন এবং يٰأَيُّهَا النَّاسُ ব্যবহার করেননি।
সূরা বাইয়্যিনাহ, যিলযাল ও নাছর ব্যতীত সকল মুফাস্সাল সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে।[৩৯]	সূরা বাইয়্যিনাহ, যিলযাল ও নাছর ব্যতীত আর কোনো মুফাস্সাল সূরা মদিনায় নাযিল হয়নি।

৩৫ আয-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৯৭

৩৬ যারকাশি, *আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪০

৩৭ প্রাগুক্ত।

৩৮ প্রাগুক্ত।

মাক্কি আয়াতে প্রতিমা পূজা ও শিরকের উপর তীব্র আক্রমণ হানা হয়েছে। মুশরিকদের অন্তর থেকে প্রতিমা পূজা ও শিরকের প্রভাব মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক থেকে তাদের নিকট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।[৪০]	মাদানি সূরায় শারি'আতের দণ্ডবিধি এবং ফরয নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে।
মাক্কি সূরায় আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অবিশ্বাসীদের দেহে সত্যের পক্ষে যেসব সাক্ষী বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রকৃতিতে হিদায়াতের পক্ষে যেসব প্রমাণাদি রয়েছে সেসব কিছু তাদের চোখের সামনে একত্ববাদের দলিল স্বরূপ তুলে ধরেন। বর্ণনাভঙ্গির ধরন বারবার পরিবর্তন করে এসব দলিলের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর রবুবিয়্যাত এবং আখিরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়।[৪১]	মাদানি সূরায় জিহাদের অনুমতি এবং জিহাদের আহকাম বাস্তবায়নের ব্যাপক বিবরণ রয়েছে।
মাক্কি সূরার আয়াতে অবিশ্বাসীদের নিকৃষ্ট অভ্যাস ও কুৎসিত আচরণ যেমন– হত্যা, রক্তপাত, জীবন্ত দাফন, সম্ভ্রম লুণ্ঠন, ইয়াতিমের সম্পদ কুক্ষিগত করণ ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৪২]	মাদানি সূরায় মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ওলুকায়িত তথ্যাদি ফাঁস করে দেয়া হয়েছে মাদানি সূরায়।
মাক্কি আয়াতে উত্তম চরিত্রের মূল বুনিয়াদ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, কুফর, ফিসক, নাফরমানি, মূর্খতা, বদমেজাজি প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অপর পক্ষে ঈমান, আনুগত্য, জ্ঞান, ভালবাসা, দয়া, একনিষ্ঠতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্তরের নির্মলতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪৩]	মাদানি সূরায় 'ইবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন, শারি'আতের দণ্ডবিধি, পারিবারিক নীতিমালা, উত্তরাধিকারী আইন, জিহাদের ফযিলত, সামাজিক সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শান্তিকালীন অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক বিধি-বিধান, প্রশাসনিক নীতিমালা, আর্থ-সামাজিক নিয়ম-কানুন, শারি'আতের আহকাম ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।
মাক্কি আয়াত হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় এবং ভাষা অলংকারে পরিপূর্ণ। মাক্কি সূরার আয়াতসমূহ ছোট ছোট ও ছন্দময়। আর ভাব-ব্যঞ্জনায় অতুলনীয়।	মাদানি আয়াত মাক্কি আয়াতের তুলনায় ততটা হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় এবং ভাষা অলংকারে পরিপূর্ণ নয়।
তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।	মাদানি সূরায় আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩৯ 'সূরা ক্বাফ থেকে শুরু করে আল-কুরআনের শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলা হয়। এ সূরাগুলোর মাঝে অধিক বিরতি ও ছেদ থাকার কারণে এবং কোনো কোনোটি খুব ছোট হওয়ার কারণে এগুলোকে মুফাসসাল বলে। আবার ফাসলুন শব্দের অর্থ এমন কথা যা খণ্ডিত হয়নি, যাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। অতএব কারো কারো মতে, এ সব সূরার মধ্যে খুব কম হুকুমই মানসূখ হয়েছে বলে এগুলোকে মুফাসসাল বলে।' দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪০ আয-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০২

৪১ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০২-২০৩

৪২ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০২

৪৩ প্রাগুক্ত।

জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।	জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা তুলনা-মুলকভাবে কম।
মাক্কি সূরায় মানুষের সুপ্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।	মাদানি সূরায় মানুষের সুপ্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
মাক্কি সূরায় দা'ওয়াত ও প্রচারকার্যের উপর জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে।	মাদানি সূরায় দা'ওয়াত ও প্রচারকার্যের সাথে সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে।
মাক্কি সূরা গাম্ভীর্যপূর্ণ ও কঠিন শব্দের প্রয়োগে জোর দেয়া হয়েছে।	মাদানি সূরা তত গাম্ভীর্যপূর্ণ নয় ও কঠিন শব্দের প্রয়োগে জোর দেয়া হয়নি।
মাক্কি সূরায় বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর কসম করা হয়েছে।	মাদানি সূরায় বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর কসম করা হয়নি।
মাক্কি সূরার আয়াতসমূহ সহজে মুখস্ত হওয়ার যোগ্য এবং সাহিত্যমান অতি উন্নত।	মাদানি সূরার আয়াতসমূহ মুখস্ত করতে কঠিন এবং সাহিত্যমান তুলনামুলকভাবে তত উন্নত নয়।
মাক্কি সূরাসমূহে প্রসিদ্ধ বস্তুসমূহের নামে শপথের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।	মাদানি সূরাসমূহে প্রসিদ্ধ বস্তুসমূহের নামে শপথের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি জোর দেয়া হয়নি।
মাক্কি সূরায় রাসূল সা.-কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশে পরিপূর্ণ।	মাদানি সূরায় রাসূল সা.-কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের উপদেশে পরিপূর্ণ।
মাক্কি সূরায় জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ও সঠিক আকিদা সৃষ্টির প্রয়াস, ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা। ফলে দেখা গেছে মাক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের অনুশীলন প্রচুর।	মাদানি সূরাসমূহে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক নিয়ম-নীতির অনুশীলন ব্যাপক। এ সূরাগুলোতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত প্রদান করা হয়েছে। আসমানি কিতাবে তারা যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে তার বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। তাদের নিকট সত্যের জ্ঞান উদ্ভাসিত হওয়ার পর তারা সত্যের যে বিরোধিতা করেছে মাদানি সূরায় তা ব্যক্ত করা হয়েছে।
মাক্কি সূরাসমূহ ছোট ছোট।	মাদানি সূরাসমূহ দীর্ঘ দীর্ঘ।
মাক্কি সূরাসমূহের ভাষা স্বচ্ছ, ঝর্ণাধারার ন্যায় ঝরঝরে, ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্ত হওয়ার যোগ্য, অতি উন্নত সাহিত্য।	মাদানি সূরাসমূহের আয়াতগুলো দীর্ঘ এবং শারি'আতের আহকাম ও বিধানের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।
মাক্কি সূরাসমূহে ব্যক্তি গঠনের হিদায়াতে পরিপূর্ণ। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান নেই। শুধু শেষ দিকে সমাজ গঠনের ইংগিতমূলক কথা 'ম্যানিফেস্টো' আকারে বিদ্যমান রয়েছে। অতীতে বিভিন্ন জাতির নিকট নবী-রাসূলগণের আগমন ও তাদের প্রতি জনগণের আচরণের ভিত্তিতে তাদের উত্থান ও পতনের বিবরণ (ইতিহাস জানার জন্য নয়; ইতিহার থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য) বিদ্যমান রয়েছে।	মাদানি সূরাতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বিদ্যমান। আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মাক্কি সূরায় কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতার বিভিন্ন অবস্থায় ধৈর্যের উপদেশ, বিরোধিতার জবাব এবং মুকাবিলা করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।	মাদানি সূরায় কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতাসহ মদিনার ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় ধৈর্যের উপদেশ, বিরোধিতার জবাব এবং মুকাবিলা করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, মাক্কি-মাদানি সূরার জ্ঞান আয়াতের সঠিক অর্থ এবং সঠিক তাফসির জানতে সাহায্য করে। এ জ্ঞানের মাধ্যমে স্থান-কাল ও পাত্র অনুসারে ইসলামি দা‘ওয়াতের পদ্ধতি জানা যায়। মহানবী সা.-এর জীবন চরিত জানা যায়। সাহাবি ও তাবি‘ঈগণের বর্ণনা এবং গবেষকগণের ইজতিহাদের মাধ্যমে মাক্কি ও মাদানি সূরা বা আয়াত নির্ধারণ করা যায়। মহানবী সা.-এর হিজরতের পূর্বে মক্কা এবং তার আশেপাশে যা নাযিল হয়েছে তা মাক্কি এবং তাঁর হিজরতের পরে মদিনা, এর আশেপাশে বা অন্যত্র যা নাযিল হয়েছে তা মাদানি। মাক্কি সূরায় প্রতীমা পূজা, শিরকের অপকারিতা, একত্ববাদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে অধিক আলোচনা রয়েছে। মাদানি সূরায় শারি‘আতের দণ্ডবিধি, জিহাদের অনুমতি, মুনাফিকদের আলোচনা এবং আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক স্থান লাভ করেছে। শারি‘আতের বিধি-বিধান এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়াবলির আলোচনা মাদানি সূরায় অতি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মাক্কি সূরার বিষয়বস্তু

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতি জীবনের ২৩ বছরে পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরা নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর মাক্কি জীবনের ১৩ বছরে ৮৬টি সূরা বিভিন্ন বিষয়ে অবতীর্ণ হয়। মাক্কি সূরাগুলোর বিষয়বস্তু নিচে আলোচনা করা হলো :

সূরা আল-ফাতিহা : এ সূরা মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। এ সূরার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও আবেদনের বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ। মধ্যের একটি আয়াত আল্লাহর প্রশংসা ও দু'আ মিশ্রিত।[৪৪]

সূরা আল আন'আম : সূরা আন'আমে তাওহিদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" বাক্য দ্বারা শুরু করা হয়েছে এবং "وَإِنَّه لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" বাক্য দ্বারা শেষ করা হয়েছে। আয়াতের শুরুতেই একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে সাবধান করা হয়েছে যারা মূলতঃ একত্ববাদের বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছিলো। এ সূরার অধিকাংশই মক্কাবাসী আরব-মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। এতে মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সোজাপথ একমাত্র কুরআন ও রাসূল সা.-এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[৪৫]

সূরা আল আ'রাফ : সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রিসালাতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ নবুওয়াতের এবং ৬ষ্ঠ আয়াতে فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকু'র অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকু'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকু' থেকে ২১তম রুকু' পর্যন্ত আম্বিয়া আ. ও তাদের উম্মতদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রিসালাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব ঘটনায় রিসালাতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে– যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২২তম রুকু'র অর্ধেক থেকে ২৩তম রুকু'র শেষ পর্যন্ত আখিরাত সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও ২২তম রুকুর শুরুতে এবং সর্বশেষ ২৪তম রুকু'র বেশির ভাগ অংশে তাওহিদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। এ সূরার খুম কম অংশই এমন রয়েছে যাতে স্থান উপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে।[৪৬]

সূরা ইউনুস : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে– দা'ওয়াত দেয়া, বুঝানো ও সতর্ক করা। এ সূরায় আল-কুরআনুল কারিম ও ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি– তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত

---

৪৪ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*(রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি.), খ.১, পৃ. ১০৮

৪৫ মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন*(মদীনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৩৬৬, ৪২৫-৪২৬

৪৬ মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থতা বিশ্বজাহান ও এর মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং কাহিনীর অবতারণা করে সেসব লোকদের সতর্ক করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার এসব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অংশীবাদের খণ্ডন এবং এ সম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও অপনোদন করা হয়েছে।[৪৭]

সূরা হুদ : এ সূরার বিষয়বস্তু সূরা ইউনুসের অনুরূপ। অর্থাৎ দা'ওয়াত দেয়া, উপদেশ ও সতর্কবাণী। তবে পার্থক্য হচ্ছে, সূরা ইউনুসের তুলনায় দা'ওয়াতের অংশ এখানে সংক্ষিপ্ত, উপদেশের মধ্যে যুক্তির পরিমাণ কম ও ওয়াজ-নসিহত বেশি এবং সতর্কবাণীগুলো বিস্তারিত ও বলিষ্ঠ। সূরা হুদ ঐসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহর গযব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত আবু বকর রা. একদিন নবী কারিম সা.-এর কিছু দাড়ি মুবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন– 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।' তখন রাসূল কারিম সা. ইরশাদ করেছিলেন, 'হাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।' এ থেকে অনুমান করা যায়, এ সূরার বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এ সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলে পাক সা.-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।[৪৮]

সূরা ইউসুফ : এ সূরায় হযরত ইউসুফ আ.-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনের কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ আ. সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্যসব আম্বিয়া কিরাম আ.-এর কাহিনী ও ঘটনাবলি সমগ্র কুরআনে প্রসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৯]

সূরা ইবরাহিম : এ সূরায় রিসালাত, নবুওয়াত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যারা নবী কারিম সা.-এর রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিলো এবং তাঁর দা'ওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সব রকমের নিকৃষ্টতম প্রতারণা ও চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলো তাদের প্রতি উপদেশ ও সতর্কবাণী এ সূরার কেন্দ্রিয় বক্তব্য। কিন্তু উপদেশের তুলনায় এ সূরায় সতর্কীকরণ, তিরস্কার, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ভাবধারাই বেশি উচ্চকিত।[৫০]

সূরা আল-হিজর : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো দীর্ঘ আশা পোষণ করে পৃথিবীর ভালোবাসা ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়ার ভয়াবহ পরিণাম। পক্ষান্তরে যারা নবী কারিম সা.-এর দা'ওয়াত অস্বীকার করছিলো, যারা তাকে বিদ্রুপ করছিলো এবং তাঁর কাজে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করে আসছিলো, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এ সূরায়।[৫১]

---

৪৭ মাহমুদ ইবন উমর আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*(বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪৩০ হি.), পৃ. ৪৫৫

৪৮ মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১০

৫১ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ১-৪

সূরা আন-নাহল : এ সূরাকে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্তু দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহিদের দা'ওয়াত দেয়া ও দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল এ সূরার সারমর্ম।[৫২]

সূরা বনী ইসরাঈল : এ সূরায় সতর্ক করা, বুঝানো ও শিক্ষা দেয়া এ তিনটি কাজই একটি আনুপাতিক হারে একত্র করে দেয়া হয়েছে। মি'রাজের ঘটনা সম্বলিত সময় এ সূরায় বনি ইসরাঈলদের ঘটনাবলি, আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ, পিতামাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহার, সকল আত্মীয়ের হক্ব আদায়, অপচয় রোধ ও বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ, অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে এ সূরায়।[৫৩]

সূরা আল-কাহ্ফ : রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কি জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলো শুরু হচ্ছে। এ সূরায় আসহাবে কাহফ ও রকীমের কাহিনী, জান্নাতিদের অলংকার, হযরত মুসা আ. ও খিজির আ.-এর ভ্রমণ কাহিনী, যুল ক্বারনাইন, ইয়াজুজ-মা'জুজের বর্ণনা এ সূরার আলোচ্য বিষয়। মক্কার মুশরিকরা নবী কারিম সা.-এর পরীক্ষা নেয়ার জন্য আহলি কিতাবদের পরামর্শক্রমে তাঁর সামনে যে তিনটি প্রশ্ন করেছিলো এ সূরাতে তার জবাব রয়েছে।[৫৪]

সূরা মারইয়াম : হাবশায় হিজরতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। এ সূরায় হযরত জাকারিয়া, ইয়াহয়া, মারইয়াম, ঈসা, ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, মুসা, হারুন, ইসমাঈল, ইদরিস, আদম, নূহ আ.-এর বর্ণনা স্মরণ করানো হয়েছে।[৫৫]

সূরা ত্বোয়া-হা : এর সূরার অপর নাম কালীম। এতে হযরত মুসা কালীমুল্লাহ আ.-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৬]

সূরা আল-আম্বিয়া : এ সূরায় তাওহিদ, রিসালাত, নবুওয়াত, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের বর্ণনা রয়েছে। কয়েকজন নবীর ঘটনাও এ সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। নবী কারিম সা. ও কুরাইশ নেতাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিলো এ সূরায় তা আলোকপাত করা হয়েছে।[৫৭]

সূরা আল মু'মিনূন : রাসূলের আনুগত্য করার আহ্বান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র আলোচনাটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত। এ সূরার শুরুতে সফলকাম মু'মিনের সাতটি গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। এতে মানব সৃষ্টির শেষ স্তর ও হিদায়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত নূহ আ.-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রাসূলে কারিম সা.-এর দু'আয় তা দূর হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহম কামনা করে সূরাটি শেষ হয়েছে।[৫৮]

সূরা আল-ফুরকান : এ সূরার সারমর্ম হলো কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলে কারিম সা.-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।[৫৯]

---

৫২ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *জামিউল বায়ান 'আন তা'বিলি আয়িল কুরআন*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫ হি.), খ.৪, পৃ. ৪৯৯-৫০২

৫৩ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ২০৩-২০৫

৫৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*(বৈরুত : ইদারাতুত তিবা'আতিল মুনিরিয়্যাহ, তা.বি.), খ.১৫, পৃ. ১৯৯-২০৫

৫৫ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*(বাদশাহ ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪৩০ হি.), পৃ. ৩০৫-৩১০

৫৬ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৪

৫৮ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৩৪৯-৩৫৫

৫৯ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮

সূরা আশ-শু‘আরা : এ সূরার বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক হলো– আম্বিয়া কিরামের পয়গম্বরসূলভ বিতর্কের একটা নমুনা ও তার কার্যকর রীতিনীতি। আল-কুরআনের পরিচয় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে।[৬০]

সূরা আন-নামল : সূরা আন-নামলে যেসব বিষয়বস্তুর উল্লেখ রয়েছে তাহলো– মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উত্তম, মুসা আ.-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ, পয়গম্বরগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক নবুওয়াতের সাথে, বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি-চেতনা বিদ্যমান, সৎকর্ম কবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না, শাসকের জন্য জনসাধারণের খোঁজ-খবর নেয়া জরুরি, পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা, জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কিনা? নারীর জন্য বাদশাহ হওয়া বা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়িয কিনা? চিঠিপত্র লেখার নিয়ম, পরামর্শ, উপঢৌকন, রানী বিলকিস ও দু‘আ কবুলের নিয়ম ইত্যাদি এ সূরার আলোচ্য বিষয়।[৬১]

সূরা আল-ক্বাসাস : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে নবী কারিম সা.-এর রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিলো সেগুলো দূরা করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে যেসব অজুহাত পেশ করা হচ্ছিলো সেগুলো নাকচ করে দেয়া। হযরত মুসা আ.-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং বোথাও বিস্তারিত আকারে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহফে তাঁর কাহিনী খিযির আ.-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা ত্বোয়া-হায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এরই কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে অতঃপর সূরা আল-ক্বাসাসে এরই পুনরালোচনা করা হয়েছে।[৬২]

সূরা আল-‘আনকাবূত : সূরা ‘আনকাবুতের বিষয়বস্তুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো– যুগে যুগে মু’মিনগণ বিশেষতঃ আম্বিয়া কিরাম আ.-কে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হয়েছে। এসব পরীক্ষা কোনো সময় কাফির-মুশরিকদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন– অধিকাংশ আম্বিয়া আ., শেষনবী মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাহাবিগণ প্রায়ই এ ধরনের ঘটনাবলির সম্মুখীন হয়েছেন। এ সূরায় নির্যাতনমূলক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে কারিম সা.-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরাম আ. ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত নূহ, হযরত ইবরাহিম, হযরত লুত, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়া‘কুব আ.-এর কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর পত খুলে দেন।[৬৩]

সূরা আর-রূম : এ সূরার প্রথমে বলা হয়েছে যে, ‘নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।’ সূরা রূম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা আল্লাহ তা‘আলার সাহায্যেরই একটা প্রতীক। এ সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এ যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিলো কাফির। তাদের মধ্যে কারো বিজয় এবং কারো পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কোনো কৌতুহলের বিষয় ছিলো না। কিন্তু উভয় কাফির দলের মধ্যে

---

৬০ আল্লামা আলুসি, *রূহুল মা‘আনি*(বৈরুত : ইদারাতুত তিবা‘আতিল মুনিরিয়্যাহ, তা.বি.), খ.১৯, পৃ. ৬৪

৬১ আল-কুরতুবি, *আল-জামি‘ লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ. ১৫৪-১৬০

৬২ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৫-১০

৬৩ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১২-৮১৫

পারসিকরা ছিলো অগ্নিপূজারি মুশরিক এবং রোমকরা ছিলো খ্রিস্টান আহলি কিতাব। ফলে এরা ছিলো মুসলিমদের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি। এছাড়া আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তা'আলার কুদরতের ছয়টি নিদর্শনের বিবরণ রয়েছে। ছয়টি নিদর্শন হলো– (ক) মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মাটি থেকে সৃষ্টি করা। (খ) মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। (গ) পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য। (ঘ) মানুষের রাত ও দিনে নিদ্রা যাওয়া ও জীবিকা অন্বেষণ করা। (ঙ) আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। (চ) আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা'আলাই আদেশে প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় আছে।[৬৪]

সূরা লুকমান : এ সূরায় মানুষকে বুঝানো হয়েছে, শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং তাওহিদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা। এ সঙ্গে আহ্বান জানানো হয়েছে এ বলে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করা কর্তব্য। মুহাম্মদ সা. আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শিক্ষা পেশ করেছেন সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ও উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা উচিত। বিশ্ব-জগতের চারদিকে এবং নিজের মানবিক সত্তার মধ্যেই কেমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে তা উল্লেখ রয়েছে। যাকাতের বিধানের পূর্বাভাষ, ক্রীড়া-কৌতুক ও এর সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শারি'আতের দিক-নির্দেশনা, পুত্রকে উদ্দেশ্য করে হযরত লুকমান আ.-এর উপদেশমালা আলোচিত হয়েছে। মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সবশেষে পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোনো সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই সূরা লুকমান শেষ করা হয়েছে।[৬৫]

সূরা আস-সাজদাহ্ : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ দূর করা এবং এ তিনটি সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো।

সূরা সাবা : এ সূরায় কাফিরদের এমন সব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী কারিম সা.-এর তাওহিদ ও আখিরাতের দা'ওয়াতের এবং তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ ও অর্থহীন অপবাদের আকারে পেশ করতো। কোথাও এ আপত্তিগুলো উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে, আবার কোথাও সেগুলো কোন আপত্তির জবাব তা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে এ সূরায় হযরত দাউদ, সুলাইমান আ. ও সাবা জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আল ফাতির : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী কারিম সা.-এর তাওহিদের দা'ওয়াতের মোকাবিলায় তৎকালীন মক্কাবাসীরা ও তাদের নেতৃবৃন্দ যে নীতি অবলম্বন করেছিলো, উপদেশের ভঙ্গিতে সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষকের ভঙ্গিতে উপদেশ দেয়া।[৬৬]

সূরা ইয়াসিন : কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতের উপর ঈমান না আনা এবং যুলুম ও বিদ্রুপের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করার পরিণামের ভয় দেখানোই এ সূরার বিষয়বস্তুর লক্ষ্য। এর মধ্যে ভয় দেখানোর দিকটি প্রবল ও সুস্পষ্ট। কিন্তু বার বার ভয় দেখানোর সাথে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এ সূরায় তিনটি বিষয়ের উপর যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে– (ক) তাওহিদের উপর বিশ্বজাহানের

---

৬৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২১, পৃ. ১৬-২০

৬৫ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৪-৮২৫

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৯-৮৮০

নিদর্শনাবলি ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যুক্তি প্রদর্শন। (খ) আখিরাতের উপর বিশ্বজাহানের নিদর্শনাবলি, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে যুক্তি প্রদর্শন। (গ) মুহাম্মদি নবুওয়াতের সত্যতার উপর এ কথার ভিত্তিতে যে, তিনি নিজের রিসালাতের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কষ্ট সহ্য করছিলেন নিঃস্বার্থভাবে এবং এ বিষয়ের ভিত্তিতে যে, তিনি মানুষকে যেসব কথার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন সেগুলো পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত ছিলো এবং সেগুলো গ্রহণ করার মধ্যেই ছিলো মানুষের নিজের কল্যাণ।[৬৭]

সূরা আস-সফ্ফাত : সে সময় নবী কারিম সা.-এর তাওহিদ ও আখিরাতের দা'ওয়াতের বাধা দেয়া হচ্ছিল নিকৃষ্ট ধরনের রঙ-তামাশা ও ঠাট্ট-বিদ্রুপের মাধ্যমে। তাঁর রিসালাতের দাবি জোরে-সোরে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। এ জন্য মক্কার কাফিরদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং শেষে তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে নবীকে আজ তোমরা বিদ্রুপ করছো খুব শীঘ্রই তোমাদের চোখের সামনেই তিনি তোমাদের উপর বিজয় লঅভ করবেন এবং তোমরা নিজেরাই আল্লাহর সেনাদলকে তোমাদের গৃহের আঙিনায় প্রবেশ করতে দেখবে। সূরার শেষ আয়াতগুলোতে কাফিরদের জন্য নিছক সতর্কবাণীই ছিলো না বরং যেসব মু'মিন নবি কারিম সা.-কে সমর্থন ও তাঁর সাথে সহযোগিতা করে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থার মোকাবিলা করছিলেন তাদের জন্যও ছিলো সুসংবাদ।

সূরা সোয়াদ : কাফির ও নবী কারিম সা.-এর মধ্যকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাদের অস্বীকারের আসল কারণ ইসলামি দা'ওয়াতের কোনো ত্রুটি নয় বরং এর আসল কারণ হচ্ছে তাদের আত্মম্ভরিতা, হিংসা ও একগুয়েমির উপর অবিচল থাকা। এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে সূরা সোয়াদে। সূরার শুরুর দিকে এবং শেষ বাক্যগুলোতেও কাফিরদেরকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আজ তোমরা যে ব্যক্তিকে বিদ্রুপ করছো এবং যার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে জোরালো অস্বীকৃতি জানাচ্ছো, খুব শীঘ্রই সে-ই বিজয়ী হবে এবং সে সময়ও দূরে নয় যখন যে মক্কা শহরে তোমরা তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, এ শহরেই তোমরা তাঁর সামনে অবনত মস্তক হবে। এরপর পরপর নয়জন নবীর কথা বলা হয়েছে। পরিশেষে আদম আ. ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৮]

সূরা আয-যুমার : হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মক্কার পরিবেশ ছিলো যুলুম-নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৬৯]

সূরা আল-মু'মিন : হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ফিরআউনের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তির কাহিনী শুনানো হয়েছে। এবং এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে তিনটি গোষ্ঠিকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (ক) কাফিরদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মদ সা.-এর সাথে যা কিছু করতে চাচ্ছো ফিরআউন নিজের শক্তির উপর ভরসা করে হযরত মুসা আ.-এর সাথে এমন একটা কিছুই করতে চেয়েছিলো। একই আচরণ তোমরাও কি সে পরিণাম বোগ করতে চাও যা তারা ভোগ করেছিলো? (খ) মুহাম্মদ সা. ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এসব যালিম দৃশত যত শক্তিশালী ও অত্যাচারীই হোক না কেনো এবং তাদের মুকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল ও অসহায় হওনা কেনো, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, যে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য তোমরা কাজ করে যাচ্ছো তাঁর শক্তি যে কোনো শক্তির তুলনায়

---

৬৭ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১-৫

৬৮ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩৩৩-৩৪০

৬৯ আল্লামা আলুসি, *রূহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৩, পৃ. ২২৬

প্রচণ্ডতম। (গ) তৃতীয় গোষ্ঠি ছিলো এমন লোক যারা মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছিলো যে, ন্যায় ও সত্য আছে মুহাম্মদ সা.-এর পক্ষে আর কুরাইশ গোত্রের কাফিররা নিছক বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু এ কথা জানা সত্ত্বেও তারা হক ও বাতিলের এ সংঘাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলো। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছেন।[৭০]

সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ : একদিন কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিলো এবং মসজিদের অন্য কোণে রাসূলুল্লাহ সা. একাকী বসেছিলেন। এ সময় কুরাইশ নেতা 'উতবা ইবন রাবী'আ রাসূল সা. এর কাছে গিয়ে দীর্ঘ প্রস্তাব দিয়েছিলো। উতবার বক্তব্য উপেক্ষা করে এ সূরায় সে বিরোধিতাকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা নবী কারিম সা.-কে বলতো, আপনি যাই বলেন না কেনো আমরা আপনার কোনো কথাই শুনবো না। আমরা আমাদের মনের গায়ে চাদর ঢেকে দিয়েছি এবং কান বন্ধ করে রেখেছি। আমাদের ও আপনার মাঝে একটি প্রাচীর আড়াল করে দাড়িয়েছি, যা আপনাকে ও আমাদের কখনো এক হতে দিবে না। তারা তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলো, আপনি আপনার দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যান, আপনার বিরোধিতায় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সবই আমরা করবো।[৭১]

আরও কতিপয় মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকেও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে শব্দগত কিছু মতপার্থক্য আছে। ঐ সব বর্ণনার কোনো কোনোটাতে এ কথাও আছে যে, নবী কারিম সা. তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়

فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ.

এ আয়াতটি পড়লেন তখন 'উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের উপর হাত চেপে ধরে বলল– 'আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের জাতির প্রতি সদয় হও।' পরে কুরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের বর্ণনা করেছে, এ বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদ সা.-এর মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের উপর আযাব নাযিল না হয় তা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।[৭২]

সূরা আশ-শূরা : এ সূরায় কিছু সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সংক্ষেপে তাওহিদ ও আখিরাতের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, পার্থিব পূজার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, আখিরাতের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এবং কাফিরদের সেসব নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে যা তাদের আখিরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মূল কারণ ছিলো। বক্তব্যের সমাপ্তি পর্যায়ে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে– (ক) মুহাম্মদ সা. তাঁর জীবনের প্রথম ৪০ বছর কিতাব কি– এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং ঈমান ও ঈমান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলেন। তারপর হঠাৎ এ দু'টো বিষয় নিয়ে তিনি মানুষের সামনে আসলেন। এটা তাঁর নবী হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। (খ) তাঁর পেশকৃত শিক্ষাকে আল্লাহর বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সাথে

---

৭০ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৯-৯৫২

৭১ আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ইবন হিশাম, অনূঃ আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবন হিশাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন ১৯৯৮), পৃ. ৩১৩-৩১৪

৭২ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৩৩৭-৩৪১

সামনা সামনি কথাবার্তা বলার দাবিদার। আল্লাহর এ শিক্ষা অন্য সব নবী-রাসূলগণের মতো তাকেও তিনটি উপায়ে দেয়া হয়েছে। ১. অহি, ২. পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া এবং ৩. ফেরেশতার মাধ্যমে বার্তা। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যাতে বিরোধিরা এ অপবাদ আরোপ করতে না পারে যে, নবী কারিম সা. আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথা বলার দাবি করছেন। সাথে সাথে ন্যায়বাদী মানুষেরা যেন জানতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মানুষকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাকে কোন্ কোন্ উপায়ে ও পন্থায় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

সূরা আয-যুখরুফ : কুরাইশ ও আরববাসীরা যেসব জাহিলি আক্বিদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে চলছিলো এ সূরায় প্রবলভাবে তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত মজবুত ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় সেগুলোর অযৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে যাতে সমাজের যেসব ব্যক্তির মধ্যে কিঞ্চিত যুক্তিবাদিতা আছে তারা সকলেই একথা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, এসব কেমন ধরনের অজ্ঞতা যা আমাদের জাতি চরমভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছে আর যে ব্যক্তি এ আবর্ত থেকে আমাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন আদাপানি খেয়ে তার বিরুদ্ধে লেগেছে। এভাবে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও সপ্রমাণ জবাব দেয়ার পর পরিষ্কার বলা হয়েছে, না আল্লাহর কোনো সন্তানাদি আছে, না আসমান ও যমিনের আল্লাহ আলাদা, না এমন কোনো সুপারিশকারী আছে যে জেনে বুঝে গুমরাহির পথ অনুসরণকারীদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে। আল্লাহ একাই গোটা বিশ্ব জাহানের রব।[৭৩]

সূরা আদ-দুখান : এ সূরার মূল বিষয় হলো– কুরআন মাজিদ বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত কিতাব। আল-কুরআনের বিরোধিতা করে কেউ প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী হতে পারে না। আল্লাহকে আসমান-যমিন এবং বিশ্বজাহানের মালিক ও পালনকর্তা জেনেও অন্যকে উপাস্য হিসেবে মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আল্লাহর রবুবিয়াত ও রহমতের দাবি এ নয় যে, তিনি শুধু মানুষের পেট পূর্ণ করবেন। আখিরাত ও পুনরুত্থান অবশ্যই সংঘটিত হবে, আল্লাহর আদালাত কায়িম হবে। সে আদালাতের উল্লেখ করতে গিয়ে যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে তাদের কি বলা হবে তা বলা হয়েছে এবং যারা সেখানে সফলকাম হবে তারা কি পুরস্কার লাভ করবে তাও বলা হয়েছে। সবশেষে এ বলে কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে যে, তোমাদের বুঝানোর জন্য পরিষ্কার ও সহজ-সরল ভঙ্গিতে তোমাদের নিজের ভাষায় এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এখনা যদি বুঝানো সত্ত্বেও তোমরা না বুঝে এবং চরম পরিণতি দেখার জন্যই জিদ ধরে থাকো তাহলে অপেক্ষা করো। আমার নবীও অপেক্ষা করছেন। যা হওয়ার তা যথাসময়ে দেখা যাবে।

সূরা আল-জাছিয়া : এ সূরার বিষয়বস্তু হলো– তাওহিদ ও আখিরাত সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তির জবাব দেয়া এবং কুরআনের দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে তারা যে নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছিলো সে সম্পর্কে সাবদান করা।[৭৪]

সূরা আল আহক্বফ : এ সূরায় কাফির-মুশরিকদের পথভ্রষ্টার প্রত্যেকটিকে সংক্ষেপে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাদের এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্য ও বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে যদি

৭৩ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৫০৭-৫১২

৭৪ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৪-১০০৮

গোড়ামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে কুরআনের দা'ওয়াত ও মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই ধ্বংস করবে।[৭৫]

সূরা ক্বফ : সমগ্র সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখিরাত। রাসূলুল্লাহ সা. মক্কা মুয়াজ্জমায় দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলে মানুষের কাছে তাঁর যে কথাটা সবচেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছিলো তা হচ্ছে, মৃত্যুর পর পুনরায় মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদেরকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। তাদের এহেন মনোভাবের জবাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে দায়িত্বহীন হলে, আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি, আযাব ও সাওয়াব এবং জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়কে অবহেলা করলে পরিণতিতে সেই জাহান্নামেই নিক্ষিপ্ত হতে হবে। আর যে জান্নাতের কথা শুনে মানুষেরা বিস্মিত হচ্ছে মহা দয়ালু আল্লাহকে ভয় করে সঠিক পথে ফিরে আসা লোকেরা সেদিন বিরুদ্ধবাদীদের চোখের সামনে সেই জান্নাতে চিরদিনের জন্য প্রবেশ করবে।[৭৬]

সূরা আয-যারিয়াত : এ সূরার অধিকাংশটাই জুড়ে রয়েছে আখিরাত সম্পর্কিত আলোচনা এবং এর শেষভাগে তাওহিদের দা'ওয়াত পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে এ বিষয়েও সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলদের কথা না মানা এবং নিজেদের জাহিলি ধ্যান-ধারণা আকড়ে থাকা ও একগুয়েমি করা সেসব জাতির নিজেদের জন্যই ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে যারা এ নীতি অবলম্বন করেছিলো।

সূরা আত-তুর : এ সূরার প্রথম রুকু'র বিষয়বস্তু আখিরাত। সূরা যারিয়াতে এর সম্ভাবনা, অবশ্যম্ভাবিতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছিলো। সেজন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। তবে আখিরাত প্রমাণকারী কয়েকটি বাস্তব সত্য ও নিদর্শনের শপথ করে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে এবং তার সংঘটন রোধ করতে পারে এ শক্তি কারো নেই। এরপর বলা হয়েছে তা সংঘটিত হলে তার অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে এবং তা বিশ্বাস করে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনকারীগণ আল্লাহ তা'আলার নি'আমত দ্বারা কিভাবে পুরস্কৃত হবেন। সূরার শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এসব বিরোধী শক্তি ও শত্রুদের অভিযোগ ও সমালেঅচনার তোয়াক্কা না করে তিনি যেন নিজের আন্দোলন ও উপদেশ-নসিহতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যেতে থাকেন।

সূরা আন-নাজম : মক্কার কাফিররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করে আসছিলো তাদের সে নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু।[৭৭]

সূরা আল-ক্বমার : রাসূলুল্লাহ সা.-এর দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিররা যে হঠকারিতার পন্থা অবলম্বন করে আসছিলো এ সূরার সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে সংবাদ রাসূল সা. দিচ্ছিলেন তা যে সত্যিই সংঘটিত হতে পারে এবং তার আগমনের সময় যে অত্যন্ত নিকটবর্তী– চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

---

৭৫ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ. ১৭৮-১৮১

৭৬ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৩-১০৪৬

৭৭ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৪২-১৪৭

সূরা আল ওয়াকি'আহ : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে আখিরাত, তাওহিদ ও কুরআন সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের সন্দেহ-সংশয়ের প্রতিবাদ।[৭৮]

সূরা আল-মুলক : এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামি শিক্ষার মৌলিক বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিলো তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-ক্বলাম : এ সূরায় তিনটি মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। (ক) বিরোধীদের আপত্তি ও সমালোচনার জবাব দান, (খ) তাদেরকে সতর্কীকরণ ও উপদেশ দান এবং (গ) রাসূলুল্লাহ সা.-কে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকার উপদেশ দান।[৭৯]

সূরা আল-হাক্কাহ্ : এ সূরাটির প্রথম রুকু'তে আখিরাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকু'তে কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ সা. যে আল্লাহর রাসূল তার সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আল-মা'আরিজ : কাফিররা কিয়ামত, আখিরাত এবং জাহান্নাম ও জান্নাত সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে বিদ্রুপ ও উপহাস করতো এবং রাসূলুল্লাহ সা.-কে এ মর্মে চ্যালেঞ্জ করতো যে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো আর তোমাকে অস্বীকার করে আমরা জাহান্নামের শাস্তিলাভের উপযুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমাদেরকে যে কিয়ামতের ভয় দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে এসো। যে কাফিররা এসব কথা বলতো এ সূরায় তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং উপদেশ বাণী শোনানো হয়েছে। তাদের এ চ্যালেঞ্জের জবাবে এ সূরার গোটা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।[৮০]

সূরা নূহ : এ সূরায় হযরত নূহ আ.-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা কেবল কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফিরদের এ মর্মে সাবধান করা যে, হযরত নূহ আ.-এর সাথে তাঁর জাতি যে আচরণ করেছিলো তোমরাও হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে সে একই আচরণ করছো। তোমরা যদি এ আচরণ থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাদেরও সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিলো নূহ আ.-এর জাতি।[৮১]

সূরা আল-জ্বিন : সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে উকাযের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের ইমামতি করেন। সে সময় একদল জ্বিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনোযোগসহ কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকে। এ সূরার শুরু থেকে ১৫ আয়াত পর্যন্ত এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরার ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত আয়াতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি শিরক পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে তাহলে তাহলে তাদের প্রতি অজস্র নি'আমত বর্ষিত হবে। অন্যথায় আল্লাহর পাঠানো এ উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামে তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিপতিত হবে। ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতে মক্কার কাফিরদের তিরস্কার করা হয়েছে। ২৪ ও ২৫ আয়াতে

---

৭৮ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ. ১৯৪-১৯৬
৭৯ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৪৪-৩৪৬
৮০ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৮-১১৪১
৮১ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৮, পৃ. ২৯৮-৩০০

কাফিরদের এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, আজ তারা রাসূল সা.-কে বন্ধুহীন ও অসহায় দেখে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন তারা জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে বন্ধুহীন ও অসহায় কারা? সে সময়টি খুব দূরে না নিকটে রাসূল সা. তা জানেন না। কিন্তু সেটা অবশ্যই আসবে। সবশেষে মানুষদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। রাসূল সা. শুধু ততটুকুই জানতে পারেন যতটুকু আল্লাহ তাকে জানান। এ জ্ঞানও হয় রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সংক্রান্ত বিষয়ে। এমন সুরক্ষিত পন্থায় রাসূল সা.-কে এ জ্ঞান দেয়া হয় যার মধ্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের আদৌ কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল : এ সূরার প্রথম ৭টি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু-দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য তিনি যেনো নিজেকে প্রস্তুত করেন। এর বাস্তব পন্থা বলা হয়েছে এভাবে যে, তিনি যেনো রাতে উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায আদায় করেন।[৮২] এরপর ৮ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে নবী কারিম সা.-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেনো সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র বিশ্বজাহানের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিয়ে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করেন, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করেন। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। ১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে মক্কার যে সমস্ত মানুষ রাসূল সা.-এর বিরোধিতা করছিলো তাদের এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যেমন ফিরআউনের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন ঠিক তেমনি তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের কথা না শুনে ফিরআউন কিরূপ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিলো। তাদের মতো আচরণ করায় হয়তো পৃথিবীতে তাদের কোনো শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করবে না। শেষ রুকু'তে তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে ও স্বাচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-মুদ্দাসসির : এ সূরার ১ থেকে ৭ পর্যন্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো নবী কারিম সা.-কে এ মর্মে আদেশ দেয়া হয় যে, আপনি উঠুন এবং আল্লাহর বান্দারা এখন যেভাবে চলছে তার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সাবধান করুন। আর পৃথিবীতে এখন যেখানে অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব জেঁকে বসেছে, সেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দিন। এর সাতে সাথে তাকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার দাবি হলো আপনার নিজের জীবন যেনো সবদিক থেকে পূত-পবিত্র হয় এবং আপনি সব রকমের পার্থিব স্বার্থ উপেক্ষা করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহর সৃষ্টির সংস্কার-সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর শেষ বাক্যটিতে নবী কারিম সা.-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি এবং বিপদাপদ আসুক না কোনো তিনি যেনো তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করেন। এ সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস হলো– ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতে ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, তারা আজ যা করছে কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তার খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।[৮৩] ১১ থেকে ২৬ পর্যন্ত আয়াতে ওয়ালিদ ইবন মুগিরার নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছে– মহান

---

৮২ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৯৩-৩৯৬

৮৩ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫-৫৭৬

আল্লাহ এ ব্যক্তিকে অঢেল নি'আমত দান করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে চরম শত্রুতা করেছে। ২৭ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আয়াতে জাহান্নামের ভয়াবহতা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন ধরনের নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী লোকেরা এর উপযুক্ত বলে গণ্য হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ৪৯-৫৩ পর্যন্ত আয়াতে কাফিরদের রোগের মূল ও উৎস কি তা বলে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কারো ঈমানের প্রয়োজন নেই যে, তিনি তাদের শর্ত পূরণ করতে থাকবেন। কুরআন সকলের জন্য এক উপদেশবাণী যা সকলের সামনে পেশ করা হয়েছে। কারো ইচ্ছা হলে সে এ বাণী গ্রহণ করবে।[৮৪]

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্ : এ সূরায় আখিরাতে অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের একেকটি সন্দেহ, আপত্তি ও অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মজবুত ও জোরালো প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আখিরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আখিরাতকে অস্বীকার করে, তার অস্বীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তারা অস্বীকার করছে তা অবশ্যই আসবে। তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোনো মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। পৃথিবীকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে ভুলানোর জন্য নিজের কাজকর্ম ও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি সে পেশ করুক না কেনো।[৮৫]

সূরা আল মুরসালাত : এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু কিয়ামত ও আখিরাতকে প্রমাণ করা এবং এ সত্যকে অস্বীকার করলে কিংবা মেনে নিলে পরিণামে যেসব ফলাফল পাবে সে বিষয়ে মক্কাবাসীদের সচেতন করে দেয়া।

সূরা আন-নাবা : এ সূরায় কিয়ামত ও আখিরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ এবং তা মানা ও না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদের অবহিত করা হয়েছে। সূরাটি নাযিলের পূর্বে কিয়ামতের সংবাদ শুনে মক্কাবাসীরা যেসব সমালোচনা ও মন্তব্য করতো এখানে সর্বপ্রথম সেদিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। তারপর অস্বীকারকারীদের মৌলিক কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। তাদেরকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা স্বীকার করুক না না করুক তাদের অস্বীকৃতি সে ঘটনা অনুষ্ঠানের পথ রোধ করতে পারবে না।[৮৬]

সূরা আন নাযি'আত : এ সূরারও বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণ এবং এ সঙ্গে আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা বলার পরিণাম সম্পর্কে কঠিন সাবধানবাণী উচ্চারণ। মক্কার কাফিরদের যে একটি প্রশ্ন ছিলো 'কিয়ামত কবে আসবে'– এর জবাব এ সূরায় দেয়া হয়েছে।

সূরা আবাসা : সূরা আবাসার সমস্ত বিষয়বস্তুকে এক সাথে সামনে রেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আসলে এখানে কুরাইশ কাফির নেতাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাম করা হয়েছে। কারণ এ নেতারা তাদের অহংকার, হঠকারিতা ও সত্য বিমুখতার কারণে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সত্য দা'ওয়াতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।[৮৭]

---

৮৪ আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ইবন হিশাম, অনূ ঃ আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবন হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৮৫ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬০-১১৬২

৮৬ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৩৯-৪৪২

৮৭ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৮-১১৮০

সূরা আত-তাকভির : এ সূরারও প্রধান বিষয়বস্তু দু'টি– আখিরাত ও কিয়ামত। প্রথম ৬টি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর রিসালাত সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ সা. তোমাদের সামনে যা কিছু উপস্থাপন করছেন সেগুলো কোনো পাগলের প্রলাপ নয়।[৮৮]

সূরা আল-ইনফিতার : এ সূরার বিষয়বস্তু আখিরাত। এখানে কিয়ামতের দিনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিরামান-কাতিবিনের উল্লেখ রয়েছে। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী উল্লেখ করে সেদিন সৎ লোকেরা জান্নাতে সুখের জীবন লাভ করবে এবং পাপীরা জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করবে। সেদিন কেউ কোনো কাজে আসবে না। সেদিন একমাত্র বিচারক হবেন মহান আল্লাহ তা'আলা।

সূরা আল মুত্বফফিফীন : এ সূরার বিষয়বস্তু আখিরাত। সূরার প্রথম ৬টি আয়াতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সাধারণ নীতি ওজনে কম দেয়া ও বেশি নেয়ার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো সে জন্য আখিরাতে তারা ধৃত হবে। ৭ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়াতে দুষ্কৃতিকারীদের কাজের বিবরণী প্রথমেই অপরাধজীবীদের কালো তালিকা লেখা হচ্ছে এবং আখিরাতে তাদের মারাত্মক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। ১৮ থেকে ২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের উত্তম পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে মু'মিনদের সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং এ সঙ্গে কাফিরদেরকে এ মর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে।[৮৯]

সূরা আল ইনশিক্বক্ব : এ সূরার বিষয়বস্তু কিয়ামত ও আখিরাত। প্রথম পাঁচটি আয়াতে কিয়ামতের অবস্থা ও প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। ৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ সচেতন বা অচেতন যে কোনোভাবেই হোক না কেনো সেই মনযিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে তার নিজেকে তার রবের সামনে পেশ করতে হবে। সবশেষে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনানো হয়েছে।

সূরা আল বুরূজ : এ সূরার বিষয়বস্তু মু'মিনদের উপর কাফিররা যে যুলুম করছিলো সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং মু'মিনদেরকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া যে, যদি তারা এসব যুলুম-নিপীড়নের মোকাবিলায় অবিচল থাকে তাহলে তারা এর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহ নিজেই যালিমদের থেকে বদলা নিবেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আসহাবুল উখদুদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। আর যে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো, তার প্রতিটি শব্দ অপরিবর্তনীয়। এ কুরআনের প্রতিটি শব্দ লাওহি মাহফুযে এমনভাবে খোদিত রয়েছে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা বদলাতে পারবে না।[৯০]

সূরা আত ত্বরিক : এ সূরায় সর্বপ্রথম আকাশের তারকাগুলোকে এ মর্মে স্বাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্বজাহানের কোনো একটি জিনিসও নেই যা কোনো এক সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখো কিভাবে এক বিন্দু শুক্র থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি জীবন্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। পৃথিবীর মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিলো সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব-নিকেশই হবে এ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য।

---

৮৮ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ২২৬-২৩০

৮৯ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৭৮-৪৮০

৯০ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯১-১১৯২

সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোনো ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।[৯১]

সূরা আল-আ'লা : এ সূরায় তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। (ক) তাওহিদ (খ) নবী কারিম সা.-কে উপদেশ দান (গ) আখিরাত।

সূরা আল-গশিয়াহ : এ সূরার প্রথমে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তাওহিদ ও আখিরাত বিষয়ক বক্তব্য বুঝানো হয়েছে। তারপর নবি কারিম সা.-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে, এরা না মানতে চাইলে না মানুক, আপনাকে তো এদের উপর বল প্রয়োগকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি।[৯২]

সূরা আল-ফাজর : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতা প্রমাণ করা। কারণ মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করে আসছিলো। এ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক পর্যায়ে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। প্রথমে ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম খেয়ে শ্রোতাদের প্রশ্ন করা হয়েছে, যে বিষয়টি তোমরা অস্বীকার করছো তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ঠ নয়? এরপর মানব জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামুদ জাতি এবং ফিরআউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। তারপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সবশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, হিসেব-নিকেশ অবশ্যই হবে এবং পরিণতিতে জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালার মাধ্যমে কিয়ামতের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সূরা আল-বালাদ : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের এবং মানুষের জন্য পৃথিবীর সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর উপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এখন মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পতে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে ইত্যাদি বিষয় এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[৯৩]

সূরা আশ-শামস : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ এবং নেকি ও গুনাহের মধ্যে পার্থক্য বুঝানো। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গুনাহের পথে চলার উপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানোই হলো এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। (ক) সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকি ও গুনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরস্পর বিরোধী। (খ) মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে পৃথিবীতে একেবারে চেতনাহীভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচতন মনে নেকি ও গুনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে

---

৯১ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১-৫

৯২ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫০৯-৫১২

৯৩ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০২-১২০৪

দিয়েছেন। (গ) মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরই উপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। সূরার দ্বিতীয় অংশে সামুদ জাতির ঐতিহাসিক নজির উপস্থাপন করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।[৯৪]

সূরা আল-লাইল : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং তাদের পরিণাম ও ফলাফলের প্রভেদ বর্ণনা করা। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু থেকে **১১** আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি **১২** আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রথম অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও দলগতভাবে পৃথিবীতে যা কিছু প্রচেষ্টা ও কর্ম তৎপরতা চালায় তা অনিবার্যভাবে নৈতিক দিক দিয়ে ঠিক তেমনি বিভিন্ন যেমন দিন ও রাত এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। (ক) পৃথিবীর এ পরীক্ষাগারে আল্লাহ মানুষকে অগ্রিম কিছু না জানিয়ে একেবারে অজ্ঞ করে পাঠিয়ে দেননি। (খ) পৃথিবী ও আকিরাত উভয়ের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। (গ) রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যে হতভাগ্য তাকে মিথ্যা গণ্য করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জ্বলন্ত আগুন।

সূরা আদ-দুহা : এ সূরার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সান্ত্বনা দেয়া। প্রাথমিক পর্যায়ে অহি নাযিলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানি দেখা দিয়েছিলো তা দূর করা।[৯৫]

সূরা আলাম নাশরাহ : এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূর বক্তব্য হচ্ছে নবী কারিম সা.-কে সান্ত্বনা দান করা। নবুওয়াত লাভ করার পর ইসলামি দা'ওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়াত লাভের আগে তাকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। এ অবস্থার উল্লেখ রয়েছে উক্ত সূরায়।

সূরা আত-তীন : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির স্বীকৃতি। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এরপর বলা হয়েছে, পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ রয়েছে। এক ধরনের মানুষ এ সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হওয়ার পর দুষ্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বরং নৈতিক অধপতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌঁছে যায়। সবশেষে একটি প্রশ্নের মাধ্যমে সূরাটি শেষ করা হয়েছে– 'আল্লাহ কি সব শাসকের চেয়ে বড় শাসক নন?'[৯৬]

সূরা আল-'আলাক্ব : এ সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি **১ম** আয়াত থেকে ৫ম আয়াত পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় অংশটি ৬ষ্ঠ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত। প্রথম অংশটা যে রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহি এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলিম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত পোষণ করেন। এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো পড়া,

---

৯৪ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ৭২-৭৭
৯৫ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮
৯৬ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১৬-১২১৭

রবের নাম নিয়ে পাঠ শুরু করা, মানব সৃষ্টির উৎস, কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করা। সূরার শেষ অংশে আল্লার রাসূল সা.-কে বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে।[৯৭]

সূরা আল-ক্বদর : মানুষকে কুরআন মাজিদের মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই এ সূরাটির মূল বিষয়বস্তু। কুরআন মাজিদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ সূরাকে সূরা আলাক্বের পরে রাখাই এ কথা প্রমাণ করে যে, সূরা আলাক্বের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে যে পবিত্র কিতাবটির নাযিল শুরু হয়েছিলো তা কেমন ভাগ্য নির্ণয়কারী রাতে নাযিল হয়, কেমন মহান মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এবং তার এ নাযিল হওয়ার অর্থ কি– এ সূরায় সে কথাই লোকদেরকে জানানো হয়েছে।

সূরা আল-আদিয়াত : মানুষ আখিরাতকে অস্বীকার করে অথবা তা থেকে অমনোযোগী হয়ে কেমন নৈতিক অধপতনে যায় এ কথা তাদের বুঝানোই এ সূরার উদ্দেশ্য। এ সঙ্গে আখিরাতে কেবল মানুষের বাইরের কাজকর্মই নয়, তাদের মনের গহীনে লুকায়িত কথাগুলোও যাচাই-বাছাই করা হবে, এ সম্পর্কেও এ সূরায় মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-ক্বরি'আহ্ : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখিরাত। সর্বপ্রথম মানুষকে একটা মহাদুর্ঘটনা! বলে আতংকিত করে দেয়া হয়েছে। সেটা জানানোর পর এর অবস্থা ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।[৯৮]

সূরা আত-তাকাছুর : এ সূরায় মানুষকে পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-আছর : এ সূরাটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য সমন্বিত বাণীর একটি অতুলনীয় নমুনা। কয়েকটা মাপামাপা শব্দের মধ্যে গভীর অর্থের এমন এক ভাণ।ডার রেখে দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কল্যঅণের এবং তার ধ্বংস ও সর্বনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে।[৯৯]

সূরা আল-হুমাযাহ : এ সূরায় এমন কিছু নৈতিক অসৎবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে যেগুলো জাহিলি সমাজে অর্থলোলুপ ধনীদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। প্রত্যেক আরববাসী জানতো, এ অসৎপ্রবণতাগুলো যথার্থই তাদের সমাজে সক্রিয় রয়েছে। সকলেই এগুলোকে খারাপ মনে করতো। একজনও এগুলোকে সৎগুণ মনে করতো না এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতো না। এ জঘন্য প্রবণতাগুলো উপস্থাপন করার পর আখিরাতে এ ধরনের চরিত্রের অধিকারী লোকদের পরিণাম কি হবে তা বলা হয়েছে। এ দু'টি বিষয় এমনিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে শ্রোতা নিজে নিজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, এ ধরনের কাজের ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির পরিণাম এটিই হয়ে থাকে।

সূরা আল-ফিল : ইয়ামনের শাসক আবরাহা কর্তৃক তার হস্তীবাহিনী দিয়ে পবিত্র কাবাগৃহ আক্রমনের ঐতিহাসিক ঘটনা ও তার পরিণতি এ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[১০০]

---

৯৭ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১১৭-১২০

৯৮ প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১৬৪-১৬৭

৯৯ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৬৩

১০০ আয-যামাকশারি, *তাফসীরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২১

সূরা কুরাইশ : নবী কারিম সা.-এর আবির্ভাবকালে যেহেতু এ অবস্থা সকলের জানা ছিলেঅ তাই এসব কথা আলোচনা করার প্রয়োজনও ছিলো না। এ কারনে এ চোট্ট সূরাটিতে চারটি আয়াতের মাধ্যমে কুরাইশদেরকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেরাই এ ঘরটিকে দেবমূর্তির মন্দির নয় বরং আল্লাহর ঘর বলে মনে করো এবং যখন তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আল্লাহই তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায় এহেন উন্নতি দান করেছেন এবং অভাব-অনাহার থেকে রক্ষা করে তোমাদেরকে এ ধরনের সমৃদ্ধি দান করেছেন তখন তোমাদের তো আসলে তাঁরই ইবাদত করা উচিত।[১০১]

সূরা আল মা'উন : আখিরাতের প্রতি ইমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু।

সূরা আল কাউছার : যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে আবতার তথা নির্বংশ বলা হয়। নবী কারিম সা.-এর পুত্র কাসিম অথবা ইবরাহিম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফিররা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগলো। তাদের মধ্যে 'আস ইবন ওয়াইলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কোনো আলোচনা হলে সে বলতো– আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সান্ত্বনার বাণী কাওছারের কথা উল্লেখ পূর্বক পৃথিবীতে কার নাম উচ্চারিত হবে আর কার নাম উচ্চারিত হবে না এ বিষয় এ সূরার মূল বক্তব্য।[১০২]

সূরা আল কাফিরূন : কুফরি ও কাফিরের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি ঈমানের চিরন্তন দাবি ও চাহিদা সূরা কাফিরূনের মূল বিষয়।

সূরা আল-লাহাব : কুরআনের মাত্র একটি স্থানেই ইসলামের শত্রুদের কারো নাম নিয়ে তার নিন্দা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর ইসলামি দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা পালন করেছে তার মোকাবিলায় আল্লাহপাক রাসূলুল্লাহ সা.-কে ধৈর্য ধারণের উপদেশ সম্বলিত এ সূরা। এতে আবু লাহাব, তার স্ত্রীর ও সম্পদের ধ্বংসের বর্ণনা রয়েছে।[১০৩]

সূরা আল-ইখলাছ : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহিদ ও আল্লাহর তা'আলার সত্তার স্বরূপ বর্ণনা।

মু'আওবিযাতাইন (সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস) : সূরা ফালাক্বে তিনটি জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ, বিপদ ও মুসবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র কুরআন সমাপ্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মানবজাতির জন্য সর্বশেষ হিদায়াতের বাণী বাহক ঐশীগ্রন্থ। এ গ্রন্থে ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রসিদ্ধতম মতে ৮৬টি মাক্কি সূরা রয়েছে। প্রত্যেকটি সূরার রয়েছে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। প্রায় সূরার বিষয়বস্তু হাদিস ও তাফসির গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তবে সূরাগুলোর বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সূরার অর্থের মধ্যেও নিহিত রয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করলে আল-কুরআনের একটা সূরার মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হয়।

---

১০১ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ২০০-২০৫

১০২ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫

১০৩ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ২৩৪-২৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মাক্কি সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতি জীবনের ২৩ বছরে পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরা নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর মাক্কি জীবনের ১৩ বছরে ৮৬টি সূরা বিভিন্ন বিষয়ে অবতীর্ণ হয়। মাক্কি সূরাগুলোর নাযিলের প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা নিচে আলোচনা করা হলো :

সূরা আল-ফাতিহা : এ সূরা মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদিসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটাই মুহাম্মাদ সা.এ উপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিলো। সেগুলো সূরা ‘আলাক’, সূরা ‘মুয্যাম্মিল’ ও সূরা ‘মুদ্দাসসির’ ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।[১০৪] এ সূরা থেকে উর্ধতন কারো কাছে আবেদন করার নিয়ম-পদ্ধতি ও কৌশল জানা যায়।

সূরা আল আন‘আম : হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা মতে এ সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো। হযরত মু‘আয ইবন জাবাল রা.-এর চাচাত বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ বলেন, ‘রাসূলুল্লাল্লাহ সা. উটনির পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হতে থাকে। তখর আমি তাঁর উটনির লাগাম ধরে ছিলাম। বোঝার ভারে উটনির অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো যেন মনে হচ্ছিল এই বুঝি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।’ হাদিসে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে রাতে এ সূরাটি নাযিল হয় সে রাতেই রাসূলুল্লাল্লাহ সা. এটাকে লিপিবদ্ধ করেন। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়, এ সূরাটি মাক্কি যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদের বর্ণনাটিও একথার সুস্পষ্ট সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ তিনি ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। হিজরতের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করার আগে নিছক তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে মক্কায় নবী সা.-এর খিদমতে হাযির হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকবেন তাঁর মক্কায় অবস্থানের শেষ বছরে। এর আগে ইয়াসরিববাসীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়নি যার ফলে তাদের একজন মহিলা তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে যেতে পারে।[১০৫]

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ তা‘আলার সোজাপথ একমাত্র কুরআন ও রাসূল সা.-এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সূরা আল আ'রাফ : এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সূরাটি সূরা আন'আমের প্রায় সমসময়ে নাযিল হয়। অবশ্য সূরা আ‘রাফ আগে না সূরা আন‘আম আগে নাযিল হয় তা নিশ্চয়তার সাথে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে এ সূরায় প্রদত্ত ভাষণের বাচনভঙ্গি থেকে এটি যে ঐ সময়ের সাথে সম্পর্কিত তা পরিষ্কার বুঝা যায়।[১০৬]

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– পরকাল ও রিসালাতের ধারণা হৃদয়াঙ্গম করা। পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও তাদের উম্মতদের আলোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা।

---

১০৪ আল-কুরতুবি, *আল-জামি‘ লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১০৮

১০৫ প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

১০৬ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা‘আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৭৪-৭৬

সূরা ইউনুস : এ সূরাটি কখন নাযিল হয়, এ সম্পর্কিত কোনো হাদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষের দিকে নাযিল হয়েছিলো।[১০৭] কারণ, এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামি দা'ওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে বরদাশত করতে রাযি ছিলো না। উপদেশ-অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদেরকে যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সতর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোনো ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্ট্যই তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরার হিজরতের প্রতি কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো না কোনো ইঙ্গিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দা'ওয়াত দেয়া, বুঝানো ও সতর্ক করার পদ্ধতি জানা।

সূরা হুদ : এ সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, এটা সূরা ইউনুসের সমসময়ে নাযিল হয়েছিলো।[১০৮] এমনকি তার অব্যবহিত পরেই যদি নাযিল হয়ে থাকে তবে তাও বিচিত্র নয়। কারণ, ভাষণের মূল বক্তব্য একই। তবে সতর্ক করে দেয়ার ধরনটা তার চেয়ে বেশি কড়া। হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর রা. নবী কারিম সা. কে বলেন– 'আমি দেখেছি আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি?' জবাবে তিনি বলেন, 'সূরা হূদ ও তারই মতো বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।' এ থেকে অনুমান করা যায়, যখন একদিকে কুরাইশ বংশীয় কাফিররা নিজেদের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে নবী কারিম সা.-এর সত্যের দা'ওয়াতকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক এসব সতর্কবাণী নাযিল হচ্ছিল, তখনকার সময়টা তাঁর কাছে কত কঠিন ছিলো। সম্ভবত এহেন অবস্থায় সর্বক্ষণ এ আশংকা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলো যে, আল্লাহর দেয়া অবকাশ কখন না জানি খতম হয়ে যায় এবং সে শেষ সময়টি এসে যায় যখন আল্লাহ কোনো জাতির উপর আযাব নাযিল করে তাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে এ সূরাটি অধ্যয়ন করার সময় মনে হতে থাকে যেন একটি বন্যার বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং যে অসতর্ক জনবসতিটি এ বন্যার গ্রাস হতে যাচ্ছে তাকে শেষ সাবধান বাণী শুনানো হচ্ছে।[১০৯]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– ঈমান ও কুফরির চূড়ান্ত ফয়সালার সময় এসে পড়লে দীনের প্রকৃতির এ দাবিই জানাতে থাকে যে, মু'মিন নিজেও যেনো পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারির মতো পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে একমাত্র সত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সব সম্বন্ধ কেটে ছিড়ে দূরে নিক্ষেপ করে। এহেন পরিস্থিতিতে বংশ ও রক্ত সম্পর্কের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্বও হবে ইসলামের প্রাণসত্তার সম্পর্ক বিরোধী।

---

১০৭ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬

১০৮ মুফতী মুহাম্মদ শাফী রহ., অনূঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

১০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

সূরা ইউসুফ : এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, এটিও নবী সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে নাযিল হয়েছে। তখন কুরাইশ বংশের লোকেরা নবী কারিম সা.-কে হত্যা বা দেশান্তর করবে, না বন্দী করবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো। এ সময় মক্কার কাফির সমাজের কোনো কোনো লোক নবী কারিম সা.-কে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে, বনী ইসরাঈলরা কি কারণে মিশরে চলে গিয়েছিলো? যেহেতু আরববাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানত না, তাদের কথা-কাহিনী ও পৌরাণিক বৃত্তান্তসমূহে কোথাও এর কোনো উল্লেখই পাওয়া যেতো না এবং নবী কারিম সা.-এর নিজের মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত কোনো কথা শোনা যায়নি, তাই তারা আশা করছিলো, তিনি এর কোনো বিস্তারিত জবাব দিতে পারবেন না অথবা এ সময় টালবাহানা করে কোনো ইহুদিকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে তাঁর বুযুর্গি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষায় উল্টো তারাই পরাজিত হলো। আল্লাহ কেবল সঙ্গে সঙ্গেই ইউসুফ আ.-এর এ ঘটনা সম্পূর্ণ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং এ ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফ আ.-এর ভাইদের মতো নবী সা. এর সাথে যে ব্যবহার করছিলো ঠিক তার সদৃশ ঘটনা উপস্থাপিত করলেন।[১১০]

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– ঈমান ও চরিত্র সঠিক থাকলে মানুষকে চরম পর্যায়ে নামিয়ে দেয়ার পরও সে নিছক নিজের ইমান ও চরিত্র বলে উঠে দাড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছুর উপর সে বিজয়ী হয়।

সূরা ইবরাহিম : সূরাটির সাধারণ বর্ণনা পদ্ধতি মক্কার শেষ যুগের সূরাগুলোর মতো। তাই এটা সূরা রা'দের নিকটবর্তী কালে অবতীর্ণ বলে মনে হয়। বিশেষ করে ১৩ নং আয়াতে– 'এবং অস্বীকারকারীরা নিজেদের রাসূলদের বললো, তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মীয় জাতিসত্ত্বার মধ্যে, অন্যথায় আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে' শব্দাবলি থেকে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সে সময় মক্কায় মুসলমানদের উপর জুলুম-নিপীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। মক্কাবাসীরা অতীতের কাফির জাতিগুলোর মতো তাদের দেশের মু'মিন সমাজকে দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলো। এ জন্য অতীতে তাদের মতো যেসব জাতি একই কর্মনীতি অবলম্বন করেছিলো তাদেরকে যে ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছিলো তাদেরকেও সেই একই হুমকি দেয়া হয়েছিলো– 'আমি জালিমদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বো।' অন্যদিকে মু'মিনদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই সান্ত্বনা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়– 'এ জালিমদেরকে খতম করার পর আমি এ ভূখণ্ডে তোমাদের বসতি স্থাপন করাবো।' এভাবে শেষ রুকূ'র আলোচ্য বিষয় থেকেও অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে।[১১১]

এ সূরা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহলো– ঈমানের স্বার্থে নিজের জীবনের মূল্যবান সর্বস্ব উৎসর্গ করতে পারলে তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

সূরা আল-হিজর : বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে আরো পরিষ্কার বুঝা যায়, এ সূরাটি সূরা ইবরাহিমের সমসময়ে নাযিল হয়।[১১২] এর পটভূমিতে দু'টি বিষয় পরষ্কিার দেখা যাচ্ছে। যথা–

---

১১০ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ১৭০-১৭২

১১১ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

১১২ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭-৫৬০

এক. নবী কারিম সা.-এর দা'ওয়াতের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। যে জাতিকে তিনি দা'ওয়াত দিচ্ছেন তাদের অবিরাম হঠকারিতা, বিদ্রুপ, বিরোধিতা, সংঘাত ও জুলুম-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরপর বুঝানোর সুযোগ কমে এসেছে এবং তার পরিবর্তে সতর্ক করা ও ভয় দেখানোর পরিবেশই বেশি সৃষ্টি হয়েছে।

দুই. নিজের জাতির কুফরি, স্থবিরতা ও বিরোধীতার পাহাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নবী কারিম সা. ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি বারবার হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তা দেখে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁর মনে সাহস যুগিয়েছেন।

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– দীনের পথের দা'ঈগণ যখন কোনো ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাবেন তখন এ সূরা থেকে সান্ত্বনা উৎস খুঁজে পাবেন।

সূরা আন-নাহল : বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয় এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালের উপর আলোকপাত করে। যেমন, ৪১ নং আয়াতের وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا আয়াতাংশ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সময় হাবশার হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ১০৬ নং আয়াতের مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْۢ بَعْدِ إِيْمَانِه আয়াতাংশ থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম-নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো যে, যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শারি'আতের বিধান কি হবে। ১১২-১১৪ আয়াতগুলোর– وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً .. .. إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ আয়াতগুলো পরিষ্কার এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, নবী কারিম সা.-এর নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এ সূরার ১১৫ নং আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ নং আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ নং আয়াতে এ সূরার ১১৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা দু'টির নাযিলের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিলো। এসব স্বাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরাটিও মাক্কি জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়।[১১৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– শিরক মিথ্যা এবং তাওহিদই সত্য। কাফিরদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার সঠিক জবাব। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোড়ামি এবং সত্যে মুকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিনতি।

সূরা বনি ইসরাঈল : প্রথম আয়াতটিই একথা ব্যক্ত করে দেয় যে, মি'রাজের সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। হাদিস ও সিরাতের অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হিজরতের এক বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিলো। তাই এসূরাটিও নবী কারিম সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।[১১৪]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এমনসব বড় বড় মূলনীতি যেগুলোর উপর জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১৩ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৬৫-৬৮

১১৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ২-৩

সূরা আল-কাহ্ফ : সূরা কাহ্ফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মাক্কি যুগের এ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।[১১৫] এ সময় জুলুম, নিপীড়ন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলিমরা হাবশায় হিজরত করেনি। তখন যেসব মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছিলো তাদেরকে আসহাবে কাহফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের হিম্মত বেড়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, ঈমানদাররা নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য ইতিপূর্বে কি করেছে।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– তাওহিদ ও আখিরাত হচ্ছে পুরোপুরি সত্য। একে মেনে নেয়া, সে অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করা এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে পার্থিব জীবন যাপন করার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ। অন্যথায় নিজেদের ধ্বংস অনিবার্য।

সূরা মারইয়াম : হাবশায় হিজরতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে জানা যায়, মুসলিম মুহাজিরদেরকে যখন হাবশার শাসক নাজ্জাশির দরবারে ডাকা হয় তখন হযরত জাফর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরাটি তিলাওয়াত করেন।[১১৬]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– সত্যের শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মু'মিনগণই জনগণের প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে।

সূরা ত্বোয়া-হা : সূরা মারইয়াম যে সময় নাযিল হয় এ সূরাটি তার কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়। সম্ভবত হাবশায় হিজরাতকালে অথবা তার পরবর্তীকালে এটা নাযিল হয়। তবে হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই যে এটা নাযিল হয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এটি হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরের ঘটনা।[১১৭]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা এবং অধৈর্য না হওয়া। আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, তিনি কোনো জাতিকে তার কুফরি ও অস্বীকারের কারণে সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করেন না বরং তাকে সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। কাজেই ভীত না হওয়া। ধৈর্য সহকারে এদের বাড়াবাড়ি ও যুলুম-অত্যাচার সহ্য করা এবং উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা।

সূরা আল-আম্বিয়া : এ সূরার নাযিলের সময়কাল ছিলো মাক্কি জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ নবী কারিম সা. এর মাক্কি জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে অবস্থার যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে উঠে না।[১১৮]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মুর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

১১৫ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৭৭-৮০

১১৬ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

১১৭ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০-৬৫২

১১৮ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ২৬৬-২৬৮

সূরা আল মু'মিনূন : এ সূরাটি মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়।[১১৯] প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী কারিম সা. ও কাফিরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফিরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫-৭৬ নং আয়াত থেকে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মাক্কি যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দখা দিয়েছিলো বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবন যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার আগেই উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবন আবদুল কারির বরাত দিয়ে হযরত উমর রা.-এর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অহি নাযিলের সময় নবী কারিম সা.-এর অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী কারিম সা. বলেন, এ সময় আমার উপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদণ্ডে পুরোপুরি পৌঁছে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শুনান।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– যারা সত্যের আহ্বায়ক ও রাসূল সা.-এর অনুসারীদের সাথে অসদাচরণ করে সেজন্য তাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

সূরা আল-ফুরকান : এ সূরাটিও সূরা মু'মিনূনের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রাসূল সা.-এর মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবন জারির ও ইমাম রাযি যাহ্হাক ইবন মুযাহিম ও মুকাতিল ইবন সুলাইমানের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটা সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয়। এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময় মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময়।[১২০]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সত্যের দা'ওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিনাম ভয়াবহ।

সূরা আশ-শু'আরা : বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যাচ্ছে এবং হাদিস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরাটির নাযিলের সময়কাল হচ্ছে মক্কার মধ্যবর্তীকালীন যুগ। ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনামতে প্রথমে সূরা ত্ব হা নাযিল হয়, তারপর ওয়াকি'আহ এবং এরপর সূরা শু'আরা।[১২১] আর সূরা ত্বোয়া-হা সম্পর্কে জানা আছে, এটি হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কোনো বিষয়ের শিক্ষা নিতে হলে অতীত জাতির ইতিহাস থেকেই তা নেয়া উচিত।

সূরা আন-নামল : বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে এ সূরা মক্কার মধ্যযুগের সূরাগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। হাদিস থেকেও এর সমর্থন মেলে। ইবন আব্বাস রা. ও

১১৯ মুহাম্মদ ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৩৪৯-৩৫১
১২০ প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ৫৫
১২১ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ৬৪

জাবের ইবন যায়েদ রা.-এর বর্ণনা হচ্ছে, ‘প্রথমে নাযিল হয় সূরা আশ-শু‘আরা তারপর আন-নামল এবং তারপর আল-ক্বাসাস।’[১২২]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দীনের দা‘ওয়াত গ্রহণ করলে নিজেদের লাভ এবং একে প্রত্যাখ্যান করলে নিজেদেরই ক্ষতি। একে মেনে নেয়ার জন্য যদি আল্লাহর এমন সব নিদর্শনের অপেক্ষা করা হয় যেগুলো এসে যাওয়ার পর আর না মেনে কোনো গত্যন্তর থাকবে না, তাহলে সে সময় মেনে নিলে কোনো লাভই হবে না।

সূরা আল-ক্বাসাস : সূরা নামলের ভূমিকায় ইবসে আব্বাস রা. ও জাবের ইবন যায়েদ রা. একটি উক্তি উদ্ধৃতি রয়েছে। তাতে দেখা যায়, সূরা শু‘আরা, সূরা নামল ও সূরা ক্বাসাস একের পর এক নাযিল হয়।[১২৩] ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায়ই একই সময় নাযিল হয়। আবার এদিক দিয়েও এদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সূরাগুলোতে হযরত মূসা আ. এর কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর মিলিত আকারে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। সূরা শু‘আরায় নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মুসা আ. বলেন– ‘ফিরাউনি জাতির বিরুদ্ধে একটি অপরাধের জন্য আমি দায়ী। এ কারণে আমার ভয় হচ্ছে, সেখানে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।’ তারপর হযরত মুসা আ. যখন ফিরাউনের কাছে যান তখন সে বলে– ‘আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে ছোট্ট শিশুটি থাকা অবস্থায় লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের এখানে কয়েক বছর থাকার পর যা করে গেছো তাতো করেছই।’ এ দু‘টো কথার কোনো বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে নেই। এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা নামলে এ কাহিনী সহসা একথার মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে, হযরত মুসা আ. তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটি আগুন দেখলেন। এটা কোন্ ধরনের সফর ছিলো, তিনি কোথা থেকে আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এর কোনো বিবরণ সেখানে নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ এ সূরায় পাওয়া যায়। এভাবে এ তিনটা সূরা মিলে হযরত মুসা আ. এর কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছে।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমন সব মৌলিক রোগের চিকিৎসা যেগুলোর কারণে মানুষ পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে থাকে।

সূরা আল-‘আনকাবূত : সূরা ‘আনকাবুতের ৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিলো।[১২৪] যেহেতু, এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকির প্রকাশ হয় মদিনায়, সেহেতু কোনো কোনো মুফাসসির ধারণা করে নিয়েছেন যে, সূরাটির প্রথম দশটি

---

১২২ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা‘আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ১৫৪-১৫৭

১২৩ মুহাম্মদ ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৫-৮

১২৪ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

আয়াত হচ্ছে মাদানি এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মাক্কি। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকির কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফিরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকি অবলম্বন করেছিলো। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকির ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদিনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলিমদেরকে হিজরত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোনো কোনো মুফাস্সির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন। অথচ মদিনায় হিজরতের আগে মুসলিমগণ হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোনো হাদিসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর উপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ অভ্যন্তরীণ বিষয় মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি ইশারা করে যে যুগে মুসলিমদের হাবশায় হিজরত সংঘটিত হয়েছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– তাওহিদ ও আখিরাত উভয় সত্যকে যুক্তিসহকারে মানুষকে বুঝানোর পদ্ধতি এবং শিরককে খণ্ডন করার যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ম।

সূরা আর-রূম : শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, 'নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।' সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিলো জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন। এসব এলাকায় রোমানদের উপর ইরানিদের বিজয় ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিলো। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটা সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– যেমন মৃত পতিত যমিন আল্লাহ প্রেরিত বৃষ্টির স্পর্শে সহসা জীবন্ত হয়ে উঠে এবং জীবন ও ফসলের ভাণ্ডার উদ্গীরণ করতে থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ প্রেরিত অহি ও নবুওয়াতও মৃত পতিত মানবতার পক্ষে রহমতের বারিধারা স্বরূপ এবং এর নাযিল হওয়া তার জন্য জীবন, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কল্যাণর উৎসের কারণ হয়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে যে কোনো অনুর্বর ভূমি আল্লাহর রহমতে শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে এবং সমস্ত কল্যাণ লাভ করে। আর এর সদ্ব্যবহার না করলে নিজেদেরই ক্ষতি।

সূরা লুকমান : এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন ইসলামের দা'ওয়াতের কণ্ঠরোধ এবং তার অগ্রগতির পথরোধ করার জন্য জুলুম-নিপীড়নের সূচনা হয়ে গিয়েছিলো এবং এ জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছিলো। কিন্তু তখনও বিরোধিতার তোড়জোড় ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি। সূরার ১৪ ও ১৫ নং আয়াত থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার যথার্থই আল্লাহর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা যদি তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা কখনোই মেনে নিবে না। এ কথাই সূরা 'আনকাবূতে বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, দু'টি সূরাই একই সময় নাযিল হয়।[১২৫] কিন্তু উভয় সূরার বর্ণনা রীতি ও বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে অনুমান করা যায় সূরা লুকমান প্রথম নাযিল হয়। কারণ এর পশ্চাতভূমে কোনো তীব্র আকারের বিরোধিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিপরীত পক্ষে সূরা

---

১২৫ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ. ৫৫-৫৭

'আনকাবূত পড়লে মনে হবে তার নাযিলের সময় মুসলমানদের উপর কঠোর জুলুম নিপীড়ন চলছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– মুহাম্মদ সা. যে বাণী প্রচার করতেন তা মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো আওয়াজ ছিলো না। বরং পূর্বেও লোকেরা বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী ছিলো এবং তারা একথাই বলতো যা আজ মুহাম্মদ সা. বলছেন। যেমন হযরত লুকমান আ. তাদের একজন।

সূরা আস-সাজদাহ্ : এ সূরার নাযিল হবার সময়টা হচ্ছে মক্কার মধ্যযুগ এবং তারও একেবারে শুরুর দিকে। কারণ পরবর্তী যুগে নাযিলকৃত সূরাগুলোর পশ্চাতভূমিতে যেমন জুলুম-নিপীড়নের প্রচণ্ডতা দেখা যায় এবং এ সূরাটির পটভূমিতে সে ধরনের প্রচণ্ডতা অনুপস্থিত।[১২৬]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– চূড়ান্ত ফয়সালার দিন আসার পূর্বেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বিবেকের দাবি রাখে।

সূরা সাবা : এ সূরা নাযিলের সময়কাল ছিলো মক্কার মাঝামাঝি যুগ অথবা প্রাথমিক যুগ।[১২৭] যদি মাঝমাঝি যুগ হয়ে থাকে, তাহলে সেটি ছিলো তার একেবারে প্রথম দিকের সময়। তখন পর্যন্ত জুলুম-নিপীড়নের তীব্রতা দেখা দেয়নি এবং তখনো কেবলমাত্র ঠাট্টা-তামাশা, বিদ্রুপ, গুজব ছড়ানো এবং মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দেয়ার মাধ্যমে ইসলামি আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কুফর ও শিরক এবং আখিরাত অস্বীকার ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে উঠে তা মোটেই উত্তম নয়; বরং তাওহিদ ও আখিরাতের বিশ্বাস এবং নি'আমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে উঠে তা সর্বোত্তম।

সূরা আল-ফাতির : মক্কা মুকাররমার মধ্যযুগে এ সূরাটা নাযিল হয়।[১২৮] এ যুগেরও এমন সময় সূরাটি নাযিল হয় যখন ঘোরতর বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং নবী কারিম সা.-এর দা'ওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সব রকমের অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– একজন দা'ঈ যখন দা'ওয়াত দেয়ার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেন তখন যারা গুমরাহির উপর অবিচল থাকতে চাচ্ছে তাদের সঠিক পথে চলার আহ্বানে সাড়া না দেয়ার দায়-দায়িত্ব দা'ঈর উপর বর্তায় না। এতে দা'ঈর মনোবল বাড়ে এবং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করে সত্যের পথে অবিচল থাকতে পারে।

সূরা ইয়াসিন : বর্ণনাভঙ্গি দেখে অনুভব করা যায়, এ সূরার নাযিল হবার সময়টি হবে নবী কারীমের সা. নবুওয়াত লাভ করার পর মক্কায় অবস্থানের মধ্যবর্তী যুগের শেষের দিনগুলো। অথবা এটি হবে তাঁর মক্কায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিনগুলোর একটি সূরা।[১২৯]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– নবুওয়অতের উপর ঈমান না আনলে এবংযুলুম ও বিদ্রুপের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করলে তার পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ।

---

১২৬ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২১, পৃ. ১১৫-১১৮
১২৭ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
১২৮ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৯-৮৮০
১২৯ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১-৪

সূরা আস সফ্ফাত : বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে মনে হয়, এ সূরাটি সম্ভবত মাক্কি যুগের মাঝমাঝি সময়ে বরং সম্ভবত ঐ মধ্য যুগেরও শেষের দিকে নাযিল হয়। বর্ণনাভঙ্গি থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পশ্চাতভূমিতে বিরোধিতা চলছে প্রচণ্ড ধারায় এবং নবী সা. ও তাঁর সাহাবিগণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন।[১৩০]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দীনের দা'ওয়াতের সূচনা করতে গিয়ে যারা বিপদ আপদের মুখোমুখি হন তাতে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত না হওয়া উচিত। কারণ শেষ পর্যন্ত বিজয় তাদেরই পদচুম্বন করে এবং বাতিলের পতাকাবাহীদেরকে বর্তমানে বিজয়ীর যে আসনে দেখা যাচ্ছে, তারা তাদেরই হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে থাকে।

সূরা সোয়াদ : এ সূরাটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিলো যখন নবী কারিম সা. মক্কা মুকাররমায় প্রকাশ্যে দা'ওয়াত শুরু করেছিলেন এবং এ কারণে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এ হিসেবে প্রায় নবুওয়াতের চতুর্থ বছরটি এর নাযিল হবার সময় হিসেবে গণ্য হয়। অন্যান্য হাদিসে একে হযরত উমর রা. এর ঈমান আনার পরের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর উমর রা. হাবশায় হিজরতের পর ঈমান আনেন, একথা সবার জানা। আর এক ধরনের হাদিস থেকে জানা যায়, আবু তালিবের শেষ রোগগ্রস্ততার সময় যে ঘটনা ঘটে তারই ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হয়। একে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর নাযিলের সময় হিসেবে ধরতে হয় নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছরকে।[১৩১]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দীনের দা'ঈদের মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে যারা তাদের হিংসা করে, তাদের পরিণতি তেমনি হবে যেমন পরিণতি হবে পরকালে ইবলিসের।

সূরা আয-যুমার : এ সূরা হাবশা হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবন আবি তালিব ও তার সঙ্গী-সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো।[১৩২]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দা'ঈকে তার দা'ওয়াতি কার্যক্রম ধৈর্য ও আখিরাতের পুরস্কারের প্রত্যাশায় অবিচল থেকে চালিয়ে যেতে হবে। কোনো যালিমের রক্তচক্ষু তার পথে বাধা দিলেও তিনি তার পরওয়া করবেন না।

সূরা আল-মু'মিন : ইবন আব্বাস ও জাবের ইবন যায়েদ রা. বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরাটি সূরা যুমার নাযিল হওয়ার পর পরই নাযিল হয়েছে।[১৩৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে যারা বিরত না হয় তাহলে অতীতের জাতিসমূহ যে পরিণাম ভোগ করেছে তারাও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে এবং আখিরাতে তাদের জন্য তার চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণাম নির্ধারিত থাকবে।

---

১৩০ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৩, পৃ. ৬৪-৬৬
১৩১ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১৩২ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৩, পৃ. ২২৬
১৩৩ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৯-৯৫১

সূরা হা মীম আস-সাজদাহ : এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে হযরত হামযার রা. ঈমান আনার পর এবং হযরত উমরের রা. ঈমান আনার পূর্বে।[১৩৪] নবী সা.-এর প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কায়যীর বর্ণনাসূত্রে এ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন এবং আরও কতিপয় মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকেও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে শব্দগত কিছু মতপার্থক্য আছে। ঐ সব বর্ণনার কোনো কোনোটাতে এ কথাও আছে যে, নবী কারিম সা. তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়–[১৩৫]

فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ.

এ আয়াতটি পড়লেন তখন 'উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের উপর হাত চেপে ধরে বলল– 'আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের জাতির প্রতি সদয় হও।' পরে কুরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের বর্ণনা করেছে, এ বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদ সা.-এর মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের উপর আযাব নাযিল না হয় তা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।[১৩৬]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– বাতিলের প্রদর্শনীমূলক বাধার পাহাড় বাহ্যত অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু নৈতিক চরিত্রের হাতিয়ার এমন হাতিয়ার যা ঐসব বাধার পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে গলিয়ে দেয়। ধৈর্যের সাথে উত্তম নৈতিক চরিত্রকে কাজে লাগিয়ে এবং যখনই শয়তান উত্তেজনা সৃষ্টি করে অন্য কোনো হাতিয়ার ব্যবহার করতে উস্কানি দেয় তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্তব্য।

সূরা আশ-শূরা : নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে।[১৩৭]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দীনের একটি পরিস্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা এ সূরা থেকে জানা জ্ঞাত হওয়া।

সূরা আয-যুখরুফ : যে যুগে সূরা আল-মু'মিন, হা মীম সাজদাহ ও আশ শূরা নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। মক্কার কাফিররা যে সময় নবী সা.-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো সেই সময় যে সূরাগুলো নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও তারই একটি। সে সময় মক্কার কাফিররা সভায় বসে বসে নবী কারিম সা.-কে কিভাবে হত্যা করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করত। তাঁকে হত্যা করা জন্য একটি আক্রমণ সংঘটিতও হয়েছিলো।[১৩৮] ৭৯ ও ৮০ আয়াতে এ পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তানাদি নেই। আসমান ও যমিনের আল্লাহ এক ও অভিন্ন। এমন কোনো সুপারিশকারী নেই যে জেনে বুঝে গুমরাহির পথ অবলম্বনকারীদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব। তাঁর কোনো শরিক নেই।

---

১৩৪ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৩৩৭-৩৩৯

১৩৫ 'এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির মত অকস্মাৎ আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।' দ্র. আল-কুরআন, ৪১ : ১৩

১৩৬ ইবন কাসির, *তাফসীরে ইবন কাসির*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৯০-৯১

১৩৭ ইবন কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬২

১৩৮ মুহাম্মদ ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৫০৭-৫০৯

সূরা আদ-দুখান : এ বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রত্যক্ষ করলে বুঝা যায় যে, যে সময় সূরা 'যুখরুফ' ও তার পরবর্তী কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছিলো। এ সূরাটাও সে যুগে নাযিল হয়েছিলো। তবে এটি ঐগুলোর অল্প কিছুকাল পরে নাযিল হয়।[১৩৯] এর ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফিরদের বৈরী কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে তখন নবী সা. এই বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত আমাকে একটি দুর্ভিক্ষ দিয়ে সাহায্য কর। নবী সা. মনে করেছিলেন, এদের উপর বিপদ আসলে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভালো কথা শুনার জন্য মন নরম হবে। আল্লাহ নবীর সা. দু'আ কবুল করলেন। গোটা অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ নেমে এলো যে, সবাই অস্থির হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ নেতা– হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ যাদের মধ্যে বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন– নবী কারিম সা.-এর কাছে এসে আবেদন জানালো যে, নিজের জাতিকে এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। এ অবস্থায় আল্লাহ এ সূরাটা নাযিল করেন।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কুরআন মানুষের বুঝানোর জন্য পরিস্কার ও সহজ-সরল ভঙ্গিতে তাদের ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। এরপরও যদি তারা না বুঝে এবং চরম পরিণতি দেখার জন্য জিদ ধরে বসে থাকে তাহলে তার ভয়াবহ পরিণতির জন্য যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাদের।

সূরা আল-জাছিয়া : এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এটি সূরা 'দুখান' নাযিল হওয়ার অল্প দিন পরই নাযিল হয়েছে।[১৪০] এ দুটো সূরার বিষয়বস্তু এতটা সাদৃশ্য বিদ্যমান যে, সূরা দু'টোকে যুগ্ম বলে মনে হয়।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আল জীবনদাতা, মরণদাতা ও পুনরুত্থানকারী। আখিরাতের আক্বিদার প্রতি অস্বীকৃতি এবং এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

সূরা আল-আহক্বফ : এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়কাল ২৯ থেকে ৩২ নং আয়াতে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নিরূপিত হয়। ঐ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাদিস ও সিরাত গ্রন্থসমূহের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ অনুসারে নবী কারিম সা. যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে নাখলা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছিলো। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুসারে হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবী কারিম সা. তায়েফ গমন করেছিলেন। সুতরাং এ সূরা যে নবুওয়াতের ১০ম বছরের শেষ দিকে অথবা ১১শ বছরের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিলো তা নিরূপিত হয়।[১৪১]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কেউ বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্য ও বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে যদি গোড়ামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে কুরআনের দা'ওয়াত ও রাসূল সা.-এর রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে তার ভবিষ্যত নিজেই ধ্বংস করলো।

---

১৩৯ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯

১৪০ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৪-১০০৫

১৪১ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ. ১৭৮-১৮১

সূরা ক্বফ : ঠিক কোন্ সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি মাক্কি যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।[১৪২] মাক্কি যুগের দ্বিতীয় পর্যায় নবুওয়াতের তৃতীয় সন থেকে শুরু করে পঞ্চম সন পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়। এ সময় কাফিরদের বিরোধিতা বেশ কঠোরতা লাভ করেছিলো। কিন্তু তখনও সরাসরি জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– জান্নাত ও জাহান্নাম বিবেক বিরোধী বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা-ই সত্য। সত্যের সাথে বিরোধীরা এ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আল্লাহকে ভয় করে যারা সঠিক পথে চলবে তারা তাদের সামনে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সূরা আয-যারিয়াত : যে সময় নবী সা. এর ইসলামি আন্দোলনের মোকাবিলা অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে অত্যন্ত জোরে শোরেই করা হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু জুলুম ও নিষ্ঠুরতার যাঁতাকলে নিস্পেষণ শুরু হয়নি, ঠিক এ যুগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিলো। এ কারণে যে যুগে সূরা ক্বফ নাযিল হয়েছিলো এটিও সে যুগের নাযিল হওয়া সূরা বলে প্রতীয়মান হয়।[১৪৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– যারা সত্য দীনের বিরোধীতা করে তারা কোনো যুক্তির ভিত্তিতে করে না; বরং এটা তাদের হঠকারিতা ও জাহিলী অহংকারের প্রতিফলন। যার উৎস ও চারিকা শক্তি বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব দীনের দা'ঈগণ এসব বিদ্রোহীদের আদৌ ভ্রুক্ষেপ করবে না। নিজের দা'ওয়াত ও নসিহতের কাজ চালিয়ে যাবেন।

সূরা আত-তুর : মাক্কি জীবনের যে যুগে সূরা আয যারিয়াত নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও সে যুগে নাযিল হয়েছিলো। সূরাটি পড়তে গিয়ে একথা অবশ্যই মনে হয় যে, এটি নাযিল হওয়ার সময় নবী সা. এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তবে তখনও চরম জুলুম-অত্যাচার শুরু হয়েছিলো বলে মনে হয় না।[১৪৪]

সূরা আন-নাজম : সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসাঈতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যে সূরাটিতে সাজদাহর আয়াত নাযিল হয়েছে, সেটি হচ্ছে আন-নাজ্‌ম। এ হাদিসের যে অংশসমূহ আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ, আবু ইসহাক এবং যুহায়ির ইবন মুয়াবিয়া কর্তক ইবন মাসউদের রিওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, এটা কুরআন মাজিদের প্রথম সূরা যা রাসূলুল্লাহ সা. কুরাইশদের এক সমাবেশে– ইবন মারদুইয়ার বর্ণনা অনুসারে হারাম শরীফের মধ্যে শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফির ও ঈমানদার সব শ্রেণির লোক উপস্থিত ছিলো। অবশেষে তিনি সাজদাহর আয়াত পড়ে সাজদাহ করলে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সাজদাহ করে। এমনকি মুশরিকদের বড় বড় নেতা যারা তাঁর বিরোধিতার অগ্রভাগে ছিলো তারাও সাজদাহ না করে থাকতে পারেনি। ইবন মাসউদ রা. বর্ণনা করেন; আমি কাফিরদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমাইয়া ইবন খালফকে দেখলাম, সে সাজদাহ করার পরিবর্তে কিছু মাটি উঠিয়ে কপালে

---

১৪২ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৩-১০৪৪

১৪৩ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ. ১৯-২৫

১৪৪ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৭, পৃ. ২৬-২৯

লাগিয়ে বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে আমি নিজ চোখে তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

ইবন সা'দ বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে নবুওয়াতের ৫ম বছরের রজব মাসে সাহাবা কিরামের একটি ছোট্ট দল হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরে ঐ বছর রমযান মাসেই এ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. কুরাইশদের জনসমাবেশে সূরা নাজম পাঠ করে শুনান এবং এতে কাফের ও ঈমানদার সবাই তাঁর সাথে সাজদায় পড়ে যায়। হাবশায় মুহাজিরদের কাছে এ কাহিনী এভাবে পৌঁছে যে, মক্কার কাফেররা মুসলমান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে তাদের মধ্যকার কিছুলোক নবুওয়াতের ৫ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে আসার পর জানতে পারেন যে, জুলুম-নির্যাতন আগের মতই চলছে। অবশেষ হাবশায় দ্বিতীয়বারের মত হিজরত সংঘটিত হয়। এতে প্রথমবারের হিজরতের তুলনায় অনক বেশী লোক মক্কা ছেড়ে চলে যায়। এভাবে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের ৫ম বছরে নাযিল হয়েছিলো।[১৪৫]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– প্রকৃত মুসলিম কোনো সময় ঈমানের ব্যাপারে অনর্থক যুক্তির পিছনে সময় ক্ষেপণ করে না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যখনই কোনো হুকুম আসে সাথে সাথেই তার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে।

সূরা আল-ক্বমার : এ সূরার মধ্যে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এ থেকেই এর নাযিলের সময়কাল চিহ্নিত হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার এ ঘটনা হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় মিনা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।[১৪৬]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আখিরাতের বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এ সূরার দাবি।

সূরা আল-ওয়াকি'আহ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস সূরাসমুহ নাযিলের যে পরম্পরা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন, প্রথমে সূরা ত্বাহা নাযিল হয়, তারপর আল-ওয়াকি'আ এবং তারও পরে সূরা আশ-শুআরা। ইকরামাও এ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবন হিশাম ইবন ইসহাক থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ঘটনাতে বলা হয়েছে হযরত উমর রা. যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সূরা ত্বোয়া-হা তিলাওয়াত হচ্ছিল। তাঁর উপস্থিতির আভাস পেয়ে সকলেই কুরআনের আয়াত লিখিত পাতাসমূহ লুকিয়ে ফেললো। হযরত উমর রা. প্রথমেই ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করার জন্য বোন এগিয়ে আসলে তাঁকেও এমন প্রহার করলেন যে, তাঁর মাথা ফেটে গেলো। বোনের শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর রা. অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন, তোমরা যে সহিফা লুকিয়ে রেখেছো তা আমাকে দেখাও। তাতে কি লেখা আছে দেখতে চাই। শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে আপনি অপবিত্র 'কেবল পবিত্র লোকেরাই ঐ সহিফা হাতে নিতে পারে।' একথা শুনে হযরত উমর রা. গিয়ে গোসল করলেন এবং তারপর সহিফা নিয়ে পাঠ করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা

---

১৪৫ মুহাম্মদ ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৪২-১৪৫

১৪৬ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮

যায় যে, তখন সূরা ওয়াকি‘আহ নাযিল হয়েছিলো। কারণ ঐ সূরার মধ্যে لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ আয়াতাংশ আছে। আর একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত উমর রা. হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১৪৭]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– গর্ব, অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতার অহমিকায় বাস্তব সম্পর্কে অন্ধ হয়ে না থেকে চোখের সামনে অন্যের মৃত্যুর মুহূর্তকে স্মরণ করে নিজেকে শুধরিয়ে নেয়া কর্তব্য।

সূরা আল-মুলক : এ সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।[১৪৮]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– বিশ্বজাহানে মানুষ বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। এখানে মানুষকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আল্লাহদ্রোহীরা শুধু দীনের বিরোধিতা করে না তারা দীনের দা‘ঈদেরকে পথভ্রষ্ট বলেও মনে করে।

সূরা আল-ক্বলাম : এটিও মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন মক্কা নগরীতে রাসূলুল্লাহ সা. এর বিরোধিতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিলো।[১৪৯]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– চূড়ান্ত ফয়সালা না আসা পর্যন্ত দীনের প্রচার ও প্রসারের পথে যত দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেনো, ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করতে হবে এবং এমন অধৈর্য হওয়া যাবে না যা হযরত ইউনুস আ.-এর জন্য কঠিন পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

সূরা আল-হাক্কাহ্ : এ সূরাটিও মাক্কি জীবনের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। এর বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায়, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরোধিতা শুরু হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনও তা তেমন তীব্র হয়ে উঠেনি।[১৫০]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কুরআন কোনো কাবির কাব্য নয়, গণকের গণনা নয়, বরং তা আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী। তা একজন সম্মানিত রাসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। এ বাণীর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দও হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকার রাসূলের নেই। যারাই এ বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুশোচনা করতে হবে।

সূরা আল-মা‘আরিজ : গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটা ৭০তম ও নাযিলের ধারাবাহিকতায় ৭৯তম এবং সূরা আল-হাক্কার পরে নাযিল হয়।[১৫১] বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা আল-হাক্কাহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও মোটামুটি সে একই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দীনের দা‘ঈগণ বিরোধীদের উপহাস-বিদ্রুপের তোয়াক্কা করবে না। তারা যদি চিরসত্য ও কিয়ামতের লাঞ্ছনা দেখার জন্যই জিদ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে এ অর্থহীন তৎপরতায় লিপ্ত থাকার জন্য দুঃখজনক পরিনতি ভোগ করতে হবে।

---

১৪৭ আল-কুরতুবি, *আল-জামি‘ লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ. ১৯৪-১৯৫
১৪৮ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা‘আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৯, পৃ. ২-৪
১৪৯ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫
১৫০ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬
১৫১ আল-জারামি, *মু‘জামু ‘উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

সূরা নূহ : এটাও রাসূলুল্লাহ সা. এর মাক্কি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর দা'ওয়াত ও তাবলিগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের শত্রুতামূলক আচরণ বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছিলো তখন এ সূরাটি নাযিল হয়।[১৫২]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– সত্য দীনের দা'ওয়াত প্রদানের সঠিক নিয়ম, পদ্ধতি ও কৌশল।

সূরা আল-জ্বিন : সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে উকাযের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের ইমামতি করেন। সে সময় একদল জ্বিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনোযোগসহ কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকে। ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা মতে এ সূরায় বর্ণিত সফরে জ্বিনদের কুরআন শোনার ঘটনা তখন ঘটেছিলো যখন তিনি মক্কা থেকে উকায যাচ্ছিলেন। এসব কারণে যে বিষয়টি সঠিক বলে জানা যায় তাহলো, সূরা আহক্বাফ এবং সূরা জ্বিন একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন সফরে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দু'টো ঘটনা।[১৫৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– শিরক পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে অবিচল থাকলে আল্লাহর অজস্র নি'আমত বর্ষিত হয়। অন্যথায় আল্লাহর পাঠানো উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হতে হবে।

সূরা আল-মুয্যাম্মিল : এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনা থেকেও বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মাক্কি জীবনের কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিলো? হাদিসের বর্ণনাসমূহ এবং পুরো রুকূ'টির বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।[১৫৪]

প্রথমত: এতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের গুরু-দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেলো যে, এ নির্দেশটি রাসূল সা.-এর নবুওয়াতের একেবারে প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়েছিলো যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো।

দ্বিতীয়ত: এর মধ্যে তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশি রাত পর্যন্ত কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মাজিদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিলো যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

---

১৫২ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৮, পৃ. ২৯৮-৩০০

১৫৩ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৯, পৃ. ৮১-৮৩

১৫৪ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

তৃতীয়ত: প্রথম রুকূ'তে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং মক্কার কাফিরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূ'টি যখন নাযিল হয়েছিলো তখন রাসূলুল্লাহ সা. ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্র আকার ধারণ করেছিলো।

দ্বিতীয় রুকূ' সম্পর্কে মুফাসসিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটাও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদিনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূ'টির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোনো প্রশ্নই ছিলো না। একে ফরযকৃত যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উপর একটি নির্দিষ্ট যাকাত দেয়া মদিনাতে ফরয হয়েছে।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আল্লাহর পথে দা'ওয়াতদাতা দা'ঈগণ সারাদিন মানুষকে দা'ওয়াত দিবেন এবং রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবেন আর সকলের হিদায়াতের জন্য দু'আ করবেন।

সূরা আল-মুদ্দাসসির : এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিলো। গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছে এ বিষয়টি সর্বসম্মত স্বীকৃত যে, রাসূল সা.-এর উপর সর্বপ্রথম যে অহি নাযিল হয়েছিলো তা ছিলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, এ প্রথম অহি নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর কোনো অহি নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহি নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাসসিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিলো। ইমাম যুহরি এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'কিছুকাল পর্যন্ত রাসূলূল্লাহ সা.-এর উপর অহি নাযিল বন্ধ থাকে। সে সময় তিনি এত কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, কোনো কোনো সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করতে বা গড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোনো চূড়ার কাছাকছি পৌঁছতেন তখনই জিবরাঈল আ. তাঁর সামনে এসে বলতেন, 'আপনি তো আল্লাহর নবী' এতে তাঁর হৃদয়-মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো এবং তাঁর অস্বস্তি ও অস্থিরতা ভাব বিদূরিত হতো।'[১৫৫]

এরপর ইমাম যুহরি নিজে হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহর রিওয়ায়াতেই এভাবে উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. অহি বন্ধ থাকার সময়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'একদিন আমি পথে চলছিলাম। হঠাৎ আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। উপরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম হেরা গিরি গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলো সে ফেরেশতা আসমান ও যমিনের মাঝখানে একটি আসন পেতে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং বাড়িতে পৌঁছেই বললাম, আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো, আমকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। সুতরাং বাড়ির লোকজন আমাকে কম্বল দিয়ে আচ্ছাদিত করলো। এ অবস্থায় আল্লাহ অহি নাযিল করলেন, يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ

১৫৫ ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪০০-৪০১

এরপর অব্যাহতভাবে অহি নাযিল হতে থাকে।'[১৫৬] প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজ্জের মওসুম সমাগত হলে সূরার অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ৮ম আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।[১৫৭]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দীনের পথের দা'ঈগণ মানুষকে সতর্ক করতে থাকবেন। স্বীয় রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবেন। নিজের অন্তর ও পোশাক পূত-পবিত্র রাখবেন। নিঃস্বার্থভাবে ইহসান করবেন এবং দা'ওয়াতের পথে অসীম ধৈর্যধারণ করবেন।

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্ : এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি বিষয় বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার **১৫** নং আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে রাসূলুল্লাহ সা. কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, এ অহিকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহ্বা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০শ আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে **১৫**শ আয়াত পর্যন্ত চলছিলো। যে সময় হযরত জিবরাঈল আ. এ সূরাটি রাসূল সা. কে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখ আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদিসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সা. সবেমাত্র অহি নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং অহি গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনও গড়ে উঠেনি। কুরআন মাজিদে এর আরও দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্ব হা যেখানে রাসূলুল্লাহ সা. কে সম্বধন করে বলা হয়েছে,[১৫৮]

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضٰى إِلَيْكَ وَحْيُه.

দ্বিতীয়টি সূরা আ'লায়। এখানে নবী সা. কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى 'আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর তুমি আর ভুলবে না।'[১৫৯] পরবর্তী সময়ে রাসূল সা.-এর অহির ব্যাপারে ভালোভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।[১৬০]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কিয়ামত ও আখিরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতার প্রমাণ।

সূরা আল-মুরসালাত : এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পায় যে, এটা মাক্কি যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিলো। এর আগের দু'টো সূরা অর্থাৎ সূরা কিয়ামাহ ও সূরা দাহর এবং পরের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা আননাবা ও নাযি'আত যদি এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে

---

১৫৬ প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪০৩
১৫৭ ইবন হিশাম, অনূঃ আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবন হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১৫৮ আল-কুরআন, ৭৫ : ১১৪
১৫৯ আল-কুরআন, ৮৭ : ৬
১৬০ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬০-১১৬২

পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সূরাগুলো সব একই যুগে অবতীর্ণ। আর এর বিষয়বস্তুও একই যা বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের মন-মগজে বদ্ধমূল করা হয়েছে।[১৬১]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– পবিত্র কুরআনই হলো একমাত্র হিদায়াতের মাধ্যম। কুরআনের মাধ্যমে যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না পৃথিবীর অন্য কোনো জিনিস তাকে হিদায়াত দান করতে পারবে না।

সূরা আন-নাবা : এ সূরার পূর্বে সূরা আল মুরসালাতের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করা যায় যে, সূরা আল-কিয়ামাহ থেকে আন-নাযি'আত পর্যন্ত সবক'টি সূরার বিষয়বস্তুর পরস্পরের সাথে একটা মিল আছে এবং এ সবগুলোই মক্কা মুকাররমার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিলো।[১৬২]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– ইহজগতকে যতই ভালোবাসা হোক না কোনো এ জগতকে ছাড়তে হবে। কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবে আসবে। সেদিন কাফিররা আফসোস করবে।

সূরা আন-নাযি'আত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ এর পরে এ সূরাটি নাযিল হয়।[১৬৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– পার্থিব জীবন সামান্য সময়ের জন্য। এ সামান্য দিনের জীবনের বিনিময়ে চিরকালের জন্য নিজেদের ভবিষ্যত ধ্বংস করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সূরা আবাসা : একবার নবী কারিম সা.-এর মজলিসে মক্কা মুকাররমার বড় বড় কয়েকজন লোক বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবি ইবন উম্মে মাকতূম রা. তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এ প্রশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে বাঁধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী কারিম সা. বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এ ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময়কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[১৬৪]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন। কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের এ কর্মনীতির অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

সূরা আত-তাকভির : বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট জানা যায়, এটি মক্কা মুকাররমার প্রথম যুগের নাযিলকৃত সূরারগুলোর অন্তর্ভূক্ত।[১৬৫]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আখিরাত ও রিসালাতের বাস্তব নমুনা জ্ঞাত হওয়া।

সূরা আল-ইনফিতার : এ সূরার ও সূরা আত তাকবীরের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, এ সূরা দু'টো প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে।[১৬৬]

---

১৬১ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৯, পৃ. ১৬-১৭১
১৬২ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৩৯-৪৪০
১৬৩ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩
১৬৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৮-১১৮০
১৬৫ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ২২৬-২৩০
১৬৬ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ৬২-৬৪

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– সব বিচারকের বড় বিচার মহান আল্লাহ তা'আলা।

সূরা আল-মুত্বফফিফীন : এ সূরার বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটা মক্কা মুকাররমায় প্রথম দিকে নাযিল হয়। সে সময় আখিরাত বিশ্বাসকে মক্কাবাসীদের মনে পাকা-পোক্তভাবে বসিয়ে দেয়ার জন্য একের পর এক সূরা নাযিল হচ্ছিল। সূরাটা ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন মক্কার লোকেরা পথে-ঘাটে, বাজারে, মজলিসে-মাহফিলে মুসলিমদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলো এবং তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছিলো। তবে যুলুম-নিপীড়ন ও মারপিট করার যুগ তখনও শুরু হয়নি। কোনো কোনো মুফাসসির এ সূরাকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী কারিম সা. যখন মদিনায় এলেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজন ও পরিমাপে কম দেয়ার রোগ ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো। তখন আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।[১৬৭]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– ওজনে কম-বেশি করার ভয়াবহ পরিণাম।

সূরা আল-ইনশিক্বক্ব : এ সূরাটাও মক্কা মুকাররমার প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলো অন্তর্ভুক্ত।[১৬৮] এ সূরার মধ্যে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার অভ্যন্তরীণ বক্তব্য ও বিষয়াবলি থেকে একথা জানা যায় যে, যখন এ সূরাটা নাযিল হয় তখন জুলুম-নিপীড়নের ধারাবাহিকতা শুরু হয়নি। তবে কুরআনের দা'ওয়াতকে তখন মক্কায় প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। একদিন কিয়ামত হবে এবং সমস্ত মানুষকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে একথা মেনে নিতে লোকেরা অস্বীকার করছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– যারা কুরআনের বাণী শুনে আল্লাহর সামনে নত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অগণিত পুরস্কার ও উত্তম প্রতিদান।

সূরা আল-বুরূজ : এ সূরার বিষয়বস্তু থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ সূরাটা মক্কা মুকাররমার এমন এক সময় নাযিল হয় যখন মুশরিকদের জুলুম-নিপীড়ন তুঙ্গে উঠেছিলো এবং তারা কঠিনতম শাস্তি দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম বিচ্যুত করার চেষ্টা করছিলো।[১৬৯]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কুরআনের প্রতিটি শব্দ লাওহি মাহফুযে এমনভাবে খোদিত আছে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা বদলাতে পারবে না।

সূরা আত-ত্বরিক : বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুকাররমার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কা কাফিররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সা.-এর দা'ওয়াতি কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়েই এ সূরাটা নাযিল হয়।[১৭০]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করার চেষ্টা করা হলেও পরিশেষে কুরআনই বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

---

১৬৭ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৭৮-৪৮০

১৬৮ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯

১৬৯ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯১-১১৯২

১৭০ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১-৫

সূরা আল-আ'লা : সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।[১৭১] ষষ্ঠ আয়াতে 'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।' এ আয়াতটাও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটা এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন রাসূলুল্লাহ সা. ভালোভাবে অহি আয়ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি এবং অহি নাযিলের সময় তার কোনো শব্দ ভুলে যাবেন বলে আশংকা করতেন। এ আয়াতের সাথে যদি সূরা 'ত্বহা'-এর ১১৪ আয়াত ও সূরা 'কিয়ামাহ'-এর ১৬শ-১৯শ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটা সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভঙ্গি ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লিখিত ঘটনাবলিকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায়, সর্বপ্রথম নবী কারিম সা. কে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা কর না, আমি তোমাকে এ বাণী পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পর যখন সূরা কিয়ামাহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহির শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় 'হে নবী! এ অহিকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য নিজের জিহ্বা সঞ্চালন করো না। এগুলোকে মুখস্ত করানো ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন এগুলো পড়া হয়, তখন মনের পর্দায় বাজতে থাকে– 'তারপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।' শেষবার সূরা ত্বহা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী কারিম সা. আবার এর পরপর নাযিল হওয়া ১১৩ টি আয়াতের কোনো অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয়, 'আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহি সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে না যায়।' এরপর আর কখনও এমনটি ঘটেনি। নবী কারিম সা. আর কখনও এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত নেই।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আক্বিদা-বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করবে।

সূরা আল-গশিয়াহ : এ সূরার সমগ্র বিষয়বস্তু এ কথা প্রমাণ করে যে, এটাও প্রথম দিক অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভূক্ত।[১৭২] কিন্তু এটা এমন সময় নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ সা. সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর দা'ওয়াত শুনে তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– দা'ঈর কাজ আল্লাহর পথে আহ্বান করা। কারোর প্রতি বল প্রয়োগ করা নয়। তিনি উপদেশ দিতে থাকবেন। যারা তা মানবে তারা পুরস্কৃত হবে আর যারা মানবে না তা তিরস্কৃত হবে।

সূরা আল-ফাজর : এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটা এমন যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুকাররমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিলো। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ, ফিরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।[১৭৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কিয়ামত সংঘটিত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে, শাস্তি ও পুরস্কার বণ্টিত হবে। এ কথাগুলো উপলব্ধি করার সময় ইহজগতে।

---

১৭১ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ১০১-১০৩

১৭২ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫০৯-৫১০

১৭৩ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩

সূরা আল-বালাদ : এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মক্কা মুকাররমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতই। তবে এর মধ্যে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযিল হয়েছিলো যখন মক্কার কাফিররা নবী সা. এর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিলো এবং তাঁর উপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালান নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিলো।[১৭৪]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– গর্ব ও অহংকারমূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনীমূলক ব্যয়ের পথ পরিহার করে নিজের ধন-সম্পদ ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা কর্তব্য।

সূরা আশ-শামস : বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মুকাররমার প্রথম দিকে নাযিল হয়।[১৭৫] কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছিলো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– মহান আল্লাহ তা'আলা মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিশক্তি দিয়ে পৃথিবীতে একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকি ও গুনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-লাইল : পূর্ববর্তী সূরা আশ-শামসের সাথে এ সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ-শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এ সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে আন্দাস করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাযিল হয়।[১৭৬]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– মানুষকে এ পৃথিবীতে একেবারে অজ্ঞ করে পাঠানো হয়নি। রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ পেশ করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হতভাগার লক্ষণ।

সূরা আদ-দুহা : এ সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মুকাররমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়।[১৭৭] হাদিস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহির অবতরণ বন্ধ ছিলো। এজন্য নবী সা. অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তার মনে এ আশংকা উদয় হচ্ছিল, হয়ত তার এমন ক্রটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহির ধারাবাহিকতা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পিছনে একই কারণ সক্রিয় ছিলো যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহির প্রখর কিরণ যদি একাধারে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায়ু তা বরদাশত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্যে। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে নবী সা. এ অবস্থার মুখোমুখি হন। সে সময় অহি নাযিলের কষ্ট বরদাশত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে উঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক দেবার প্রয়োজন ছিলো। সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর অহি নাযিলের সময় নবী সা. এর স্নায়ুর উপর এর গভীর প্রভাব

১৭৪ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০২-১২০৪
১৭৫ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ৭২-৭৫
১৭৬ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ১৪৭-১৪৯

পড়তো। পরে তাঁর মধ্যে এ মহাভার বহন করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেলে আর দীর্ঘ বিরতি দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– প্রত্যেকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ করা উচিত এবং নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য।

সূরা আলাম নাশরাহ : সূরা আদ-দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়।[১৭৮] হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, মক্কা মুকাররমায় আদ দুহার পরেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– মানুষের সকল সময় এক রকম হয় না। কখনো সচ্ছল, কখনো অসচ্ছল। কখনো অবসর, কখনো ব্যস্ততা। অতএব অবসর পেলেই ইবাদতে মগ্ন হওয়া উচিত।

সূরা আত-তীন : কাতাদাহ এ সূরাকে মাদানি সূরা বলেন। অধিকাংশ আলেম একে মাক্কি গণ্য করেছেন।[১৭৯] এর মাক্কি হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এ যে, এ সূরায় মক্কা শহরের জন্য 'এ নিরাপদ শহরটি' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদিনায় এটি নাযিল হত তাহলে মক্কার জন্য 'এ শহরটি' বলা ঠিক হত না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটাকে মক্কা মুকাররমারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময় কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিলো এমন কোনো চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মাক্কি যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মত একই বর্ণনাভঙ্গি পাওয়া যায়। এ ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– সব বিচারকের বড় বিচারক মহান আল্লাহ তা'আলা বড়ই ন্যায় পরায়ণ।

সূরা আল-আলাক্ব : এ সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি ১ম আয়াত থেকে ৫ম আয়াত পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় অংশটি ৬ষ্ঠ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত। প্রথম অংশটা যে রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহি এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলিম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত পোষণ করেন।[১৮০] এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ, বুখারি, মুসলিদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়িশা রা. থেকে যে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহিহ হাদিস হিসেবে গণ্য। এ হাদিসে হযরত আয়িশা রা. নিজে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে অহি শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও

---

১৭৭ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮

১৭৮ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

১৭৯ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১১-১২১২

১৮০ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১১৭-১১৮

ইবন আব্বাস রা., আবু মূসা আশ'আরি রা. ও সাহাবিগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর সর্বপ্রথম কুরআনের এ আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিলো। আর রাসূলুল্লাহ সা. যখন সর্বপ্রথম হারাম শরিফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জাহল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– মানুষের সৃষ্টি রহস্য। কলম শিক্ষার একটা বড় মাধ্যম। আল্লাহ মানুষকে অজানা বিষয়কে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়া কর্তব্য।

সূরা আল-ক্বদর : এর মাক্কি বা মাদানি হবার ব্যাপারে দ্বিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহরুল মুহিত গ্রন্থে দাবি করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানি সূরা। আলী ইবন আহমাদুল ওয়াহেদি তার তাফসিরে বলেছেন, এটি মদিনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা। অন্যদিকে আল মারওয়ারদি বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মাক্কি সূরা। ইমাম সুয়ুতী ইতকান গন্থে একথাই লিখেছেন। ইবন মারদুইয়া ইবনে আব্বাস রা., ইবন যুবাইর রা. ও হযরত আয়িশা রা. থেকে এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছিলো।[১৮১] সূরা বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর মক্কায় নাযিল হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কুরআন নাযিলের মত মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্তের যথাযথ মূল্যায়ণ করা। কুরআনকে আকড়ে ধরা।

সূরা আল-আদিয়াত : হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা., জাবির রা., হাসান বসরি, ইকরামা ও আতা বলেন, এটা মাক্কি সূরা।[১৮২] হযরত আনাস ইবন মালিক ও কাতাদাহ একে মাদানি সূরা বলেন। অন্যদিকে হযরত ইবন আব্বাস রা. থেকে দুই ধরনের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটা মত হচ্ছে এটা মাক্কি সূরা এবং অন্য বক্তব্যে তিনি একে মাদানি সূরা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরার বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটা কেবল মাক্কি সূরাই নয় বরং মাক্কি যুগেরও প্রথম দিকে নাযিল হয়।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আখিরাতে কেবল মানুষের বাইরের কাজকর্মই নয়, তাদের মনের গোপন কথাগুলোও যাচাই-বাছাই করা হবে, এ সম্পর্কে সতর্কবাণী জানা।

সূরা আল ক্বরি'আহ্ : এ সূরাটা মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। বরং এর বক্তব্য বিষয় থেকে প্রকাশ হয়, এটিও মক্কা মুকাররমার প্রথম দিকে নাযিলকৃত হয়।[১৮৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আখিরাতে মানুষের কাজের হিসাব-নিকাশ করার জন্য যখন আল্লাহর আদালত কায়িম হবে তখন কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চেয়ে ওজনে ভারি হবে এবং কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চেয়ে ওজনে হালকা, এরই ভিত্তিতে সেখানে মীমাংসা করা হবে।

---

১৮১ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ১৮৮-১৯০

১৮২ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১৬-১২১৭

১৮৩ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১৬৪-১৬৭

সূরা আত তাকাছুর : আবু হাইয়ান ও শাওকানি বলেন, সকল তাফসিরকার এ সূরাকে মাক্কি সূরা গণ্য করেছেন।[১৮৪] ইবন জারির, তিরমিজি, ইবন মুনযির প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আলি রা.-এর একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন– 'কবরের আযাব সম্পর্কে আমরা সব সময় সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত 'আলহা-কুমুত তাকাছুর' নাযিল হল।' হযরত আলি রা.-এর এ বক্তব্যকে এ সূরা মাদানি হওয়ার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কারণ হচ্ছে এ যে, কবরের আযাবের আলোচনা মদিনায় শুরু হয়। মক্কায় এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয়নি। কিন্তু এ কথাটি আসলে ঠিক নয়। কুরআনের মাক্কি সূরাগুলোর বিভিন্ন স্থানে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবরের আযাবের কথা বলা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই সেখানে নেই। যেমন সূরা আন'আম ৯৩ আয়াত, আন-নামল ২৮ আয়াত, আল-মু'মিনুন ৯৯-১০০ আয়াত, সূরা মু'মিন ৪৫-৪৬ আয়াত। এগুলো সবই মাক্কি সূরা। তাই হযরত আলি রা.-এর উক্তি থেকে যদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয় তাহলে তা হচ্ছে এ যে, উপরোল্লিখিত মাক্কি সূরাগুলো নাযিলের পূর্বে সূরা আত- তাকাছুর নাযিল হয় এবং এ সূরাটি নাযিল হওয়ার ফলে সাহাবিগণের মধ্যে বিরাজিত কবরের আযাব সম্পর্কিত সংশয় দূর হয়ে যায়। এ কারণে এ হাদিসগুলো সত্ত্বেও মুফাসসিরগণের অধিকাংশই এর মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে একমত; বরং এটা মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আল্লাহ মানুষকে যে নি'আমত দান করেছেন এগুলো শুধু নি'আমত নয় বরং এগুলো তাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু।

সূরা আল-আছর : মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানি বলেছেন। কিন্তু মুফাসসিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মাক্কি সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এ সূরার বিষযবস্তু প্রমাণ করে, এটা মাক্কি যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।[১৮৫] সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হত। এভাবে শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারত না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– মানুষের সাফল্য ও কল্যাণ এবং তার ধ্বংস ও সর্বনাশের মাপকাঠি হলো ঈমান আনা ও না আনা এবং সৎকাজ করা ও না করা।

সূরা আল-হুমাযাহ : এ সূরাটির মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে মুফাসসরিগণ একমত পোষণ করেছেন। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে এটিও রাসূলে নবুওয়াত পাওয়ার পর মক্কায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়।[১৮৬]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– নৈতিক অসৎবৃত্তি সব সময়ই নিন্দনীয়।

সূরা আল-ফিল : এ সূরাটির মাক্কি হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্কা মুকাররমায় ইসলামের প্রথম যুগে এটা নাযিল হয় বলে মনে হবে।[১৮৭]

---

১৮৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১৮৫ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
১৮৬ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০১

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার সামনে পার্থিব সকল শক্তি পরাভূত হয়ে থাকে।

সূরা কুরাইশ : যাহহাক ও কালবি একে মাদানি বললেও মুফাসসিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সূরার শব্দাবলির মধ্যেও এর মাক্কি হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন 'এ ঘরের রব'। এ সূরাটি মদিনায় নাযিল হলে কাবাঘরের জন্য 'এ ঘর' শব্দ দু'টি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল ফীলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সম্ভবত আল-ফিল নাযিল হওয়ার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিলো।[১৮৮] উভয় সূরার মধ্যে এ গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের কারণে প্রথম যুগের কোনো কোনো মনীষী এ দু'টি সূরাকে মূলত একটি সূরা হওয়ার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দু'টি সূরাকে একসাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দু'য়ের মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখা ছিলো না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরও শক্তশালী করেছে। তাছাড়া যরত উমর রা. একবার কোনো ভেদ চিহ্ন ছাড়াই এ সূরা দু'টি একাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রা. বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মাজিদের যে অনুলিপি তৈরী করে ইসলামি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে উভয় সূরার মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' লেখা ছিলো। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মাজিদ এ দু'টি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এছাড়াও এ সূরা দু'টির বর্ণনা ভঙ্গি পরস্পর থেকে এত বেশি বিভিন্ন যে, এ দু'টির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হওয়ার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– কা'বাঘর দেবমূর্তির মন্দির নয়; বরং এটা আল্লাহর ঘর যা তাঁর ইবাদতের জন্য নির্মিত।

সূরা আল মা'উন : ইবন মারদুইয়া ইবন আব্বাস রা. ও ইবন যুবাইরের রা. উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তাঁরা এ সূরাটিকে মাক্কি যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবিরও একই উক্তি করেছেন।[১৮৯]

এ সূরার মূল শিক্ষা হচ্ছে– যাদের মনে আখিরাত ও তার শাস্তি-পুরস্কার এবং পাপ-পূণ্যের কোনো ধারণা নেই, তাদের বাস্তব অবস্থা জানা যায় এ সূরা থেকে।

সূরা আল কাউছার : ইবন মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রা. ও হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটা মাক্কি সূরা। কালবী ও মুকাতিল একে মাক্কি বলেন।[১৯০] অধিকাংশ তাফসিরকারও এ মত পোষণ করেন।

---

১৮৭ আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২১

১৮৮ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ২০০-২০৪

১৮৯ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ২৪১-২৪৩

১৯০ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫৭৪

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– আল্লাহর পথের দা'ওয়াতদাতাগণ কখনো নির্বংশ হবেন না; বরং তার বিরোধীদেরই শিকড় কাটা যাবে।

সূরা আল কাফিরূন : হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, হযরত হাসান বসরি ও ইকরামা বলেন, এটি মাক্কি সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রা. বলেন, মাদানি। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা একে মাক্কি ও মাদানি উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এটি মাক্কি সূরা।[১৯১] তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মাক্কি হওয়ার কথা প্রমাণ করে।

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– কুফরি ও কাফিরদের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি ঈমানের চিরন্তন দাবি ও চাহিদা।

সূরা আল-লাহাব : এর মাক্কি হওয়ার ব্যাপারে তাফসিরকারদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু মাক্কি যুগের কোন্ সময়ে এটা নাযিল হয়েছিলো তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর ইসলামি দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে প্রবল ধারণা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়েছিলো যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে শত্রুতার সীমা পেরিয়ে গিয়েছিলো এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাঁধার সৃষ্টি করেছিলো। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর বংশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শিয়াবে আবু তালিবে অন্তরীণ করেছিলো এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বংশের লোকদের পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে অবস্থান করছিলো, আবু লাহাব ছিলো রাসূলুল্লাহ সা. এর চাচা আর ভাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারত না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলুম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হত তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিপূর্ণ মনে করত। কারণ ভাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা শোভা পায় না।[১৯২]

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– ঈমান আনলে পরও আপন হয়ে যায় এবং ইসলামের বিরোধিতা ও কুফরি করলে আপনও পর হয়ে যায়।

সূরা আল-ইখলাছ : এ সূরাটা আসলে মাক্কি। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মক্কায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে কুরআনের কোনো বিস্তারিত আয়াত তখন পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনও লোকেরা রাসূলুল্লাহ সা. এর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের বার্তা শুনতে যেতে চাইত, তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত-বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহ্বান জানান হচ্ছে, মক্কায় হযরত বিলালকে রা. তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের উপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিত তখন তিনি 'আহাদ', 'আহাদ' বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিলো।[১৯৩]

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা।

---

১৯১ উলামা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩

১৯২ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ২৩৪-২৩৬

১৯৩ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ২৬৫-২৬৬

মু'আওবিযাতাইন (সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা-আন নাস) : হযরত হাসান বসরি, ইকরাম, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি মাক্কি।[১৯৪] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কোনো সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, অমুক সময় সেটি নাযিল হয়েছিলো। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এ হয় না যে, সেটা প্রথমবার ঐ সময় নাযিল হয়েছিলো। বরং অনেক সময়. এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছিলো, তারপর কোনো বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী কারিম সা.-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিলো। তাফসিরকারদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমেরই। এদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, প্রথমে মক্কায় এমন এক সময় সূরা দু'টো নাযিল হয়ছিলো যখন সেখানে নবী কারিম সা.-এর বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীকালে যখন মদিনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইয়াহুদি ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দু'টো পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। উপরে উল্লিখিত হযরত উকবা ইবনে আমের রা.-এর রিওয়ায়াতে একই কথা বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হুকুমে হযরত জিবরাঈল আ. এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টো সূরা পড়ার হুকুম দিলেন। তাই তাফসিরকারদের মতে এ সূরা দু'টোকে মাক্কি গণ্য করেন তাদের বর্ণনাই বেশি নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে, এ ছাড়া আল-ফালাকের বাকি সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবক'টি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দু'টোকে সম্পর্কিত করার পথে এটাও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

এ সূরার মূল শিক্ষা হলো– সকল অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাওয়ার ধারণা।

পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মানবজাতির জন্য সর্বশেষ হিদায়াতের বাণী বাহক ঐশীগ্রন্থ। এ গ্রন্থে ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রসিদ্ধতম মতে ৮৬টি মাক্কি সূরা রয়েছে। প্রত্যেকটি সূরার রয়েছে নির্দিষ্ট নাযিলের প্রেক্ষাপট। প্রায় সূরার নাযিলের প্রেক্ষাপট হাদিস ও তাফসির গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তবে সূরাগুলোর নাযিলের প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট সূরার অর্থের মধ্যেও নিহিত রয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করলে আল-কুরআনের একটা সূরার মর্ম ও শিক্ষা উপলব্ধি করার মাধ্যমে অন্য সূরার প্রেক্ষাপট জানা সহজ হয়।

---

১৯৪ ইবরাহিম মুহাম্মদ আল-জারামি, *মু'জামু 'উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫, ২৮৩

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আল-কুরআনের ভাষ্য মতে মহান আল্লাহ তা'আলা এ সৃষ্টি জগতকে এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, বরং এর পিছনে রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য। আর তা হলো, একমাত্র তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করা। অতঃপর সে উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি জগতের মাঝেই এক নিপুণ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন জ্বিন ও মানব জাতিকে। আর তাদেরকে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর ইবাদত করে, আর কে তা অস্বীকার করে। কে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর দেয়া শারি'আত মেনে চলে, আর কে তা মেনে চলে না। যে তাঁর আদেশ মেনে চলবে, সে পুরস্কৃত হবে, আর যে তা অমান্য করবে, সে পাবে কঠিন শাস্তি। তবে তিনি মানব জাতিকে শুধু সৃজন করেই ছেড়ে দেননি। বরং ভালো-মন্দ বুঝার জন্য তাদের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল ও পথ-প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। যেন মানুষ এ অভিযোগ না করে বসে যে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি বা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয়নি। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–[১]

"رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ".

আর আল্লাহপাকের সেই ইচ্ছা ও ন্যায় ভিত্তিক হিদায়াত প্রক্রিয়ায় তাঁর হিদায়াতের বাণী নিয়ে তথা একই দা'ওয়াত নিয়ে দা'ওয়াতি কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা করেছেন হযরত আদম, নূহ, ইবরাহিম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, সুলাইমান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা আ. ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। তাদের দা'ওয়াতের মূল কথা ছিলো– 'আল্লাহকে একমাত্র রব, ইলাহ হিসেবে মেনে নাও। আল্লাহর আনুগত্যকারী তথা প্রকৃত মুসলিম হয়ে যাও। আর সে অনুসারেই তোমাদের জীবন পরিচালিত কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এভাবে পরকালে সফলতা লাভ করো।'

যুগে যুগে প্রত্যেক নবীর অনুসারীগণ ঐ একই রব্বানি দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যে দা'ওয়াত চিরন্তন ও শাশ্বত। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারীগণ আজও সেই একই দা'ওয়াতের পথে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের সেই পথে দিশা দিচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলো ও সেই মহানবী সা. কর্তৃক গৃহীত প্রয়োগনীতি বা উসওয়ায়ে হাসানাহ। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আল-কুরআনে মহানবী সা.-কে ঘোষণা দিতে ইরশাদ করা হয়েছে–[২]

"وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِه وَمَنْۢ بَلَغَ".

ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পরিচয় লাভ করার পূর্বে সাধারণভাবে দা'ওয়াহ্-এর পরিচয় জেনে নেয়া দরকার। তাহলে ইসলামি দা'ওয়াহ জানা সহজ হবে।

---

১ 'সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।' দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ১৬৫

২ 'আর এ কুরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যেন তা দ্বারা তোমাদেরকে এবং এ কুরআন যার কাছে পৌছাবে তাদেরকেও সতর্ক করতে পারি।' দ্র. আল-কুরআন, ৬ : ১৯

দা'ওয়াহ্-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : আরবি দা'ওয়াহ্ (دعوة) শব্দটি বাবে নাসারা-ইয়ানসুরু এর মাসদার। دعوة শব্দটি একবচন, বহুবচনে دعوات হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৩] শব্দটি আভিধানিক অর্থ– আহ্বান, আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ, আবেদন, দাবি, প্রচার, অনুরোধ, দু'আ, ডাকা, প্রার্থনা, সাহায্য কামনা, মুকাদ্দমা ইত্যাদি।[৪] দা'ওয়াতের আর একটা অর্থ কাউকে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–[৫]

"قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ".

কিন্তু পারিভাষিক অর্থে শুধু আহ্বান জানানোকে দা'ওয়াহ বলা হয় না। বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে আহ্বানে ব্যক্তি বা জনসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দা'ওয়াহ। আরেকটু সাজিয়ে বললে এভাবে বলতে হয় :

'যে আহ্বানে ব্যক্তি বা জনসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প সঞ্জাত উপায়ে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার ব্যবস্থা করে দেয়ার পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দা'ওয়াহ।[৬]

এখানে স্মরণযোগ্য যে, আধুনিক অভিধানগুলোতে ধর্মীয় বা কোনো ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণা অর্থে দা'ওয়াহ শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়। যেমন দা'ওয়াহ শব্দের অর্থে বলা হয়েছে– Missionary work, Missionary activity, propaganda.[৭]

এজন্য দা'ওয়াহ যে কোনো পথ, মত কিংবা যে কোনো বিষয়ের প্রতি হতে পারে। যে কোনো বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আর সে বিষয় ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে; কিংবা কল্যাণকর হতে পারে অথবা ক্ষতিকরও হতে পারে।

কুরআন মাজিদেও দা'ওয়াত শব্দটার এ ধরনের ব্যবহার লক্ষণীয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–[৮] "وَيٰقَوْمِ مَا لِيْ أَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ إِلَى النَّارِ".

---

৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৩শ সং., সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ৪৭০

৪ আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(কুয়েত : ইসলামি, ওয়াকফ, দা'ওয়াহ্ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, কুয়েত, বিশেষ প্রকাশনা, ১৪৩১ হি., ২০১০ খ্রি.), খ.১৪, পৃ. ২৫৮; মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), খ.২, ১৩০০; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০

৫ 'তিনি (হযরত ইউসুফ আ.) বললেন, হে আমার প্রভু! এ নারীরা আমাকে যেদিকে প্ররোচনা দিচ্ছে তার তুলনায় জেলখানাই আমার কাছে অধিক প্রিয়।' দ্র. আল-কুরআন, ১২ : ৩৩

৬ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ পরিধি*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা বিভাগ, ৩৯তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ১১৯

৭ Hanswehr, ed. J.M. Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*(Newyork : Spoken Language Services Inc., 4th edition, 1976), p. 283

৮ 'হে আমার সম্প্রদায়! কি ব্যাপার, আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির পথে আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে?' দ্র. আল-কুরআন, ৪০ : ৪১

ইসলামি দা'ওয়াহ-এর সংজ্ঞা

শাব্দিক বিশ্লেষণের আলোকে আরো উল্লেখ্য যে, ব্যাপকার্থে দা'ওয়াহ-এর পরিচয় এর উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে দা'ওয়াহ ভালো হবে। আর মন্দ হলে মন্দ দা'ওয়াহ। তেমনি খ্রিস্টান ধর্মের দা'ওয়াহ হলে খ্রিস্টীয় দা'ওয়াহ, সমাজতন্ত্রের দিকে দা'ওয়াহ হলে সমাজতন্ত্রী দা'ওয়াহ। যা প্রচার মাধ্যম, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করে সম্পাদন করে আসছে। বস্তুত বিশ্বে মানব সমাজে বিভিন্ন ধরনের দা'ওয়াত প্রচলিত রয়েছে। কোনোটা সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয়ে নিয়োজিত। যথা খিস্টবাদ, হিন্দুবাদ ইত্যাদি। কোনোটা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে উদ্ভাবিত। যথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্রয়েডবাদ ইত্যাদি। আবার কোনোটা বস্তুর সঙ্গে মানুষের এবং বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত। যেমন আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার আহ্বান। কিন্তু উপরোক্ত সকল সম্পর্ক তথা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক ইত্যাদি যথাযথ মূল্যায়ন, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করে যে দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত, সেটাই ইসলামি দা'ওয়াহ। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় করে তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য অর্জনে এ সৃষ্টিজগত বা প্রকৃতি আবাদ করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানব সমাজকে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার জন্যে যে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা-ই ইসলামি দা'ওয়াহ।

অতএব সংক্ষেপে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দিকে দা'ওয়াত হলে তাকে বলা হয় ইসলামি দা'ওয়াহ। এখানে ইসলামি দা'ওয়াতের সংজ্ঞা প্রদানেও মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্নভাবে পরিভাষা উপস্থাপন করেছেন। কারো সতে ইহা ওয়ায-নসিহত, কারো মতে শুধু তাবলিগ ও মেহনত, কারো মতে, আন্দোলন বা ইক্বামতে দীন। কারো মতে, আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী 'আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। কিন্তু প্রসঙ্গত বলতে গেলে বলা যায় যে, ইসলামি দা'ওয়াহ বিষয়টির ধারণা আরো ব্যাপক। ওয়ায-নসিহত কিংবা তাবলিগ বা প্রচার-প্রচারণা, নতুবা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদির নামে ঐ দা'ওয়াতকে সীমিত করা যথাযথ নয়। যদিও এ সব ক'টি কাজ ইসলামি দা'ওয়াতেরই আওতাভুক্ত। দা'ওয়াহ বিষয়ে যারা লেখালেখি করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা রয়েছে। যাতে ইসলামি দ'ওয়াহর ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ গালূশ ইসলামি দা'ওয়াতের সংজ্ঞায় স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন এভাবে,[৭]

"الدعوة إلى الإسلام تعنى المُحاولة العملية أو القولية لإمالة الناس إليه."

বাচনিক যথা– আলাপ-আলোচনা, ওয়ায-নসিহত, কথোপকথন, বক্তৃতা, দারস। আর কার্যগত যথা– দা'ঈ কর্তৃক চারিত্রিক তথা আচরণগত নমুনা উপস্থাপন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর

৭ 'মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার অপর নাম ইসলামি দা'ওয়াহ।' দ্র. ড. আহমদ আহমদ গালুশ, *উসুলুদ দা'ওয়াতুল ইসলামিয়া*(কায়রো : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০৪), পৃ. ২৩

আনুগত্য চর্চা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সমাজসেবা, সংগঠন, জিহাদ, লেখালেখি ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্যকে পৌঁছানো বা অনুপ্রাণিত করানো হলো দা'ওয়াহ।

ড. হুসাইন আল-আসসাল বলেন,[১০]

'মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল কল্যাণময় বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সকল কর্ম তৎপরতার নাম ইসলামি দা'ওয়াহ।'

ড. রউফ সা'লাবি এতে আরো ব্যাপক ধারণা সংযোজন করে উপস্থাপন করেছেন। তার মতে–

'দা'ওয়াহ হলো, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যার দ্বারা মানব সমাজকে কুফরি অবস্থা হতে ঈমানি অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়।'[১১]

এর মর্ম হলো, এ রূপান্তরিত অবস্থায় অধিবাসীগণ তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস পরিবর্তন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাত তথা গোটা ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করবে। সমগ্র সমাজটি অন্ধকার হতে আলোতে রূপান্তরিত হবে। মানুষ খুঁজে পাবে তাদের জীবন চলার সঠিক পথ। সাথে সাথে বৈষয়িক একক বস্তুবাদিতা করে উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করবে, সাফল্য অর্জন করবে।

ড. সা'লাবি অপর স্থানে সে আন্দোলনের দু'টো দিক নির্দেশ করেছেন : (১) এর মাধ্যমে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা (২) বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করা।

তার উক্তি দু'টো সাধারণ দা'ওয়াহকে কেন্দ্র করে নয়; বরং ইসলামি দা'ওয়াহকে কেন্দ্র করে। আন্দোলন অর্থে দা'ওয়াহ শব্দটির পারিভাষিক দিক দিয়ে একটা ব্যাপকতর ধারণা চলে এসেছে। কারণ সমাজ পরিবর্তনে মানব জীবনের অবস্থা ও কার্যাদিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বস্তুত যে কোনো দা'ওয়াতি কার্যক্রমে চারটি উপাদান থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সেগুলো হলো–

১. দা'ঈ বা দা'ওয়াত দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক উদ্যোগ, যিনি বা যাদের মাধ্যমে, দা'ওয়াতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
২. বিষয়বস্তু বা যে দিকে দা'ওয়াত দেয়া হবে।
৩. পদ্ধতি ও কৌশল বা যে পন্থায় দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে পরিকল্পনা, উপস্থাপন কৌশলাদি ও যথাযথ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

---

১০ "الدعوة هى البصائر بحث الناس على خير ونهيهم عن كل شر وفقا لِما جاء به الإسلام تحقيقا لِمنفعتهم فى عاجلهم وآجلهم." দ্র. ড. খলীফা হুসাইন আল-'আসসাল, *মা'আলিমুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফি আহদিহাল মাক্কি*(কায়রো : দারুত তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়া, ১৯৮৮), পৃ. ১৯

১১ "الدعوة هى حركة نقل الْمجتمع الإنسانى من حالة الكفر إلى حالة الإيمان، ومن حالة الظلمة إلى حالة النور ومن حالة الضيق إلى حالة السعة فى الدنيا والآخرة." দ্র. ড. রউফ সা'লাবি, *সাইকোলোজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ*(কুয়েত : দারুল কলম, ১৯৮২), পৃ. ৪৯

৪. মাদ‘উ তথা যাকে বা যাদেরকে দা‘ওয়াত দেয়া হবে।

উক্ত উপাদানগুলোর যে কোনো একটি বাদ দেয়া হলে, দা‘ওয়াতি কার্যক্রম সংগঠিত হবে না। যদিও কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি বিষয়বস্তু লক্ষ্য করে কারো দা‘ওয়াত ছাড়াই সেটা মেনে নিতে পারে। সরাসরি কোনো দা‘ঈ নাও থাকতে পারে, কোনো পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে সেই ব্যক্তিটি যার মাধ্যমে বা উপলক্ষে সে বিষয়বস্তু অবগত হলো, সেটাই দা‘ঈর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অন্য দিকে স্বয়ং বিষয়বস্তুকে দা‘ঈ বলা যেতে পারে। যেমন ইসলাম। এর অনেক শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়েও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এভাবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থাগত দিক বিবেচনা করলে উপরোক্ত চারটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে। সুতরাং যে সংজ্ঞায় উপরোক্ত উপাদানগুলোর সমাহার ঘটবে, তাকেই একটি গ্রহণযোগ্য, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য সংজ্ঞা বলা যাবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ড. আহমদ গালূশ দা‘ওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও তার মাধ্যমের উপর জোর দিয়েছেন। এ সংজ্ঞায় দা‘ঈ ও মাদ‘উর কথা উচ্চারিত হয়নি।

এমনিভাবে ড. ‘আসসাল স্বীয় সংজ্ঞায় দা‘ঈ, দা‘ওয়াতের বিষয়বস্তু, মাদ‘উর বা মানব সমাজ এবং কল্যাণ-অকল্যাণ তথা ফলাফলের উপর জোর দিয়েছেন। আর পদ্ধতির আলোচনায় শুধু উৎসাহিত করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এতে পদ্ধতির ধরন সীমিত ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়।

এমনিভাবে শাইখ বাহী খাওলী উম্মাহ বলে অস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। কারণ সেটা কি মুসলিম উম্মাহ না উম্মাতে মুহাম্মদী তথা গোটা মানব সমাজ, তা স্পষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, শাইখ বাহী খাওলীর তুলনায় ড. সা‘লাবি দা‘ওয়াহকে আরো স্পষ্টভাবে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের কথা বললেও উভয়ের সংজ্ঞায় মাদ‘উ, দা‘ওয়াতের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর জোর দেয়া হয়। অর্থাৎ দা‘ওয়াত দিলে সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে। তাই এটা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলন কার মাধ্যমে এবং কি পদ্ধতিতে, তা ফুটে উঠেনি। যদিও ড. সা‘লাবির বক্তব্যে কাজের ধরনের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়। আর তা হলো প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিরুদ্ধ বাদীদের মুকাবিলা করা।

তাই ইসলামি দা‘ওয়াতের একটি মোটামুটি সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারে–

‘যে দা‘ওয়াহ কার্যক্রমে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প সঞ্জাত উপায়ে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দিকে মানব সমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে দেয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামি শারি‘আহ সম্মত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই ইসলামি দা‘ওয়াহ।’

এ সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত চারটি উপাদানসহ ইসলামি দা‘ওয়াতের মূলনীতির প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ এ সংজ্ঞায়–

প্রথমত: সুঅভিজ্ঞ দা‘ঈ বলে দা‘ওয়াতি কাজে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে দা‘ওয়াতি কাজ করাই ইসলামের দা‘ওয়াতি মূলনীতি। কারণ আল-কুরআনে এসেছে–[১২]

---

১২ ‘বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপর আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেই। আর আমার যারা অনুসরণ করে, তারাও তাই।’ দ্র. আল-কুরআন, ১২ : ১০৮

"قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ".

দ্বিতীয়ত: দা'ওয়াহ কার্যক্রম হতে হবে হিকমত তথা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে। যেখানে আল্লাহপাক নির্দেশ করেছেন–[১৩]

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

তাই অজ্ঞতা, মুর্খতা বা আহমকি প্রদর্শনমূলক পন্থায় দা'ওয়াত দেয়া যাবে না।

তৃতীয়ত: অনেকের সংজ্ঞায় পদ্ধতির আলোচনায় শুধু প্রচারের কাজের কথা উল্লেখ করা হয়। হ্যাঁ, প্রচার করা দা'ওয়াতের প্রথম পর্যায়। কিন্তু এর সাথে যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করলো তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার চর্চা ও অন্যদের দা'ওয়াত দেয়ার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বিরোধীদের প্রতিরোধের মাধ্যমে। তাই এ সংজ্ঞায় সবক'টি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত: ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামি মূল্যবোধ ও শারি'আহ সম্মত হতে হবে। যেমন– ধোঁকাবাজি, বেহায়াপনা, যুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি কৌশলনির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করা ইসলামি শারি'আতে নিষিদ্ধ। তা ইসলামি দা'ওয়াহ কার্যক্রমে প্রয়োগ করা যাবে না।

ইসলামি দা'ওয়াতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামি দা'ওয়াহ সারা জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্থান, কাল-পাত্র ভেদে সমগ্র মানব জাতির জন্য উন্মুক্ত দা'ওয়াহ। যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বীয় করুণায় হিদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াহ নিয়ে এসে সেই আল্লাহর দিকেই মানব জাতিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া হিদায়াতকে তাদের জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করার দা'ওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং এক দিকে যেমনি এ দা'ওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে, তেমনি এ দা'ওয়াহ তাঁরই দিকে। তাই হযরত আদম, নূহ, ইবরাহিম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, সুলাইমান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা আ. ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. সকলেই একই দা'ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মেনে নিয়ে তাঁর দেয়া জীবন বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে হবে। এটাই ইসলামি দা'ওয়াতের মূল কথা। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–[১৪]

"وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ".

সুতরাং ইসলামি দা'ওয়াহ মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন, চিরন্তন ও শাশ্বত। আর তা কেনোই বা হবে না। এটা স্বভাবজাত দা'ওয়াহ। তথা মানব স্বভাব সুলভ নিয়মনীতি বা সুন্নাহ পালনের দা'ওয়াহ। সেই ফিতরাত, যে সত্যকে সত্য হিসেবে শ্রদ্ধা করে এবং মেনে নিতে মানব সমাজে সদা তাড়না দেয়। সত্য চেতনা বা মানব স্বভাব ও ফিতরাত যতদিন মানুষ থাকবে, ততোদিন তার কার্যকারিতা বহমান থাকবে। এ জন্য আল-কুরআনে বলা হয়েছে–[১৫]

---

১৩ 'আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে'। দ্র. আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫

১৪ 'প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। সকলকে এ আদেশ দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করো এবং তাগুত শয়তানি শক্তির আনুগত্য হতে দূরে থাকো।' দ্র. আল-কুরআন, ২৭ : ৩৬

১৫ 'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত করো, যে দ্বীন হলো আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে কোনো পরিবর্তন নেই।' দ্র. আল-কুরআন, ৩০ : ৩০

"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاؕ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ".

এ ফিতরাতি তাওহিদের দা'ওয়াত নিয়ে যুগে যুগে যতো নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন, তাদের মাঝে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সা.। যার উপর আল্লাহর কালাম আল-কুরআন নাযিল হয়। এ পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনে সেই মহানবীকে দা'ঈ, মানব কল্যাণের শুভ সংবাদদাতা এবং মন্দ কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তাকে অভিহিত করা হয় সারা বিশ্বজগতের রহমত স্বরূপ তথা মুক্তির বাণীবাহক হিসেবে। তাঁর এ মুক্তির ডাক বা আহ্বান কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তিনি শেষনবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তার উম্মতও শেষ উম্মত, তারপর আর কোনো উম্মত পৃথিবীতে আসবে না। তাই রাসূলের দা'ওয়াতি কাজের ব্যবস্থাপনা করবে তাঁর উম্মত সকল মানুষের কাছে; জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে কিয়ামত পর্যন্ত। আর এতে তাদেরও মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–[১৬]

"وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ".

তাই ইসলামের সামান্য বিষয় হলেও, তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়া, জানানো সকলের উপর অবশ্য কর্তব্য। এ জন্য মহানবী সা. বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে বলেছিলেন :[১৭] "بلغوا عنى ولو آيةً".

ইসলামি দা'ওয়াহ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীতে স্থিতি দান করেন। তিনি তাদেরকে অসহায় ও লাগামহীন ছেড়ে দেননি। (মু'মিনুন : ২৩ : ১১৫) বরং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.-কে তাঁর বংশধরদের হিদায়াতের জন্য প্রথম নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। (২ : ৩৮-৩৯) এভাবে হযরত আদম আ. থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূলসহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরিত হন। (মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ৫৭৩৭) বহু নবীর নিকটে আল্লাহ তা'আলা সহিফা বা পুস্তিকা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক রাসূলকে দেন পৃথক পৃথক শারি'আত বা জীবন বিধান। তবে চার জন শ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকটে আল্লাহ তা'আলা প্রধান চারখানা কিতাব প্রদান করেন মানবতার হিদায়াতের জন্য। যথাক্রমে মূসা আ.-এর উপর তাওরাত, দাউদ আ.-এর উপর যাবুর, ইসা আ.-এর উপর ইনজিল এবং শেষনবী মুহাম্মাদ সা.-এর উপর কুরআন। প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন বনি ইসরাঈলের নবী এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত তিনখানা কিতাব নাযিল হয়েছিলো একত্রিত আকারে। কিন্তু শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বনবী হিসেবে বনি ইসমাঈলে এবং শেষ কিতাব কুরআন নাযিল হয়েছিলো বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপর দীর্ঘ ২৩ বছরের বিস্তৃত সময় ধরে মানুষের বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে খণ্ডাকারে। শেষনবী মুহাম্মদ

---

১৬ 'তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। সৎকাজের আদেশ দিবে, আর অসৎকাজের নিষেধ করবে। আর এরাই মুলত সফলকাম।' দ্র. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

১৭ 'একটি আয়াত হলেও, তা আমার পক্ষ থেকে (অন্যের নিকট) পৌঁছে দাও।' দ্র. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি' আত-তিরমিযি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৩২, হাদিস নং ২৬৬৯

সা.-এর আগমন ও শেষ কিতাব কুরআন নাযিলের পর বিগত সকল নবুওয়াত ও সকল কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন বিশ্বমানতার পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসেবে কেবলমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ সা. আনীত সর্বশেষ কিতাব কুরআনই বাকি রয়েছে। নিঃসন্দেহে রাসূলের সহিহ হাদিসসমূহও আল্লাহর অহি এবং কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা।

হাদিসে বর্ণিত বিরাট সংখ্যক নবীগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম এসেছে। তন্মধ্যে একত্রে ১৭ জন নবীর নাম এসেছে সূরা আন‘আম ৮৩ থেকে ৮৬ আয়াতে। বাকি নামসমূহ এসেছে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে। কেবলমাত্র ইউসুফ আ.-এর কাহিনী সূরা ইউসুফে একত্রে বর্ণিত হয়েছে। বাকি নবীগণের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভন্নি প্রসঙ্গে এসেছে। যেমন– মুসা ও ফিরআউনের ঘটনা কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতির মাঝে তাঁর দ্বীনের দা‘ওয়াত প্রচারের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তাদের সংখ্যা অনেক। তবে তাদের মধ্যে ২৫ জন নবী ও রাসূলের কথা কুরআন মাজিদ থেকে জানা যায়।[১৮] নিচে তাদের নাম, কত বছর পূর্বে, দা‘ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার এলাকা, জীবনকাল এবং কুরআন মাজিদে কতবার উল্লেখ হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	নাম	কত বছর পূর্বে	দা‘ওয়াতি এলাকা	জীবনকাল	উল্লিখিত সংখ্যা
০১	হযরত আদম আ.	১১৪০০	আরব, ইরাক, ফিলিস্তিন	৯৬০	২৫
০২	হযরত নুহ আ.	৮৭০০	সমগ্র ইরাক, আরব	৯৫০	৪৩
০৩	হযরত ইদরিস আ.	৯৬০০	সমগ্র ইরাক, আরব	৩০০	৩
০৪	হযরত হুদ আ.	৭০০০	সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব আরব	২০০	৭
০৫	হযরত সালিহ আ.	৬৫০০	উত্তর আরব, সিরিয়া	১৯০	৯
০৬	হযরত ইবরাহিম আ.	৫৭০০	ইরাক, ফিলিস্তিন, আরব, মিশর	২৭০	৬৯
০৭	হযরত লুত আ.	৫৬৮০	জর্দান	১৫০	২৭
০৮	হযরত ইসমাঈল আ.	৫৬১০	মক্কা, আরব	১৪০	১২
০৯	হযরত ইসহাক আ.	৫৫৯০	ফিলিস্তিন, সিরিয়া	১৬০	১৭
১০	হযরত ইয়াকুব আ.	৫৫১০	ফিলিস্তিন, মিশর	১৬০	১৬
১১	হযরত ইউসুফ আ.	৫৪৫০	মিশর	১২০	২৭
১২	হযরত আইয়ুব আ.	৪০০০	ফিলিস্তিন, সিরিয়া	১০৫	৪
১৩	হযরত শু‘আইব আ.	৪৬০০	পশ্চিম আরব, জর্দান	১৫৫	১১
১৪	হযরত মুসা আ.	৪৫৫০	মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন	১১০	১৩৬
১৫	হযরত হারুন আ.	৪৫৫৩	মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন	১১৩	২০
১৬	হযরত ইউনুস আ.	৩৮১০	মিনওয়া, ইরাক	১২০	৬
১৭	হযরত দাউদ আ.	৩৬০০	ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক	১১৫	১৬

১৮ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*(দামিশক : দারু ইবন কাসির, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৮ হি.), পৃ. ১৯২-২১০, ২১৫-২২৭, ২৩২-২৬৪, ২৬৭, ২৮৯-৩০৭, ৩৯৩-৪০০

১৮	হযরত সুলাইমান আ.	৩৫৬০	ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক	৬৯	১৭
১৯	হযরত ইলয়াস আ.	৩১০০	জর্দান, ফিলিস্তিন	১০০	৩
২০	হযরত আল-ইয়াসা' আ.	২৯০০	ফিলিস্তিন	১১০	২
২১	হযরত যুল-কিফল আ.	২৫৮০	সিরিয়া, ফিলিস্তিন	৯০	২
২২	হযরত যাকারিয়া আ.	২১২৫	ফিলিস্তিন	১৬০	৭
২৩	হযরত ইয়াহয়া আ.	২০২৫	ফিলিস্তিন	৬০	৫
২৪	হযরত ঈসা আ.	২০২০	ফিলিস্তিন	৩৮ (চলমান)	২৫
২৫	হযরত মুহাম্মদ সা.	১৪৪০	সমগ্র পৃথিবী	৬৩	৪

দা'ওয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারণা নেয়ার জন্য প্রথমেই নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতি মিশন এবং পরবর্তীতে সাহাবি, তাবি'ঈ ও অন্যান্য দা'ঈগণের দা'ওয়াতি কার্যক্রম কেমন ছিলো তা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। অতএব নিচে বিভিন্ন দা'ওয়াতি কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

নবীগণের দা'ওয়াতি কার্যক্রম

১. হযরত আদম আ.-এর দা'ওয়াত : প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম আ.-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহর খিলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত। সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।[১৯] আর সে কারণেই জিন-ফেরেশতা সকলকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সকলেই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু ইবলিস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায়। এখান থেকেই শুরু হয় দু'টি ধারার– একটি আদম আ.-এর ধারা যারা আল্লাহর অনুগত ও অপরটি ইবলিসের ধারা যারা আল্লাহ বিরোধী। আদম আ.-এর লক্ষ্য হলো ইবলিসের প্ররোচনায় যে মানুষ আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে তাকে আল্লাহর সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করে দিবেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর সাথে কৃত রূহের জগতে তার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। আল্লাহকে একমাত্র রব মেনে নিয়ে পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে বসবাস করার দা'ওয়াত দিতেন। পার্থিব জীবনকে সুখময় করার জন্য ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত কাজকর্ম শিক্ষা দিতেন অহির মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে। যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ি সর্বপ্রথম আদম আ. আবিষ্কার করেন। আদম আ.-এর দা'ওয়াতের মূল বিষয় ছিলো তাওহিদ, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নামের বর্ণনা এবং সমাজে যুলুমের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। এভাবে তিনি পৃথিবীতে ৯৬০ বছর দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[২০]

২. হযরত নূহ আ.-এর দা'ওয়াত : আদম আ. থেকে নূহ আ. পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিলো। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ আ.-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা ও প্রথম রাসূল বলে খ্যাত নূহ আ. সাড়ে নয়শত বছরের

১৯ আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

২০ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-২১০

বেশি দীর্ঘ বয়স লাভ করেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে আল্লাহর পথে আনার জন্য দা'ওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত তাঁর জাতি তাকে প্রত্যাখ্যন করে। ফলে আল্লাহর তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[২১] তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আমি নূহকে তার জাতির কাছে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক শাস্তি নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করা জন্য।' অতঃপর নূহ আ. তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে ফিরিয়ে আনার জন্য দা'ওয়াত দিতেন। তিনি স্বীয় জাতিকে দিন-রাত প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বিভিন্ন পন্থায় ও পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দিতেন। তিনি বান্দার উপর আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নি'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।[২২] তিনি প্রচলিত দেব-দেবী ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক, নাসর-কে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপিত হয়। যেমন– নবী হবে একজন ফেরেশতা। নূহের অনুসারীরা তাদের মধ্যে হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন। জাতির উপর নূহের কোনো প্রাধান্য নেই।[২৩] নূহের দা'ওয়াত তাদের বাপ-দাদার রীতি বিরোধী। নূহ নেতৃত্বের অভিলাষী।[২৪] তারা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করতো।[২৫] গোত্রের নেতাদের উপরোক্ত আপত্তি ও অপবাদসমূহের জবাবে নূহ আ. বলেন :

'হে আমার জাতি! আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলিলের উপরে থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে রহমত দান করেন, আর সেসব থেকে যদি তোমাদের চক্ষু অন্ধ থাকে, তাহলে কি আমি তা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি।'[২৬]

এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নবুওয়াত ও রিসালাত চেয়ে পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি মানুষের জন্য কোনো ফেরেশতা নয়, বরং তাঁর মনোনীত কোনো মানুষকেই নবী করে পাঠিয়ে থাকেন স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ সহকারে।

আল্লাহ তা'আলা নূহ আ. এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে এ আশায় দা'ওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্ত দা'ওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। মূলতঃ এ সময় নূহ আ.-এর জাতির জনবল ও ধনবলে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দবী ছিলো। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড পাহাড়েও তাদের আবাস সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহর চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিকে সাময়িকভাবে অবকাশ দেন।[২৭] নূহ আ. তাদেরকে দিবারাত্রি কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। কখনো ক্ষ্যান্ত ও নিরাশ হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। তিনি বলতেন আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।[২৮] স্বল্প সংখ্যক লোক ঈমান আনে। পরিশেষে অহির মাধ্যমে তিনি যখন

---

২১ আল-কুরআন, ২৯ : ১৪-১৫
২২ আল-কুরআন, ৭১ : ১৫-২০
২৩ আল-কুরআন, ১১ : ২৭
২৪ আল-কুরআন, ২৩ : ২৪-২৫
২৫ আল-কুরআন, ১১ : ২৭
২৬ আল-কুরআন, ১১ : ২৮
২৭ আল-কুরআন, ২ : ১৫
২৮ আল-কুরআন, ২৬ : ১০৯; ১০ : ৭২; ১১ : ২৯

জানতে পারলেন যে, এরা আর কেউ ঈমান আনবে না। বরং কুফর, শিরক ও পথভ্রষ্টতার উপরেই তারা যিদ ধরে থাকবে, তখন নিরাশ হয়ে তিনি প্রার্থনা করেন– 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য করো। কেননা ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।'[২৯] পরে তিনি আরো বলেন, 'অতএব তুমি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথী মু'মিনদের তুমি মুক্ত করো।'[৩০] তিনি স্বীয় রবকে আহ্বান করে বললেন, 'আমি অপারগ হয়ে গেছি এক্ষণে তুমি এদের বদলা নাও।'[৩১] তিনি অতঃপর চূড়ান্তভাবে বদদু'আ করে বললেন, 'হে রব! পৃথিবীতে একজন কাফির গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না।'[৩২] ফলে আল্লাহ তা'আলার এক মহাপ্লাবনে তারা ধ্বংস হয় এবং মুষ্টিমেয় মু'মিন নর-নারী মুক্তি পান।[৩৩]

৩. হযরত ইদরিস আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত ইদরিস আ. ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তাঁর নামে বহু উপকথা তাফসিরের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যে কারণে জনসাধারণ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবির মতে তিনি নূহ আ.-এর পরের নবী ছিলেন।[৩৪] পবিত্র কুরআনে হযরত ইদরিস আ. সম্পর্কে সূরা মারয়াম ৫৬, ৫৭ এবং সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইদরিস আ. হলেন প্রথম মানব, যাকে মু'যিজা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও হিসাববিজ্ঞান দান করা হয়েছিলো। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাক হিসেবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করতো। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। এসব কাজের মাধ্যমে তিনি দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৩৫]

৪. হযরত হুদ আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত হুদ আ. দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী 'আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহের পরে কওমে 'আদ ছিলো দ্বিতীয় জাতি। হুদ আ. ছিলেন এদেরই বংশধর। 'আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার বা গোত্র ছিলো। আম্মান থেকে শুরু করে হাযারামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিলো।[৩৬] তাদের ক্ষেত-খামারগুলো ছিলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল। তাদের প্রায় সব ধরনের বাগ-বাগিচা ছিলো। তারা ছিলো সুঠামদেহী ও বিরাট বপু সম্পন্ন। আল্লাহ তাদের অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নি'আমতই তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হলো ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করলো। তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতো। আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করে মূর্তিপূজার শিরক-এর পুনঃপ্রচলন ঘটালো। নূহের সর্বগ্রাসী প্লাবনের কথা তারা ভুলে গেল। ফলে আল্লাহ তাদের হিদায়াতের জন্য তারেদই মধ্য

---

২৯ আল-কুরআন, ২৩ : ২৬

৩০ আল-কুরআন, ২৬ : ১১৮

৩১ আল-কুরআন, ৫৪ : ১০

৩২ আল-কুরআন, ৭১ : ২৬

৩৩ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫-২২৭

৩৪ মুফতী মুহাম্মদ শাফী, অনূঃ মুহিউদ্দিন খান, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*(মদীনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪৫২

৩৫ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৩৬ আল-কুরতুবি, *তাফসিরে কুরতুবি*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৩৫-২৩৬

থেকে হুদ আ.-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। হুদ আ. ও কওমে 'আদ সম্পর্কে কুরআনের ১৭টি সূরায় ৭৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৩৭]

হযরত হুদ আ. তাঁর জাতিকে আহ্বান করে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। অতঃপর তোমরা কি আল্লাহভীরু হবে না?'[৩৮] তিনি তাঁর জাতিকে তাদের বিলাসোপকরণ ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাঁর জাতিকে শিরক পরিত্যাগ করে সার্বিক জীবনে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করার এবং যুলুম ও অত্যাচার পরিহার করে ন্যায় ও সুবিচারের পতে চলার উদাত্ত আহ্বান জানান। কিন্তু নিজেদের ধনৈশ্বর্যের মোহে এবং পার্থিব শক্তির অহংকারে মদমত্ত হয়ে তারা হুদ আ.-এর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। 'আদ জাতির অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাতমিক গযব হিসেবে উপর্যুপরি তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেতসমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগ-বাগিচা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তারপরও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। ফলে তাদের উপর চূড়ান্ত গযব নেমে আসে। সাত রাত ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে বাড়ি-ঘর সব ধ্বসে যায়, প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে গাছপালা সব উপড়ে যায়, মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমিনে পতিত হয়।[৩৯]

৫. হযরত সালিহ আ.-এর দা'ওয়াত : 'আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে হযরত সালিহ আ. সামুদ জাতির প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। তারা আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করতো। তাদের প্রধান শহরের নাম সিরিয়ার অন্তর্গত হিজর যা বর্তমানে মাদাইনে সালিহ নামে খ্যাত। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতির তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও 'আদ জাতির মতো শক্তিশালী ও বীরের জাতি ছিলো। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। সমতল ভূমিতে বিশালাকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানারূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করতো। তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলি আজও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামি ও সামুদি বর্ণমালার শিলালিপি খোদিত রয়েছে।

পথভোলা জাতিকে হযরত সালিহ আ. সর্বপ্রথম তাওহিদের দা'ওয়াত দিলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শিরক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানালেন। তিনি যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত স্বীয় নিরন্তর দা'ওয়াত দিতে থাকেন। জাতির দুর্বল শ্রেণির লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনলেও শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করে।[৪০]

---

৩৭ আল-কুরআন, ৭ : ৬৫-৭২; ৯ : ৭০; ১১ : ৫০-৬০, ৮৯; ১৪ : ৯; ২২ : ৪২; ২৫ : ৩৮-৩৯; ২৬ : ১২৩-১৪০; ২৯ : ৩৮; ৩৮ : ১২; ৪০ : ৩১; ৪১ : ১৩-১৬; ৪৬ : ২১-২৬; ৫০ : ১৩; ৫১ : ৪১-৪২; ৫৪ : ১৮-২২; ৬৯ : ৪-৮; ৮৯ : ৬-৮

৩৮ আল-কুরআন, ৭ : ৬৫

৩৯ আল-কুরআন, ৫৪ : ২০; ৬৯ : ৬-৮

৪০ আল-কুরআন, ৭ : ৭৩-৭৯

সালিহ আ.-এর দা'ওয়াত ও তাঁর জাতির আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২২টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৪১]

ইতিপূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ন্যায় সামুদ জাতিও তাদের নবী সালিহ আ.-কে অমান্য করে। তারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে থাকে। নবী তাদেরকে যতই দা'ওয়াত দিতে থাকেন, তাদের অবাধ্যতা ততই সীমালংঘন করতে থাকে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়। ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হয় এবং বিকট ও ভয়াবহ এক গর্জন শোনামাত্র তারা যার যার স্থানে একযোগে অধোমুখী হয়ে ভূতলশায়ী হলো।[৪২]

৬. হযরত ইবরাহিম আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত সালিহ আ.-এর প্রায় ২০০ বছর পরে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আগম ঘটে। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতি ও অসংখ্য নবীর পিতা। তিনি বাবেল থেকে কিন'আনে (ফিলিস্তিন) হিজরত করেন। সেখান থেকে বিবি সারা-র বংশজাত নবীগণের মাধ্যমে আশপাশে সর্বত্র তাওহিদের দা'ওয়াত বিস্তার লাভ করে। তাঁর আবির্ভাবকালে কালেডীয় সমাজ শিক্ষা ও সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিলো। এমনকি তারা সৌরজগত নিয়েও গবেষণা করতো। কিন্তু অসিলা পূজার রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মূর্তি ও তারকাসমূহের পূজা করতো। তিনি উভয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাওহিদের দা'ওয়াত নিয়ে প্রেরিত হন। হযরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৫টি সূরায় ২০৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৪৩]

সকল নবীর ন্যায় ইবরাহিম আ. স্বীয় জাতিকে প্রথমে তাওহিদের দা'ওয়াত দেন। তিনি দা'ওয়াতের মধ্যে কেবল আল্লাহর স্বীকৃতি কামনা করেননি। বরং স্বীকৃতির ফলাফল আশা করেছিলেন। তারা যেনো আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মান্য করে এবং কোনো অবস্থায় তা লংঘন না করে। পিতা আযরকে তিনি মূর্তিপূজা ত্যাগ করার আহ্বান জানান। কিন্তু ইবরাহিম আ.-এর প্রাণভরা আবেদন পিতা আযরের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত এবং সম্রাটের মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র হওয়ায় সম্ভবত বিষয়টি তার সম্মানের ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।[৪৪] পরে পিতাসহ নিজ সম্প্রদায়কে একত্রে দা'ওয়াত দেন।[৪৫] স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়ের নিকটে ইবরাহিম আ.-এর দা'ওয়াত ও তাদের জবাবকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে রেকর্ড করেছেন।[৪৬] ইবরাহিম আ. তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে দা'ওয়াত দেন। তিনি মূর্তি পূজার অসারতার বিষয়টি তাদের সামনে তুলে ধরেন। তাদের কোনো জবাব না থাকায় তারা শুধু বলতো এটা আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা প্রথা। পিতা তাকে

---

৪১ আল-কুরআন, ৭ : ৭৩-৭৯; ৯ : ৭০; ১১ : ৬১-৬৮; ১৪ : ৯; ১৫ : ৮০-৮৪; ১৭ : ৫৯; ২২ : ৪২; ২৫ : ৩৮-৩৯; ২৬ : ১৪১-১৫৯; ২৭ : ৪৫-৫৩; ২৯ : ৩৮; ৩৮ : ১৩; ৪০ : ৩১-৩৩; ৪১ : ১৩, ১৭-১৮; ৫০ : ১২; ৫১ : ৪৩-৪৫; ৫৩ : ৫১; ৫৪ : ২৩-৩১; ৬৯ : ৪-৫; ৮৫ : ১৮; ৮৯ : ৯; ৯১ : ১১-১৫

৪২ আল-কুরআন, ৭ : ৭৮; ১১ : ৬৭-৬৮

৪৩ আল-কুরআন, ২ : ১২৪-১৩৩, ১৩৫-১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০; ৩ : ৩৩-৩৪, ৬৫-৬৮, ৮৪, ৯৫-৯৭; ৪ : ৫৪, ১২৫, ১৬৩; ৬ : ৭৪-৮৩, ১৬১; ৯ : ৭০, ১১৪; ১১ : ৬৯-৭৬; ১২ : ৬, ৩৮; ১৪ : ৩৫-৪১; ১৫ : ৫১-৬০; ১৬ : ১২০-১২৩; ১৯ : ৪১-৫০, ৫৮; ২১ : ৫১-৭৩; ২২ : ২৬, ৪৩, ৭৮; ২৬ : ৬৯-৮৯; ২৯ : ১৬-২৭, ৩১; ৩৩ : ৭; ৩৭ : ৮৩-১১৩; ৩৮ : ৪৫-৪৭; ৪২ : ১৩; ৪৩ : ২৬-২৭; ৫১ : ২৪-৩৪; ৫৩ : ৩৭; ৫৭ : ২৬-২৭; ৬০ : ৪-৬; ৮৭ : ১৯

৪৪ আল-কুরআন, ২ : ২০৬

৪৫ আল-কুরআন, ২৬ : ৬৯-১০৪

৪৬ আল-কুরআন, ২১ : ৫২-৫৭

হুমকি ও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারকা পূজারিদের সাথে অনেক বিতর্ক হয়। তাঁর সমকালীন সম্রাট নমরূদ ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করায় সে উদ্ধত ও অহংকারী ছিলো। সে নিজেকে উপাস্য ভাবতো। এক পর্যায়ে ইবরাহিম আ.-এর সাথে এ নিয়ে তার বিতর্ক হয়। যুক্তিতে নমরূদ পরাজিত হলেও অহংকার বশতঃ পার্থিব ক্ষমতাবলে ইবরাহিম আ.-কে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ জারি করলেন। আল্লাহ ইবরাহিম আ.-কে আগুন থেকে রক্ষা করলেন।[৪৭] ফলে ইবরাহিমের দা'ওয়াত ও তার প্রভাব সকলের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলো। যদিও সমাজপতি ও শাসকদের অত্যাচারের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু তাওহিদের দা'ওয়াত তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তা সাধারণ জনগণের হৃদয়ে আসন গেড়ে নিয়েছিলো। তিনি সত্তরোর্ধ্ব বয়সে দীর্ঘ দিন দা'ওয়াত দেয়ার পরেও নিজের স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত ব্যতীত কেউ প্রকাশ্যে ইসলাম আনেনি। তাই তিনি বাবেল (বাগদাদ) থেকে কিন'আনে, কিন'আন থেকে মিশরে, আবার কিন'আনে হিজরত করেন।[৪৮] বাইতুল্লাহ পুনর্নির্মাণ করেন এবং পুত্র হযরত ইসমাঈল আ.-এর মাধ্যমে সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জনবসতি গড়ে তোলেন।[৪৯]

৭. হযরত লুত আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত লুত আ. ছিলেন হযরত ইবরাহিম আ.-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি বাবেল শহর থেকে হিজরত করে বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরে কিন'আনে চলে আসেন। আল্লাহ তাকে নবুওয়াত দান করেন এবং কিন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুম অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদুম, আমুরা, দুমা, সাবাহ ও সাওবাহ নামে বড় বড় ৫টি শহর ছিলো।[৫০] হযরত লুত আ. সাদুমে অবস্থান করতেন। লুত আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ১৫টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

লুত আ.-এর জাতি আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিলো। পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে উন্নিত হওয়ার কারণে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়। পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের ন্যায় তারা চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয়। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। এমনকি সমকামিতার মতো নোংরামিতে তারা লিপ্ত ছিলো, যা ইতিপূর্বের কোনো জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। তাঁর দা'ওয়াতে স্বীয় পরিবারের লোকজনসহ মুষ্টিমেয় কিছু লোক ঈমান আনে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ঈমান আনেনি।[৫১] নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি লুত আ.-এর দা'ওয়াতের ফলশ্রুতি মর্মান্তিক রূপে প্রতিভাত হয়। তারা এতই হঠকারী ও নিজেদের পাপকর্মে অন্ধ ও নির্লজ্জ ছিলো যে, তাদের কেবল একটাই জবাব ছিলো, তুমি যে গযবের ভয় দেখাচ্ছো, তা নিয়ে আসো দেখি? অবশেষে নবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র সুবহি সাদিকের সময় একটা প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলোকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন

---

৪৭ আল-কুরআন, ২১ : ৬৮-৬৯

৪৮ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*(রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি.), খ.৭, পৃ. ২৩-২৫

৪৯ আল-কুরআন, ২২ : ২৬-২৮; ২ : ১২৫-১২৬; ১৪ : ৩৬, ৮৯; ১৪ : ৯; ২২ : ৪২; ২৫ : ৩৮-৩৯; ২৬ : ১২৩-১৪০; ২৯ : ৩৮; ৩৮ : ১২; ৪০ : ৩১; ৪১ : ১৩-১৬; ৪৬ : ২১-২৬; ৫০ : ১৩; ৫১ : ৪১-৪২; ৫৪ : ১৮-২২; ৬৯ : ৪-৮; ৮৯ : ৬-৮

৫০ আল-কুরতুবি, *তাফসিরে কুরতুবি*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৪৯-৫০

৫১ আল-কুরআন, ৫১ : ৩৬; ৭ : ৮৩; ৭ : ৮২; ২৭ : ৫৬; ২৬ : ১৭০

এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘুর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়।[৫২] লুত সম্প্রদায়ের কাফিরদের ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে মৃত সাগর বা লুত সাগর নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তিন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে।[৫৩]

৮. হযরত ইসমাঈল আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত ইসমাঈল আ. ছিলেন হযরত ইবরাহিম আ. ও হাজিরার এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। অন্যান্য নবীদের ন্যায় ইসমাঈল আ. ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করে তাঁর দা'ওয়াতি মিশন আমৃত্যু মক্কা কেন্দ্রিক পরিচালিত করেন। তিনি বনু জুরহুম গোত্রে তাওহিদের দা'ওয়াত দেন। ১৩৭ বছর বয়সে মক্কাতে মৃত্যুবরণ করেন ও মা হাজিরার পাশে কবরস্থ হন। সর্বপ্রথম স্পষ্ট আরবি ভাষা ব্যক্ত করেন ইসমাঈল আ.। তিনি ছিলেন আরব জাতির পিতা।[৫৪] হযরত ইসমাঈল আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরায় ২৫টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৫৫] কা'বা নির্মাণকালে পিতাপুত্রের দু'আর বরকতে প্রথমতঃ কা'বা গৃহে যেমন হাজার হাজার বছর ধরে চলছে তাওয়াফ ও সালাত এবং হজ্জ ও উমরার ইবাদত, তেমনি চলছে মু'মিনদের ঢল। দ্বিতীয়তঃ সেখানে সারা পৃথিবী থেকে সর্বদা আমদানি হচ্ছে ফল-ফলাদির বিপুল সম্ভার। তাদের দু'আর তৃতয়ি অংশ মক্কার জনপদে নবী প্রেরণের বিষয়টি বাস্তবায়িত হয় তাদের মৃত্যুর আড়াই হাজার বছর পরে ইসমাঈলের বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ সা.-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে।[৫৬]

৯. হযরত ইসহাক আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত ইসহাক আ. ছিলেন ইবরাহিম আ.-এর প্রথমা স্ত্রী সারাহ-এর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন ইসমাঈল আ.-এর ১৪ বছরের ছোট। তিনি রাফকা বিনতে বাতওয়াঈল-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার গর্ভে ঈস ও ইয়াকুব নামে পরপর দু'টি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে।[৫৭] তার মধ্যে ইয়াকুব আ. নবী হন। পরে ইয়াকুবের বংশধর হিসেবে বনি ইসরাঈলের হাজার হাজার নবী পৃথিবীতে তাওহিদের আলোকে আলোকিত করেন। কিন্তু ইহুদি নেতাদের হঠকারিতার কারণে তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয় এবং অভিশপ্ত জাতি হিসেবে নিন্দিত হয়। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি ফিলিস্তিন এলাকায় দা'ওয়াতি মিশন পরিচালিত করেন। ইসহাক আ. ১৮০ বছর বয়সে কিন'আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ঈস ও ইয়াকুবের মাধ্যমে হেবরনে পিতা ইবরাহিমের কবরের পাশে সমাহিত হন। স্থানটি 'আল-খলিল' নামে পরিচিত।[৫৮] হযরত ইসহাক আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৪টি সূরায় ৩৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৫৯]

---

৫২ আল-কুরআন, ১১ : ৮২-৮৩

৫৩ সর্বশেষ হিসাব মতে উক্ত অঞ্চলটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কি.মি. (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কি.মি. (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মি. (প্রায় কোয়ার্টার মাইল)। দ্র. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৮ এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৮

৫৪ ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪২৫ হি.), খ.১, পৃ. ১০২-১০৪

৫৫ আল-কুরআন, ২ : ১২৫, ১২৭-১২৯, ১৩২-১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ : ৮৪; ৪ : ১৬৩; ৬ : ৮৬; ১৪ : ৩৯; ১৯ : ৫৪-৫৫; ২১ : ৮৫-৮৬; ৩৭ : ১০১-১০৮; ৩৮ : ৪৮

৫৬ আল-কুরআন, ২ : ১২৭-১২৯

৫৭ ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১০৫

৫৮ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১০৬

৫৯ আল-কুরআন, ২ : ১৩২-১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ : ৮৪; ৪ : ১৬৩; ৬ : ৮৪; ১১ : ৭১-৭৩; ১২ : ৬; ১৪ : ৩৯; ১৫ : ৫১-৫৬; ১৯ : ৪৯-৫০; ২১ : ৭২-৭৩; ২৯ : ২৭; ৩৭ : ১১৩; ৩৮ : ৪৫-৪৭; ৫১ : ২৪-৩০

১০. হযরত ইয়াকুব আ.-এর দা'ওয়াত : ইসহাক আ.-এর দুই পুত্র ঈস ও ইয়াকুব-এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকুব নবী হন। ইয়াকুবের অপর নাম ছিলো ইসরাঈল। যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। তিনি ফিলিস্তিনের হেবরনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মামার বাড়ি ছিলো ইরাকের হারানে। ইয়াকুব আ. হারানে মামার বাড়িতে গিয়ে সেখানে তাঁর মামাতো বোন লাইয়া ও পরে রাহিল-কে বিবাহ করেন এবং দু'জনের মোহর অনুযায়ী ৭+৭=১৪ বছর মামার বাড়িতে দুম্বা চরান। ইবরাহিমি শারি'আতে দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা জায়িজ ছিলো। পরে মুসা আর-এর শারি'আতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়। শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বসেরা সুন্দর পুরুষ ইউসুফ আ.। অতঃপর দ্বিতীয় পুত্র বেনিয়ামিনের জন্মের পরেই মা মারা যান। তাঁর কবর বেথেলহামে অবস্থিত এবং কবরে রাহিল নামে পরিচিত। পরে তিনি আরেক শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। ইয়াকুবের ১২ পুত্রের মধ্যে ইউসুফ নবী হন। প্রথমা স্ত্রীর পুত্র লাভী-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মুসা ও হারুন নবী হন। এভাবে ইয়াকুব আ.-এর বংশেই নবীদের সিলসিলা জারি হয়। ইয়াকুব আ.-এর বংশধরগণ বনি ইসরাঈল নামে পরিচিত। হঠকারী ইয়াহুদি-খিস্টানগণ যাতে তারা 'আল্লাহর বান্দা' একথা বারবার স্মরণ করে, সে কারণে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদেরকে বনি ইসরাঈল বলেই স্মরণ করেছেন।

হযরত ইয়াকুব আ. ২০ বছর পর হারান থেকে তাঁর স্ত্রী-পরিজনসহ জন্মস্থান হেবরনে ফিরে আসেন। যেখানে তাঁর দাদা ইবরাহিম ও পিতা ইসহাক আ. বসবাস করতেন। যা বর্তমানে 'আল-খলিল' নামে পরিচিত। পূর্বের মানত অনুসারে তিনি যথাস্থানে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। কিন'আন–ফিলিস্তিন তথা সিরিয়া এলাকাতেই তাঁর নবুওয়াতের মিশন সীমায়িত থাকে। তিনি ১৪৭ বছর বয়সে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতা ইসহাক আ.-এর কবরের পাশে সমাধিস্থ হন।[৬০] ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক ইয়াকুব প্রমুখ নবীগণের দর্ম ছিলো ইসলাম। তাদের মূল দা'ওয়াত ছিলো তাওহদি তথা আল্লাহর ইবাদতে একত্ববাদ। শুধুমাত্র আল্লাহর স্বীকৃতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মধ্যেই তার যথার্থতা নিহিত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অনুসারী হওয়ার দাবিদার ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ তাদের নবীগণের সে দা'ওয়াত ভুলে যায় এবং াবাধ্যতা, যিদ ও হঠকারিতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়ে তারা আল্লাহর অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতিতে পরিণত হয়।[৬১] হযরত ইয়াকুব আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৬২]

১১. হযরত ইউসুফ আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন ইয়াকুব আ.-এর দ্বিতীয় স্ত্রী রাহিল-এর গর্ভজাত প্রথম সন্তান। শৈশবে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাকে সিজদা করছে। এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত গোপন রাখার ব্যাপারে পিতা ইয়াকুব আ. কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার পরও তা ফাঁস হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে তিনি সৎভাইদের হিংসার কবলে পড়েন এবং তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে জঙ্গলের একটি পরিত্যক্ত অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। তিনদিন পর পথহারা ব্যবসায়ী কাফেলার বালতিতে করে তিনি উপরে উঠে আসেন। পরে সে

---

৬০ ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০৫

৬১ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি' আত-তিরমিযি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৭৩, হাদিস নং ২৯৫৪

৬২ আল-কুরআন, ২ : ১৩২-১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ : ৮৪; ৪ : ১৬৩; ৫ : ৮৪-৮৫; ১১ : ৭১; ১২ : ৪-৯, ১১-১৪, ১৫-১৮, ৩৮, ৬৩-৬৮, ৭৮-৮৭, ৯৩-১০০; ১৯ : ৬, ৪৯-৫০; ২১ : ৭২-৭৩; ২৯ : ২৭; ৩৮ : ৪৫-৪৭

ব্যবসায়ীরা তাকে মিশরের রাজধানীতে বিক্রি করে দেয়। ভাগ্যক্রমে মিশরের অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী কিৎফির তাকে ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে যান ক্রীতদাস হিসেবে। কয়েক বছরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণকারী অনিন্দ্য সুন্দর ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীর নিঃসন্তান স্ত্রী যুলাইখার আসক্তি জন্মে। ফলে শুরু হয় ইউসুফের জীবনে আরেক পরীক্ষা। একদিন যুলাইখা ইউসুফকে তার গৃহে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। তাতে ইউসুফ সম্মত না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে পিছন থেকে যুলাইখা তার জামা টেনে ধরলে তা ছিড়ে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই দু'জনে ধরা পড়ে যায় বাড়ির মালিক কিৎফিরের কাছে। পরে যুলাইখার কথা মতো নির্দোষ ইউসুফের জেল হয়। অন্যূন সাত বছর জেল খাটার পর বাদশাহর এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁর মুক্তি হয়। পরে তিনি বাদশাহর অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং বাদশাহর আনুকূল্যে তিনিই হন সমগ্র মিশরের একচ্ছত্র শাসক। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি সাথীদের মাঝে এক আল্লাহর দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন। এখন শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির পর তাঁর দা'ওয়াতি মিশন পরিচালনা করা অনেক সহজ হয়। তিনি সর্বমোট ৮০ বছর রাজত্ব করার পর ১২০ বছর বয়সে মিশরে ইন্তিকাল করেন। তিনিও কিন'আনে সমাধিস্থ হন।

ইউসুফ আ.-এর কাহিনীর সার-নির্যাস হলো তাওহিদ। কেননা এখানে বাস্তব ঘটনাবলি দিয়ে প্রমাণ করে দেয়া হয়েছে যে, কেবল আল্লাহর স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব করা ও তাঁর বিধান মেনে চলার মধ্যেই বান্দার প্রকৃত কল্যাণ ও জগতের সার্বিক মঙ্গল নির্ভর করে।

১২. হযরত আইয়ুব আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত আইয়ুব আ. ধৈর্যশীল নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত। ইবন কাসিরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসহাক আ.-এর প্রথম পুত্র ঈস-এর প্রপৌত্র ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ আইয়ুব আ.-এর জনপদের নাম হুরান অঞ্চলের বাসানিয়াহ এলাকা। যা ফিলিস্তিনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামিশক ও আযরূ'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।[৬৩] এ অঞ্চলেই তিনি দ্বীনের দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পবিত্র কুরআনের ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে আইয়ুব আ.-এর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আইয়ুব আ. ৭০ বছর বয়সে কঠিন পরীক্ষায় পতিত হন। পরীক্ষা থেকে মুক্ত হওয়ার অনেক পরে ৯৩ বছর বা তার কিছু বেশি বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[৬৪]

১৩. হযরত শু'আইব আ.-এর দা'ওয়াত : আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হলো আহলে মাদইয়ান। মাদইয়ান হলো লুত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যবধি পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর মু'আন-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুফরি করা ছাড়াও এ জনপদের লোকেরা ব্রবসা কালে ওজন ও মাপে কম দিতো, রাহাজানি ও লুটপাট করতো। অন্যায় পথে জনগণের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করতো। ইবরাহিম আ.-এর পুত্র মাদইয়ানের নামে জনপদটি পরিচিত হয়েছে।[৬৫] হযরত শু'আইব আ. এদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি হযরত মুসা আ.-এর শ্বশুর ছিলেন। লুত জাতির

৬৩ ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২০৬-২১০

৬৪ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-২৮০

৬৫ বালাযুরি, *মু'জামুল বুলদান*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯), খ.৫, পৃ. ৭৭

ধ্বংসের অনতিকাল পরে মাদইয়ান জাতির প্রতি তিনি প্রেরিত হন।[৬৬] চমৎকার বাগ্মিতার কারণে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে খতীবুল আম্বিয়া বলেছেন।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত জাতিগুলোর বড় বড় কিছু অন্যায় কর্ম ছিলো। যার জন্য বিশেষভাবে সেখানে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। শু'আইব আ.-এর জাতিরও তেমনি মারাত্মক কয়েকটি অন্যায় কর্ম ছিলো, যে জন্য বিশেষ করে তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকটে শু'আইব আ.-কে প্রেরণ করা হয়। তাঁর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ দা'ওয়াত সে উদ্ধত জাতির নেতাদের হৃদয়ে রেখাপাত করলো না। তারা বরং আরও উদ্ধত হয়ে তাঁর দরদ ভরা সুলতিত ভাষণ ও অপূর্ব চিত্তহারী বাগ্মিতার জবাবে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির পাপিষ্ঠ নেতাদের ন্যায় নবীকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য করে বললো– 'তোমার সালাত কি তোমাকে একথা শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূঁজা ছেড়ে দিই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যুগ যুগ ধরে যে সবের পূজা করে আসছে?'[৬৭] তারা নবীকে জনপদ থেকে বের করে দেয়ার ও হত্যা করার হুমকি দিলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করলেন। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হলো। আসলো বিকট নিনাদ, ভূমিকম্প, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। মেঘমালা থেকে শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। ধ্বংস হয়ে যায় খোদাদ্রোহি মাদইয়ান জাতি। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব ধ্বংসস্থল চোখে পড়ে।

১৪ ও ১৫. হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর দা'ওয়াত : আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ষষ্ঠ জাতি হলো ফিরআউনের সম্প্রদায়। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো হযরত মুসা, হারুন আ. ও ফিরআউনের প্রসঙ্গ। মুসা আ. হলেন ইবরাহিম আ.-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম ইমরান ও মাতার নাম ইউহানিব। তিনি বনি ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হন।[৬৮] জন্ম মিশরে এবং লালিত-পালিত হন মিশর সম্রাট ফিরআউন রামিসাস-২ এর ঘরে। তাঁর সহোদর ভাই হারুন আ. ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মুসা আ.-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিশর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরে বনি ইসরাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে। মুসা আ. ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেছিলেন; তিনি তাওরাত প্রাপ্ত হন।[৬৯] সে অনুযায়ী মুসা আ.-এর বয়সকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যেমন– প্রথম ৩০ বছর মিশরে, তারপর ১০ বছর মাদইয়ানে, তার মিশরে ফেরার পথে তুর পাহাড়ের নিকটে তুওয়া উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিশরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাওহিদের দা'ওয়াত প্রদান। তারপর ৬০ বছর বয়সে বনি ইসরাঈলদের নিয়ে মিশর হতে প্রস্থান এবং ফিরআউনের সলিল সমাধি। াতঃপর আদি বাসস্থান কিন'আন অধিকারী আমালিকাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য বনি ইসরাঈলদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে অবস্থান

---

৬৬ আল-কুরআন, ১১ : ৮৯

৬৭ আল-কুরআন, ১১ : ৮৭

৬৮ আল-কুরআন, ৩২ : ২৩; ৬১ : ৬

৬৯ ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২২৬

ও বাইতুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। তাঁর কবর বাইতুল মুকাদ্দাসের উপকণ্ঠে।[৭০]

১৬. হযরত ইউনুস আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত ইউনুস ইবন মাত্তা আ.-এর কথা কুরআনের মোট ৬টি সূরার ১৮টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউনুস ৯৮ আয়াতে তাঁর নাম ইউনুস, সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াতে যুন-নুন এবং সূরা কলাম ৪৮ আয়াতে তাকে সাহিবুল হূত বলা হয়েছে। নুন ও হূত উভয়ের অর্থ মাছ। যুন-নুন সাহিবুল হূত অর্থ মাছওয়ালা। একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন।

ইউনুস আ. বর্তমান ইরাকের মসুল নগরীর নিকটবর্তী নিনাওয়া জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহিদের দা'ওয়াত দেন এবং ইমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দা'ওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে আল্লাহর হুকুমে তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান। ইতিমধ্যে তাঁর জাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাষ দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হতে পারে। তারা ভাবলো, নবী কখনো মিথ্যা বলে না। ফলে তাঁর জাতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা শিশু ও গবাদিপশুগুলোকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহর দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্ত:করণে তাওবা করে এবং আসন্ন গযব থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন।[৭১] অপরপক্ষে ইউনুস আ. ভেবেছিলেন যে, তাঁর জাতি আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার জাতি তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং এর শাস্তি হিসেবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিলো। কিন্তু তিনি দা করেননি। ফলে নদী পথে যাওয়ার সময় আল্লাহ তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সাময়িক কিছু সময় মাছের পেটে অবস্থান করান।[৭২] পরিশেষে আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া দু'আর মাধ্যমে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দেন।[৭৩] ইউনুস আ. মাছের পেটে থাকার পরে আল্লাহর হুকুমে নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হন। মাছের পেটে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি রুগ্ন ছিলেন। সে অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা তিনি খেয়েছিলেন, যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিলো। অতঃপর সুস্থ হয়ে তিনি আল্লাহর হুকুমে নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে চলে যান। যাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশি ছিলো। তারা তাঁর উপর ইমান আনলো। ফলে পুনরায় শিরকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেন।[৭৪]

---

৭০ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২-৩৪১

৭১ আল-কুরআন, ৪ : ১৬৩; ৬ : ৮৬; ১০ : ৯৮; ২১ : ৮৭-৮৮; ৩৭ : ১৩৯-১৪০; ৬৮ : ৪৮-৫০

৭২ আল-কুরআন, ৩৭ : ১৩৯-১৪২

৭৩ আল-কুরআন, ২১ : ৮৭-৮৮

৭৪ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫-৩৮৮

১৭. হযরত দাউদ আ.-এর দা'ওয়াত : বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন মাত্র দু'জন। তারা হলেন পিতা ও পুত্র দাউদ ও সুলাইমান আ.। বর্তমান ফিলিস্তিনসহ সমগ্র ইরাক ও সিরিয়া এলাকায় তাদের রাজত্ব ছিলো। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তারা ছিলেন সর্বদা আল্লাহর প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ।[৭৫] হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে কুরআনের ৯টি সূরায় ২৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আমালিকা দখলদারদের হটিয়ে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ লাভ করেন তালুত। তালুতের পর দাউদ আ. শাসনক্ষমতায় আসেন। তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন; যাবুর প্রাপ্ত হন। তিনি শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানের সংখ্যা ছিলো ১৯ জন। তন্মধ্যে সুলাইমান আ. নবুওয়াত ও শাসন ক্ষমতা উভয় দিক দিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।[৭৬] দাউদ আ. ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[৭৭] যথা–

- আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে বলিয়ান।
- পাহাড় ও পক্ষীকুল তাঁর অনুগত।
- তাকে দেয়া হয়েছিলো সুদৃঢ় সাম্রাজ্য, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য বাগ্মিতা।
- লোহাকে আল্লাহ তাঁর জন্য নরম করে দিয়েছিলেন।
- তিনি যাবুর প্রাপ্ত হন।
- তাকে অপূর্ব সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়।
- তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক।

দাউদ আ.-এর সময় বনি ইসরাঈলদের জন্য শনিবার ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিন তাদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিলো। তারা সমুদ্রোপকুলের বাসিন্দা ছিলো এবং মৎস্য শিকার ছিলো তাদের পেশা। ফলে দাউদ আ.-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐদিন মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি নেমে আসে এবং তিনদিনের মধ্যেই তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়।[৭৮]

১৮. হযরত সুলাইমান আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত দাউদ আ.-এর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলাইমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুওয়াতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। সুলাইমান আ.-এর মোট বয়স ছিলো ৫৩ বছর। ১৩ বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুলাইমান আ.-এর কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- বায়ু প্রবাহ অনুগত হওয়া।
- তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা।
- জিনকে অধীনস্ত করা।
- পক্ষীকুলকে অনুগত করা।
- পিপীলিকার ভাষা বুঝা।
- অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা।
- প্রাপ্ত অনুগ্রহরাজির হিসাব না রাখার অনুমতি পাওয়া।

---

৭৫ আল-কুরআন, ৩৮ : ১৭
৭৬ আল-কুরআন, ২৭ : ১৬
৭৭ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫
৭৮ আল-কুরআন, ২ : ৬৫-৬৬

সুলাইমান আ. বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। শুধু ক্ষমতা লাভ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং এর পিছনে আল্লাহর বিধানাবলি বাস্তবায়ন করা এবং তাওহিদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করাই মূল উদ্দেশ্য ছিলো। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহে রাজত্ব লাভের পর তিনি তাওহিদ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করেছেন। তিনি কখনোই অহংকারের বশীভুত হননি। হযরত দাউদ আ. কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নিমাণের অসমাপ্ত কাজ সুলাইমান আ.-এর হাতে সমাপ্ত হয়।[৭৯]

১৯. হযরত ইলয়াস আ.-এর দা'ওয়াত : পবিত্র কুরআনে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলয়াস আ.-এর আলোচনা দেখা যায়। সূরা সাফফাতে সংক্ষেপে হলেও তাঁর দা'ওয়াতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি হযরত হিযকিল আ.-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াসা' আ.-এর পূর্বে দামিশকের পশ্চিমে বা'লাবাক্কা অঞ্চলের বনি ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত হন। এ সময় হযরত সুলাইমান আ.-এর উত্তরসূরিদের অপকর্মের দরুণ বনি ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগকে ইয়াহুদিয়াহ বলা হতো এবং তাদের রাজধানী ছিলো বাইতুল মুকাদ্দাস। অপর ভাগের নাম ছিলো ইসরাঈল এবং তাদের রাজধানী ছিলো তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুস। হযরত ইলয়াস আ. ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল'আদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন এবং ফিলিস্তিন অঞ্চলে তাওহিদের দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

২০. হযরত আল-ইয়াসা' আ.-এর দা'ওয়াত : পবিত্র কুরআনে এ নবী সম্পর্কে সূরা আন'আম ৮৬ ও সূরা সোয়াদ ৪৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অন্য নবীদের নামের সাথে। সূরা আন'আম ৮৩ থেকে ৮৬ আয়াত পর্যন্ত আল-আয়াসা'সহ ১৭ জন নবীর নামের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ইফরাঈম ইবন ইউসুফ ইবন ইয়াকুব-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইলয়াস আ.-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর নায়েব ছিলেন। হযরত ইলয়াস ও সুলাইমান আ.-এর পরবর্তী পথভ্রষ্ট বনি ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত হন। তাঁর পরে তিনি নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইলয়াস আ.-এর শারি'আত অনুযায়ী ফিলিস্তিন অঞ্চলে জনগণকে পরিচালিত করেন এবং তাওহিদের দা'ওয়াত অব্যাহত রাখেন। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে সেখানে তাঁর নাম ইলিশা ইবন সাকিত বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৮০]

২১. হযরত যুল-কিফল আ.-এর দা'ওয়াত : পবিত্র কুরআনে কেবল সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ ও সোয়াদ ৪৮ আয়াতে যুল-কিফলের নাম এসেছে। তিনি আল-ইয়াসা'-এর পরে নবী হন এবং ফিলিস্তিন অঞ্চলে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে তাওহিদের দা'ওয়াত দেন।[৮১]

২২ ও ২৩. হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহয়া আ.-এর দা'ওয়াত : যাকারিয়া ও ইয়াহয়া হযরত সুলাইমান আ.-এর পরবর্তী দুই নবী পরস্পরে পিতা-পুত্র ছিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহয়া ছিলেন পরবর্তী নবী ঈসা আ.-এর আপন খালাতো ভাই এবং বয়সে ছয় মাসের বড়। হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহয়া আ. সম্পর্কে ৪টি সূরার ২২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৮২] যাকারিয়া আ. সম্পর্কে কুরআনে শুধু এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন যে, তাঁর গর্ভের সন্তানকে তিনি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করবেন। মারয়াম আ. জন্মগ্রহণ করলে মানত অনুসারে

---

৭৯ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

৮০ মুফতী মুহাম্মদ শাফী,অনূঃ মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭০

৮১ আল-কুরআন, ২১ : ৮৫-৮৬; ৩৮ : ৪৮

৮২ আল-কুরআন, ৩ : ৩৭-৪১; ৬ : ৮৫; ১৯ : ২-১৫; ২১ : ৮৯-৯০

তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবায় উৎসর্গ করা হয় এবং হযরত যাকারিয়া আ. তাঁর লারন-পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।[৮৩] নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়া আ.-এর ঐকান্তিক বাসনায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ইয়াহয়া নামক একজন প্রজ্ঞাবান সন্তান দান করেন। পিতা-পুত্র উভয়ে মিলে ফিলিস্তিন এলাকায় তাওহিদের দা'ওয়াত অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ইয়াহুদের চরিত্র এতই কলুষিত ও উদ্ধত ছিলো যে, তারা যাকারিয়া ও ইয়াহয়ার ন্যায় মহান নবীকে হত্যা করে।[৮৪]

২৪. হযরত ঈসা আ.-এর দা'ওয়াত : হযরত ঈসা আ. ছিলেন বনি ইসরাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি ইনজিল প্রাপ্ত হন। তারপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ সা.-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোনো নবী আগমন করেননি। ঈসা আ. সম্পর্কে কুরআনের মোট ১৫টি সূরায় ৯৮টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ঈসা আ. পিতা ছাড়া আল্লাহর বিশেষ কুদরতে মারয়াম আ.-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৫] ঈসা আ.-এর জন্ম গ্রীষ্মকালে হয়েছিলো খেজুর পাকার মওসুমে। খিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ২৫ ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের সময়ে নয়। সাধারণতঃ প্রায় সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। তবে ঈসা আ. সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুওয়াত ও কিতাব প্রাপ্ত হন এবং তাওহিদের বাণী প্রচার করতে থাকেন। কেননা আকাশে তুলে নেওয়ার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে ছিলো। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পৌঢ় বয়সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে মানুষকে তাওহিদের দা'ওয়াত দিবেন।[৮৬]

হযরত ঈসা আ. নবুওয়াত লাভ করার পর স্বীয় জাতিকে প্রধানতঃ ৭টি বিষয়ে দা'ওয়াত দিতেন। তিনি বলতেন, হে বনি ইসরাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকট আগমন করেছি–

- আল্লাহর রাসূল হিসেবে;
- আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসেবে;
- আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসেবে, যার নাম হবে আহমাদ;[৮৭]
- নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই সরল পথ।[৮৮]
- আমার আনীত এ কিতাব (ইনজিল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে;
- আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দিবো কোনো কোনো বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিলো;
- আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ;
- তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।[৮৯]

২৫. হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াত : শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের যুগসন্ধিক্ষণে আরবজাতি ভাষাজ্ঞানে জাত্যাভিমানে গর্ব করতো। আর অন্যান্য জাতিদের আযমি বা বোবা মনে করতো। তাই আল-কুরআনের ভাষাকে এতোই উচ্চাঙ্গের শৈলী দিয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে সে আরবরাই হতভম্ব হয়ে যায়। এমনিভাবে কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানও সারা বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ। অতএব এ গ্রন্থের ভাব ও ভাষাসহ সব দিক দিয়েই কিয়ামত পর্যন্ত

---

৮৩ আল-কুরআন, ৩ : ৩৬-৪৪

৮৪ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

৮৫ আল-কুরআন, ৩ : ৪৫; ১৯ : ১৬-২১; ২১ : ৯১; ৬৬ : ১২

৮৬ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৮৪

৮৭ আল-কুরআন, ৬১ : ৬

৮৮ আল-কুরআন, ১৯ : ৩৬

৮৯ আল-কুরআন, ৩ : ৫০

সকলের জন্য চিরন্তন মু'যিজা। আল্লাহর পথে দা'ওয়াত প্রদানের জন্যই নবী-রাসূলগণের পৃথিবীতে আগমন। মু'মিনের জীবনের অন্যতম দায়িত্বও এ দা'ওয়াত। নবী-রাসূলগণের মূল দায়িত্ব ছিলো সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, প্রচার, নসিহত, ওয়াজ বা এক কথায় আল্লাহর দীন কায়িমের পথে আহ্বান করা। সকল নবীই তাঁর উম্মতকে তাওহিদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন।[৯০]

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَه مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيْلِ ز يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৯১]

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ج وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

এরই ধারাবহিকতায় আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী মুহাম্মদ সা.-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান ও তাঁর প্রতি দা'ওয়াত দেয়ার জন্য। নবী হিসেবে তিনিই হলেন সর্বশেষ; তারপর আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবেন না। কিন্তু আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্য একদল দা'ঈ বা নবীদের উত্তরসূরি কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে, যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে এবং নবী-রাসূলদের শূন্যতা পূরণ করবে। চিরন্তন ইসলামি দা'ওয়াহকে যুগে যুগে সময়োপযোগী করা হয়েছে। সুতরাং প্রতি যুগের দা'ঈগণকে সে নীতি মেনে চলতে হবে। যুগ প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং তা বিবেচনা করে দা'ওয়াতি কাজ করতে হবে।

আজ একজন দা'ঈর জন্য তার দা'ওয়াতি ময়দানে রাসূল সা.-এর আদর্শকে আঁকড়ে ধরা এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর আদর্শকে সমুন্নত রাখার কোনো বিকল্প নেই। রাসূল সা. মানুষকে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে যখন যেভাবে যে হিকমত ও কৌশল াবলম্বন করেন একজন দা'ঈর জন্য তার দা'ওয়াতের ময়দানে তাই হলো গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। রাসূল সা. মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হিকমত, কৌশল ও বুদ্ধি গ্রহণ করেন। রাসূল সা. দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যে সব হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করেন এবং যে উন্নত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তা যদি একজন দা'ঈ তার কর্মক্ষেত্রে ও দা'ওয়াতি ময়দানে অবলম্বন করে, তাহলে সে অবশ্যই সফল হবে। এছাড়া যদি সে রাসূল সা.-এর আদর্শসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তার সফলতা অর্জন নিশ্চিত। হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দা'ওয়াতি কাজকে সম্পন্ন করতে তার থেকে আর কোনো ত্রুটি হবে না।

---

৯০ 'যারা এ বার্তাবাহক উম্মি নবীর আনগত্য করে, যার সম্পর্কে তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে ন্যায়ানুগ কাজের নির্দেশ দেন গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জিনিসসমূহ হালাল করেন, তাদের জন্য অপবিত্র ও গর্হিত জিনিসসমূহ হারাম করেন এবং তাদের উপর চাপানো গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করেন। দ্র. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭

৯১ 'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনো না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনার জন্য এবং তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তিনি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।' দ্র. আল-কুরআন, ৫৭ : ৮

দা'ওয়াতি ময়দানে রাসূল সা.-এর জীবনী থেকে সংগৃহীত হিকমত, বুদ্ধি ও কৌশলগুলো সে কাজে লাগাতে পারবে।

সুতরাং একথা স্মরণযোগ্য যে, রাসূল সা. হলেন একজন মুসলিমের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ। তার আদর্শের অনুকরণই হলো, একজন প্রকৃত দা'ঈর মৌলিক কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'[৯২]

মহানবী সা. ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করার পর থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ বছর যাবত আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করে ইসলামকে বিশ্বের দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দেন। সাথে সাথে গড়ে তুলেন লক্ষাধিক দা'ঈ সাহাবিদের নিয়ে এক বিশাল জামা'আত। সাহাবিগণ রাসূল সা.-এর অনুসৃত পথে একই দা'ওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যান। সাহাবিদের অনুসরণে তাবি'ঈগণ এবং পর্যায়ক্রমে তাবি তাবি'ঈগণ এ দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে আজ কোটি কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠি দৃশ্যমান। লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে সুমধুর স্বরে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে; হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

---

৯২ আল-কুরআন, ৩৩ : ২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পদ্ধতি ও কৌশল

আল্লাহ তা'আলার এক সুস্পষ্ট অনুগ্রহ যে তিনি তাঁর দীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার অগণিত পথ আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণ করে তাদের স্রষ্টার কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ নিতে পারেন। মানুষকে ইসলামের পথে দা'ওয়াত দিতে হবে এমন পদ্ধতিতে যা মানুষের কাছে সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং গ্রহণযোগ্য। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী একজন দা'ঈকে তার দা'ওয়াহ পদ্ধতিও বদলানো লাগবে। আর ঠিক এ কাজটাই করেছিলেন আল্লাহ নবী হযরত নূহ আ. এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ।

আল-কুরআন ইসলামি দা'ওয়াতের প্রথম ও মৌলিক উৎস। ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় আল-কুরআন মানব জাতির জন্য যে ক'টি আয়াতের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামি দা'ওয়াতের সংবিধানতুল্য একটা আয়াত হলো–[৯৩]

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

তাই ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ তথা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো হিকমত। সুতরাং হিকমতের প্রকৃত স্বরূপ কি, ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত বলতে কি বুঝায়, কিভাবে, কি করলে সেটা হিকমতপূর্ণ দা'ওয়াত হবে, যা একজন দা'ঈকে পালন করা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ফরয, তা আলোচনার দাবিদার।

হিকমতের স্বরূপ

হিকমত আরবি শব্দ। মূল ধাতুগত দিক দিয়ে এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়। যেমন– তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, দর্শন, পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা।[৯৪] এ শব্দটির উৎপত্তি আরবি حكم মূলধাতু থেকে। এ অভিদায় এর অর্থ আদেশ করা, শাসন করা, নিষেধ করা, বিরত রাখা, বিধিসমুহ পরিচালনা করা, আদেশ প্রবর্তন করা, মীমাংসা করা।[৯৫] এ থেকেই حكيم (হাকীম) শব্দটির ব্যবহার, যা বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত। আরবি ভাষাতেও حكيم শব্দটি ফয়সালাকারী ও চিকিৎসক অর্থে ব্যবহার পাওয়া যায়।[৯৬] হিকমত শব্দটি কার্যকারণ ও রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– حكمة التشريع তথা শার'ঈ আইন প্রচলনের কার্যকারণ বা এর পিছনে যুক্তি রহস্য।[৯৭] মূলত হিকমত এমন একটা ব্যাপকার্থবোধক প্রত্যয়, যার প্রতিশব্দ নেই। যাকে এক কথায় অন্য ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব।

---

৯৩ 'তুমি তোমরা তোমার রবের পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও মাউ'য়িযা হাসানার মাধ্যমে, আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তিতর্ক করো।' দ্র. আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫

৯৪ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আযহারী, *আরবী-বাংল অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), খ.২, পৃ. ১২০৫

৯৫ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংল অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

৯৬ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*(কায়রো : মাকতাবাতুশ শুরুকিদ দুওয়ালিয়্যাহ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪২৫ হি.), পৃ. ১৯০

৯৭ মাজদুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ইয়া'কুব আল-ফিরোজাবাদি, *আল-কামুসুল মুহিত*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৪২৯ হি.), পৃ. ৩৮৯

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান 'আলি আন-নদভি উল্লেখ করেছেন :[৯৮]

"الحكمة الكلمة البليغة العربية التى جاءت فى الآى لا أعتقد أنها من الْممكن ترجمتها أو نقلها إلى لغة أخرى."

আর এ জন্য হিকমত শব্দটির ব্যাখ্যায় অনেক মতামত ও বৈচিত্রময় মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে এগুলোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করা হলো :

এক. বিশিষ্ট তাবি'ঈ হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন– 'কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ করার নাম হিকমত।'[৯৯]

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবন জারির তাবারি ও খাযিন এক বাণীতে এ মতই পোষণ করেছেন।[১০০]

ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযি এ সঙ্গে আরো কিছু শব্দ যুক্ত করে বলেন–[১০১]

"الحكمة هى الإصابة فى القول والفعل ووضع كل شيء موضعه."

উল্লেখ্য, তাফসিরে খাযিন প্রণেতা তাঁর তাফসিরের অন্যত্র এ মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, কেউ কথা ও কাজে উভয়ে যথাযথ না হলে তাকে হাকিম বলা যাবে না।[১০২]

দুই. ইমাম মালেক রহ. বলেন, হিকমতের অর্থ আমার অন্তরে যা আসে তাহলো, এটা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য। আর এটা একটা বিষয়, যা আল্লাহ স্বীয় দয়া ও করুণায় মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন।[১০৩]

আল্লামা তাবারি স্বীয় তাফসির গ্রন্থে ইবন যায়িদ রহ. থেকে এমনি একটা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন :[১০৪]

"الحكمة شيء يجعله الله فى القلب بنور له به."

তিন. আল্লামা আলুসি এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, আবু উসমানের মতে,[১০৫]

"الحكمة هى نور يفرق به بين الوسواس والإلهام."

চার. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম হিকমতের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন :

'ইবন কুতাইবা ও অধিকাংশ উলামার মতে হিকমত হলো, সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে অনুসারে কাজ করা। এটা হলো উপকারি বিদ্যা ও সৎকাজ।'[১০৬]

---

৯৮ 'আয়াতে উল্লিখিত হিকমত শব্দটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আরবি শব্দ, যা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না।' দ্র. সাইয়িদ আবুল হাসান 'আলি আন-নাদভি, *রাওয়াই'উ মিন আদাবিদ দা'ওয়াহ*(কুয়েত : দারুল কলম, ১৯৮১), পৃ.১৫

৯৯ "الحكمة هى الإصابة فى القول والفعل" দ্র. মুহাম্মদ ইবন জারির তাবারি, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বিলি আয়িল কুরআন*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৫ হি.), খ.২, পৃ. ১৬৩; আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*(বৈরুত : ইদারাতুত তিবা'আতিল মুনিরিয়্যাহ, তা.বি.), খ.৩, পৃ. ৪১

১০০ আলাউদ্দিন বাগদাদি, *তাফসিরে খাযিন*(বৈরুত : দারুল 'কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫ হি.), খ.১, পৃ. ৯২

১০১ 'কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ এবং প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তুকে যথাযথ স্থানে রাখাকে হিকমত বলে।' দ্র. ফখরুদ্দিন আর-রাযি, *আত-তাফসিরুল কাবির*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণ, ১৪০১ হি.), খ.৪, পৃ. ৭৪

১০২ আবু হায়ান, *আল-বাহরুল মুহিত*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি.), খ.১, পৃ. ৫৬৩

১০৩ ইবন কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*(রিয়াদ : দারু তাইয়িবাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮ হি.), খ.১, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫

১০৪ 'হিকমত এমন একটা বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা মানব অন্তরে স্থাপন করে দেন, যার দ্বারা তা আলোকময় হয়ে যায়।' দ্র. ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৯০-৩৯১

১০৫ 'হিকমত হলো একটা জ্যোতি বিশেষ, যার দ্বারা কোনটা শয়তানের পক্ষ থেকে প্ররোচনা, আর কোনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, তা পার্থক্য করা যায়।' দ্র. আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪১

পাঁচ. লিসানুল আরব প্রণেতা ইবন মানযুর এবং বিশিষ্ট ভাষাবিদ ইবনুল আসির উল্লেখ করেন,[১০৭] 'সর্বোত্তম বিদ্যার মাধ্যমে সর্বোত্তম বিষয়সমূহ জানার নাম হিকমত।'

ছয়. আল্লামা রাগিব ইসফাহানির মতে,[১০৮]

"الحكمة اسم لكل علم حسن وعمل صالح وهو بالعلم العملى أخص منه من العلم النظرى وفى العمل أكثر استعمالا منه فى العلم وإن كان العمل لا يكون محكما من دون العالم به .. وهى فى تعارف الشرع اسم للعلوم العقلية أى الْمدركة بالعقل."

সাত. কারো মতে, 'বস্তু বা বিষয়সমূহের সত্ত্বাগত ও স্বভাবজাত মূলনীতি সম্পর্কে জানার নাম হিকমত।'[১০৯]

আল্লামা ইসফাহানি আরো উল্লেখ করেন, হিকমত হলো– আল্লাহর একটা বিশেষ গুণ। তাই একে যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ হবে বিষয় বা বস্তুসমূহের বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বভাবজাত গুণাবলি সৃজন ও উদ্ভাবন করা। আর সে হিকমতকে বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হলে, তখন এর অর্থ হবে সে স্বভাবজাত গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া।[১১০] কারণ মানুষ অবহিত হতে পারে, বস্তুর উপযোগিতা আনতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে না।

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও মন্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে হিকমতের স্বরূপ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তাহলো–

প্রথমত : এটা কথা ও কাজের এক বিশেষণ। তাহলো, এগুলো যথার্থ হবে। অর্থাৎ যেখানে যা প্রযোজ্য, সেখানে তা করতে সমর্থ হলেই বলা হবে সে হিকমতের অধিকারী। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুজাহিদ, বিশিষ্ট মুফাসসির তাবারি, রাযি, খাযিন ও আলুসি প্রমুখের অভিমত এটা।

দ্বিতীয়ত : এটা এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নাম, যার দ্বারা সত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে সে অনুসারে কল্যাণকর কাজে নিবিষ্ট হওয়া যায়। আল্লামা ইসফাহানি, ইবন মানযুর, ইবনুল আসির প্রমুখের মতামত থেকে এটা জানা যায়।

---

১০৬ "قال ابن قتيبة والجمهور، الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهى العلم النافع والعمل الصالح." দ্র. ইবনুল কায়্যিম, *মিফতাহুস সা'আদা*(রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিসাহ, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৫১

১০৭ "الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم." দ্র. আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(কুয়েত : ইসলামি, ওয়াকফ, দা'ওয়াহ্ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, কুয়েত, বিশেষ প্রকাশনা, ১৪৩১ হি.), খ.১২, পৃ. ১৪০; ইবনুল আসির, *আন-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিসি ওয়াল আছার*(বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ.১, পৃ. ১১৯

১০৮ 'হিকমত হলো উত্তম বিদ্যা ও সৎকাজ। আর এটা তাত্ত্বিক বিদ্যার চেয়ে ফলিত বিদ্যার সাথে বেশি সম্পর্ক যুক্ত। আর বিদ্যার চেয়ে কার্য ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত। যদিও কোনো কাজ সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত তা হিকমতপূর্ণ হয় না। আর এটা শারি'আতের পরিভাষায় 'আকল তথা বুদ্ধিলব্ধ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম।' দ্র. আল্লামা আর-রাগিব আল-ইসফাহানি, *আয-যারিআতু মাকারিমিশ শারি'আহ*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮০), পৃ. ১০৪

১০৯ "معرفة الأشياء الْموجودة بحقائقها ويعنى كليات الأشياء." দ্র. আলাউদ্দিন বাগদাদি, *তাফসিরে খাযিন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২১১

১১০ আল্লামা আর-রাগিব আল-ইসফাহানি, *আয-যারিআতু মাকারিমিশ শারি'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

তৃতীয়ত : এটা একটা নূর বা সহজাত জৌতি, যা ইলহামি তথা আল্লাহ প্রদত্ত। যার মাধ্যমে মানুষ সত্যকে সত্য হিসেবে বুঝে থাকে, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

চতুর্থত : এটাতে ফলিত দিক প্রাধান্য পায়। কিন্তু কোনো বিষয় কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে, সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

অতএব, উপরোক্ত মতামতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই, বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। একই অর্থের বিভিন্ন বিশ্লেষণ। কেউ হিকমতের উৎস মূলের উপর, কেউ এর বিশেষণ ও ধরনের উপর, কেউ তার কার্যকারিতা, ফলাফলের উপর জোর দিয়েছেন। অতএব এসব সংজ্ঞায় বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হলেও আসলে সবগুলো হিকমতেরই আওতাভুক্ত। হিকমত একটা যৌগিক প্রত্যয় বিশেষ।

হিকমত হলো এক নুরানি সত্তা, জৌতির্ময় শক্তি, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়। কেউ তার কিছু কিছু স্বভাবত পেয়ে যায়, আবার কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তার দেয়া নিয়ম মাফিক চর্চা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা অর্জন করে। অতএব, হিকমতের এ ব্যাখ্যা তার উৎস মূল হিসেবে।

এমনিভাবে হিকমত একটা প্রজ্ঞার নাম, যার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এর দ্বারা কোনো ভুল বা বোকামি সুলভ কথা বা কাজ হয় না। যা হয়, তা স্বভাবজাতভাবেই মানুষ সঠিক বলে ধরে নেয়। হিকমত ভুল বা বোকামিসুলভ সব কাজ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য ঘোড়ার লাগামকে ‘হাকামা’ বলা হয়।[১১১] কারণ তা মনিবের অবাধ্যতা থেকে তাকে বিরত রাখে।

আর জ্ঞানগর্ভ প্রজ্ঞাময় সে রীতিনীতি জানা থাকলে, যে কোনো বিষয়ে যথার্থতা ফুটে উঠার সাথে সাথে ফলাফল এ দাঁড়াবে যে, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ভুল-সঠিক, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং উত্তম-অধমের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় হয়ে যাবে। এজন্য হিকমত আল্লাহর দেয়া বড় নি‘আমত ও রহমত। যার মাঝে তা পাওয়া যাবে, তার প্রভুত কল্যাণ সাধিত হবে। আর এজন্য আল্লাহ তা‘আলা কুরআন কারিম ইরশাদ করেছেন :[১১২]

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

এজন্য আম্বিয়া কিরাম ও তাদের অনুসারিদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে যে সকল নি‘আমত দান করা হয়েছিলো, তন্মধ্যে একটা বিশেষ নি‘আমতের কথা আল-কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাহলো হিকমত। যেমন– হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশধরের উপর আল্লাহ তা‘আলা যেসব অনুগ্রহ করেছেন, তা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে :[১১৩]

فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ إِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا.

হযরত লুকমান আ.-কে হিকমত প্রদানের বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :[১১৪]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ.

---

১১১ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফায়ুমি, *আল-মিসবাহুল* মুনির(বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৮৭), পৃ. ৫৬

১১২ ‘যাকে হিকমত দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।’ দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৬৯

১১৩ ‘ইবরাহিম-এর বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছিলাম এবং বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছিলাম।’ দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ৫৪

১১৪ ‘আমি অবশ্যই লুকমানকে হিকমত দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।’ দ্র. আল-কুরআন, ৩১ : ১২

এমনিভাবে হযরত দাউদ, ‘ঈসা আ. ও তাঁর উম্মত এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. ও তাঁর উম্মতকে আলাদাভাবে আল্লাহ তা‘আলা সে হিকমত প্রদানর নি‘আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর অন্য স্থানে সাধারণভাবে সকল নবী আ.-এর কথা উল্লেখ করে তাদের হিকমত প্রদানের নি‘আমত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :[১১৫]

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ.

সুতরাং মানব জীবনে হিকমত আল্লাহর মহান এক নি‘আমত। এ ছাড়া এ জীবন চলতে পারে ন। ব্যক্তি, সমাজ, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক সকল দিকের চালিকাশক্তি বা রূহ হলো হিকমত।

উল্লেখ্য, হিকমত শব্দটি আল-কুরআনে ২০ স্থানে এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যায় আরো প্রচুর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি আল্লামা আবু হায়ান স্বীয় তাফসিরে হিকমত সম্পর্কে প্রায় ২৯টি মত উল্লেখ করেছেন।[১১৬] উপরে বর্ণিত মতামতগুলোর পাশাপাশি হিকমতের আরো মন্তব্য লক্ষণীয়। যেমন– হিকমত অর্থ নবুওয়াত, কুরআন বুঝা, দ্বীন বুঝা ও অনুসরণ করা, সুন্নাত, আল্লাহর ভয়, ‘আকল বা বুদ্ধিমত্তা, দ্বীনের ব্যাপারে ‘আকলি দলিল, অহি জ্ঞানের মাধ্যমে ফয়সালা, তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি।[১১৭]

এসব মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এগুলো উপরে বর্ণিত হিকমতের স্বরূপের সঙ্গে মিলে যাবে। নতুন কোনো বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে না। কেননা একজন নবীকে অবশ্যই হিকমতধারী হতে হবে। হিকমতের উপরের স্তর নবুওয়াত। কারণ এ প্রজ্ঞা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে সরাসরি আসে। তেমনিভাবে কুরআনুল কারিম আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ তা‘আলা হাকিম। তাই তাঁর কথাও হিকমতপূর্ণ। এজন্য ইরশাদ হয়েছে :[১১৮] وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ

আর কুরআন যে হিকমত নিয়ে এসেছে, তা বুঝতে সক্ষম হওয়াও হিকমত। কারণ কোনো কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, বুঝে অনুসরণ করতে হলে, সে প্রজ্ঞার প্রয়োজন। তেমনিভাবে মহানবী সা. যেভাবে আল-কুরআনের বাণী বাস্তবায়ন করেছেন, তাকে বলা হয় সুন্নাত। আর এটা নিঃসন্দেহে হিকমত। যেখানে বাস্তবায়ন নীতি হিকমতের স্বরূপের অংশ বিশেষ। তাই সকল নবীর সুন্নাতই ছিলো প্রত্যেকের যুগের জন্য হিকমত। এমনিভাবে যিনি যত আল্লাহ তা‘আলাকে জেনেছেন, সত্যকে চিনেছেন, তিনি ততটুকু আল্লাহভীরু, আনুগত্যকারী। আর জীবনে ও জগতের সে তত্ত্ব ও তথ্য এবং রহস্য জানাও হিকমতের প্রকৃতির অন্তর্গত। তাই দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞানও হিকমতের আওতাভুক্ত। সুতরাং বৈপরিত্য বাহ্যত ও ক্ষেত্র বিশেষে হতে পারে, মৌলিকভাবে নয়।

মোটকথা, উপরোক্ত যে কোনো একটা বিষয় আলাদাভাবে হিকমতের স্বরূপ বহন করে না বা হিকমত প্রত্যয়টি উপরোক্ত বিষয়সমূহের যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত হয়ে যায় না। হিকমতের ধারণাটি আরো ব্যাপক। তার পরিধি আরো বিস্তৃত। এর মূল আরো সুগভীরে।

---

১১৫ ‘আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও হিকমত।’ দ্র. আল-কুরআন, ৩ : ৮১

১১৬ আবু হায়ান, *আল-বাহরুল মুহিত*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২০

১১৭ আল-কুরতুবি, *আল-জামি‘ লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৩৩০

১১৮ ‘হিকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ!’ দ্র. আল-কুরআন, ৩৬ : ২

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল মানুষকে কিছু না কিছু হিকমত দেয়া হয়েছে। কিন্তু সকলকে কিছু না কিছু নবুওয়াত দেয়া হয়নি। সুতরাং হিকমত শব্দটি শুধু নবুওয়াত, কুরআন, সুন্নাহ ইত্যাদির চেয়ে আরো ব্যাপক।

তাই শুধু ঐ গুলোর একটা অর্থ গ্রহণ করলে হিকমতের পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা যাবে না। যথাযথ জ্ঞান, কথা ও কাজে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার প্রজ্হাই হিকমতের মূল কথা। তাই আল-কুরআনের যেখানে হিকমত শব্দটি কিতাবের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এর অর্থ উক্ত কিতাবের বাস্তবায়ন নীতি বা সুন্নাত। আর যেখানে আলাদাভাবে তথা এককভাবে হিকমত উপস্থাপন করা হয়েছে, সেখানে ব্যাপক অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :[১১৯]

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

নবী না হয়েও হাকিম হওয়া যায়। যেমন– হযরত লুকমান আ. সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসিরকারকও বলে থাকেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর জন্য এভাবে দু'আ করেছেন–[১২০]

সুতরাং যথাযথ জ্ঞান, কথা ও কাজে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার প্রজ্ঞাই হিকমতের মূলকথা।

ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত

ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো হিকমত। কিভাবে দা'ওয়াত দিতে হবে আল্লাহ তা'আলা তা বলে দিয়েছেন, বরং সরাসরি আদেশ করেছেন যে, তা হবে হিকমতের সাথে। এ হিকমত দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা নিয়েও প্রচুর মতামত রয়েছে। কারো মতে– আল-কুরআন নিজেই। কারো মতে সুন্নাহ। তবে অধিকাংশের মতে অকাট্য যুক্তি বা কথা, যা মানব অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঢেলে দেয়া হয়। মানুষ কোনো চিন্তা-ভাবনা, দলিল ছাড়াই মেনে নেয়। আর তাদের মতে হিকমত শুধু সত্যান্বেষণের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য প্রযোজ্য। যাদের অন্তরে কোনো অমনোযোগিতা, অবহেলা, ঔদাসীন্যতা অথবা কুটিলতা, বক্রতা কিংবা অহেতুক তর্ক লিপ্স নেই। আর যারা গাফিল তথা অমনোযোগী, উদাসীন তাদেরকে মাউয়িযা হাসানা দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। আর যারা কুটিল ও বক্র হৃদয়ের অধিকারী অহেতুক তর্কে লিপ্ত হয়ে সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না, তাদেরকে মুজাদালা বিল আহসান দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।[১২১]

অতএব উপরোক্ত মতামতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত দু'টি মতে হিকমত অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ। আর এ দু'টি মত অনুসারে বলতে হয় যে, ইসলামি দা'ওয়াত অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক হতে হবে। উভয়টিই দা'ওয়াত ও দা'ওয়াতের পদ্ধতির প্রাথমিক উৎস। কিন্তু দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্রে পদ্ধতির জন্য প্রয়োগ ও ফলিত দিকটি প্রয়োজন। তৃতীয় মতটি নিলে দেখা যাবে হিকমত বলতে এক বিশেষ ধরনের দলিল বা যুক্তি কিংবা তত্ত্ব জ্ঞানের নাম বা সেগুলো নির্ভর কথার নাম। কিন্তু পুর্বোক্ত আলোচনায় হিকমতের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তা দ্বারা যাচাই করলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও হিকমতকে শুধু বিশেষ

১১৯ 'যাকে হিকমত দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।' দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৬৯

১২০ 'হে আল্লাহ! তাঁকে হিকমত শিক্ষা দিন।' দ্র. ইবন হাজার আল-'আসকালানি, *ফাতহুল বারি বিশারহি সাহিহুল বুখারি*(কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত তুরাস, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.), খ.৭, পৃ. ১২৬, হাদিস নং ৩৭৫৬

১২১ ইমাম রাযি, *তাফসিরে কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ১৩৮

জ্ঞান বা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন হবে না। কারণ হিকমতের ধারণাটি কথা ও কাজ উভয়ের মাঝে বিস্তৃত। যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা দা'ওয়াতি প্রচষ্টা, যা আল্লাহর দ্বীন প্রচারে ব্যবহৃত হয়– সকলই দা'ওয়াতি কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত বলতে বুঝা যায় যে, দা'ঈকে পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে সত্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। যা হবে অত্যন্ত প্রজ্ঞা, বুদ্ধিদীপ্ত ও সুকৌশলে। অজ্ঞতা ও মূর্খতাসুলভ আচরণ বা কথাবার্তার মাধ্যমে ইসলামি দা'ওয়াতি কার্যক্রম চলতে পারে না। অন্যদিকে মাউয়িযা হাসানা ও মুযাদালা বিল আহসানকে যদি আলাদা ধরা হয়, তখন এর অর্থ দাড়াবে যে, সেগুলো হিকমতপূর্ণ নয় তথা অজ্ঞতামূলক নির্বোধ সুলভ। আর এ ধরনের কথা কেউই বলবেন না।

মোটকথা হলো– হিকমতের স্বরূপ অনুসারে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও হিকমতের ধারণাটি প্রসারিত। অকাট্য যুক্তি বা তত্ত্ব জ্ঞান হিকমতের অংশ। তেমনি আয়াতে উল্লিখিত মাউয়িযা হাসানা ও মুযাদালা বিল আহসানও হিকমতের অংশ। আয়াতে হিকমতের কথা সাধারণভাবে এনে মানব সমাজে বহুল প্রচলিত দু'টি পন্থায় হিকমত কি হবে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য উভয়টিতে এতদসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কারণ উভয়টির মাঝে উত্তম ও নিকৃষ্ট পন্থা রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে উভয়টিতেই উত্তম পন্থা অবলম্বনই হিকমত। আর তা হলো, সুন্দর সাবলীল কথা এবং নরম ও বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ, সত্যানুসন্ধানী ও নিষ্ঠার সঙ্গে হওয়া। অধিকন্তু বিভিন্ন বক্তব্য অনুসারে মানব সমাজের মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণি বিভাজনটিও প্রমাণ করছে যে, মানুষের সে অবস্থাগুলো বুঝে দা'ওয়াত দিতে হবে। অনন্তর এটাই হিকমতের মূলকথা। যার সঙ্গে নরমভাবে তত্ত্ব ও সত্য জ্ঞান তুলে ধরে স্বাভাবিক কথাবার্তায় দা'ওয়াত দিলে কাজ হবে, সেখানে দা'ঈকে তাই করা হিকমত হবে। সেখানে তার সঙ্গে তিক্ত তর্কে লিপ্ত হওয়া বা কঠোর আচার-আচরণ বা ধমকের সু কথা বলা অহেতুক ও অজ্ঞতা সুলভ, যা হিকমতের চাহিদার পরিপন্থী। যার সঙ্গে মাউয়িযা হাসানা বা মুযাদালা বিল আহসান করতে হবে বা করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হবে, সেখানে তাই করা ইসলামি দা'ওয়াতে হিকমত। যেখানে কঠোরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, এমনকি অস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন, সেখানে তাই করা হিকমত।

অতএব দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের প্রত্যয়টিও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। বরং দা'ওয়াতি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজই হিকমতের আওতাভুক্ত। সব কাজই হিকমতপূর্ণ হতে হবে। এটা ইসলামি দা'ওয়াতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মাউয়িযা হাসানার স্বরূপ

আরবিতে 'মাউয়িযা হাসানা দু'টি শব্দ নিয়ে একটা যৌগিক প্রত্যয় বিশেষ। সুতরাং এতদুভয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করা হলে উদ্দিষ্ট প্রত্যয়টির স্বরূপ নির্ধারণ সহজ হবে। উল্লেখ্য, হাসানা শব্দের অর্থ ভালো, সুন্দর, মাধুর্যমণ্ডিত। আর মাউয়িযা (موعظة) শব্দটি আরবি ওয়ায (وعظ) শব্দ থেকে উৎসারিত। এটা আভিধানিক দিক দিয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

এক. মাউয়িযা অর্থ তাযকির বা স্মরণ করানো। যেমন– আরবরা যখন কাউকে কোনো কিছু স্মরণ করিয়ে দেয় তখন বলে وعظتُ الرجلَ وعظًا موعظةً (ব্যক্তিটিকে ওয়ায করেছি)।[১২২]

---

১২২ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *জামিউল বায়ান 'আন তা'বিলি আয়িল কুরআন*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫ হি.), খ.১, পৃ. ২৬৬

দুই. নসিহতের সুরে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন, যখন বলা হয়, وعظه (সে তাকে ওয়ায করলো) এর অর্থ نصحه وذكره بالعواقب অর্থাৎ তাকে নসিহত করলো এবং কোনো কিছুর পরিণামসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলো।[১২৩]

মুখতারুস সিহাহ নামক আরবি অভিধানে উল্লিখিতি হয়েছে, الوعظ النصح والتذكير بالعواقب। 'ওয়ায হলো– নসিহত এবং কোনো কিছুর পরিণাম স্মরণ করিয়ে দেয়া।'[১২৪]

তিন. সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং এ ব্যাপারে অসিয়াত করা। যথা– লিসানুল আরব নামক গ্রন্থে এসেছে, وعظه أى أمره بالطاعة ووصاه بها 'সে তাকে ওয়ায করলো' এর অর্থ তাকে সৎকাজে আদেশ করলো এবং এ ব্যাপারে অসিয়াত করলো।[১২৫]

চার. ভীতি প্রদর্শন করা। এ মর্মে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবি বলেন, الوعظ التخويف। 'ওয়ায অর্থ ভয় দেখানো।'[১২৬]

উপরোক্ত মাউয়িযার আভিধানিক অর্থের বিভিন্নতার জন্য উলামায়ে কিরাম এর পারিভাষিক অর্থেও বিভিন্ন বক্তব্য ও প্রচুর মন্তব্য করেছেন। নিচে এগুলোর মাঝে বিশেষ কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করা হলো–

১. খলিল নাহভি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : الوعظ التذكير بالخير فيما يرق له القلب 'ওয়ায হলো কল্যাণকর বিষয়ে স্মরণ করানো, যাতে হৃদয় বিগলিত হয়।'[১২৭]

২. রাগিব ইসফাহানির মতে, الوعظ زجر مقترن بتخويف। 'ওয়ায হলো ভীতি প্রদর্শনমূলক ধমক দেয়া তিরস্কারকরণ।'[১২৮] প্রখ্যাত মুফাসসির আলাউদ্দিন বাগদাদিরও এ ধরনের একটা মন্তব্য পাওয়া যায়।[১২৯]

৩. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযির মতে, المْوعظة هى الكلام الذى يفيد الزجر عما لا ينبغى فى الدين। 'মাউয়িযা হলো এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত বিষয় অবলম্বন করলে কাউকে তিরস্কারকরণ বুঝায়।'[১৩০] তাফসিরে খাযিনের গ্রন্থকার থেকেও এ ধরনের একটা মন্তব্য বর্ণিত আছে।[১৩১]

৪. আল্লামা আলুসি বলেন, المْوعظة تذكير ما يلين القلب من الثواب والعقاب 'মাউয়িযা হলো– কোনো কাজের সাওয়াব (ভালো প্রতিদান) বা 'ইকাব (শাস্তির প্রতিবিধান) এর বর্ণনা সমৃদ্ধ স্মরণকরণ বিশেষ যা হৃদয় নরম করে দেয়।'[১৩২]

---

১২৩ আবুল ফদল জামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(কুয়েত : ইসলামি, ওয়াকফ, দা'ওয়াহ্ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, কুয়েত, বিশেষ প্রকাশনা, ১৪৩১ হি., ২০১০ খ্রি.), খ.৮, পৃ. ৪৬৬

১২৪ আবু বকর আর-রাযি, *মুখতারুস সিহাহ*(বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৮৬), পৃ. ৩০৩

১২৫ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৪৪

১২৬ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৪৪

১২৭ আল-কুরতুবি, *তাফসিরে কুরতুবি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৪৪

১২৮ আল্লামা আর-রাগিব আল-ইসফাহানি, *আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন*(মক্কা মুকাররমা : মাকতাবাতু নাজ্জার মুস্তফা আল-বায, ১৯৬১), পৃ. ৬৮৩

১২৯ আলাউদ্দিন বাগদাদি, *তাফসিরে খাযিন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩২০

১৩০ ইমাম রাযি, *তাফসিরে কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ১২

১৩১ আলাউদ্দিন বাগদাদি, *তাফসিরে খাযিন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩০৪

১৩২ আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১২৯

৫. আল্লামা শাওকানির ভাষায়, التذكير بالعواقب سواء كان بالترغيب والترهيب 'ওয়ায মূলত পরিণাম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হতে পারে তা তারগিব (উৎসাহব্যঞ্জক) বা তারহিব (ভীতি প্রদর্শন) মূলক।'[১৩৩]

৬. প্রখ্যাত মুফাসসির রশিদ রিদার মতে, الوعظ النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذى يرق له القلب ويبعث على العمل 'ওয়ায হলো সত্য ও কল্যাণমূলক বিষয়ের স্মরণ করানো ও নসিহত করা এমনভাবে যে, এতে হৃদয়-মন বিগলিত হবে এবং কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।'[১৩৪]

৭. ড. আবুল ফাতাহ আল-বায়ানুনি মাউয়িযাকে নসিহতের সমার্থক বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১৩৫]

৮. ড. 'আলি জারিশার মতে মাউয়িযার মূলতত্ত্ব নসিহতের চেয়ে ভীতি প্রদর্শন ক্রিয়ার মর্মার্থের কাছাকাছি।[১৩৬]

উপরোক্ত বক্তব্য ও মন্তব্যগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির ও দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মাউয়িযা কারো মতে এক ধরনের কথার নাম, যা সাধারণ নয়, বরং ভীতি প্রদর্শনমূলক। যেমন– আল্লামা রাগিব, আর-রাযি, খাযিন প্রমুখ এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর যাকে ড. জারিশা প্রাধান্য দিয়েছেন।

অপরপক্ষে কেউ কেউ একে কল্যাণকর বিষয়ের স্মারক বলে অভিহিত করেছেন। যেমন– আল্লামা খলিল। তবে কল্যাণকর বিষয়ের সুসংবাদ দিলে তার বিপরীত তথা অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বা সতর্কীকরণও হয়ে যায়।

অতএব মাউয়িযা কল্যাণের সুসংবাদ ও ক্ষতিকর সম্পর্কে সতর্কিকরণ, ভীতি প্রদর্শন সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমনটি আল্লামা আলুসি ও শাওকানি মাউয়িযার সংজ্ঞায় ব্যক্ত করেছেন। তবে শুধু নসিহত বললেই মাউয়িযার পূর্ণাঙ্গ অর্থ এসে যাবে না, কারণ সাধারণ কথাবার্তা দ্বারাও নসিহত হয়। এতে উৎসাহিত করণ বা ভীতি প্রদর্শন মনোবৃত্তির প্রয়োজন নাও হতে পারে।

সুতরাং আল্লামা রশিদ রিদা মাউয়িযা সম্পর্কে যে ধারণাটি দিয়েছেন, তাই মোটামুটি সঠিক হওয়ার কাছাকাছি। কারণ আরবিতে মাউয়িযা একটি ব্যাপক ধারণা সম্বলিত প্রত্যয় বিশেষ, যা নসিহত, কল্যাণ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া, ক্ষতিকর সম্পর্কে সতর্ক করা, এমনকি সৎকাজে আদেশ দান, অসৎকাজে নিষেধ করা, এসব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যা অবশ্যই উৎসাহ ব্যঞ্জক, ভীতি প্রদর্শনমূলক হতে হবে।

কুরআন মাজিদে এসব ক'টি অর্থেই মাউয়িযার ব্যবহার পাওয়া যায়। নিচে উদাহরণ স্বরূপ ক'টি আয়াত উল্লেখ করা হলো–

এক. নসিহত অর্থে :[১৩৭]

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى.

---

১৩৩ মুহাম্মদ ইবন 'আলি আশ-শাওকানি, *ফাতহুল কাদির*(বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪২৮ হি.), পৃ. ৪৫৩

১৩৪ মুহাম্মদ রশিদ রিদা, তাফসিরুল মানার(কায়রো : দারুল মানার, ২য় মুদ্রণ, ১৩৬৬ হি.), খ.১, পৃ. ৩০২

১৩৫ ড. মুহাম্মদ আবুল ফাতহ আল-বায়ানুনি, *আল-মাদখাল ইলা 'ইলমিদ দা'ওয়াহ*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১), পৃ. ২৫৮

১৩৬ ড. 'আলি জারিশা, *মানাহিজুদ দা'ওয়াহ ওয়া আসালিবুহা*(আল-মানসুরা : দারুল ওয়াফা, ১৪১৭ হি.), পৃ. ১৫৫

১৩৭ 'বলুন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর নামে এক এক জন করে ও দু দু'জন করে দাড়াও।' দ্র. আল-কুরআন, ৩৪ : ৪৬

দুই. সতর্ককরণ অর্থে :[১৩৮]

ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِه مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

তিন. সতর্কিকরণসহ নসিহত অর্থে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আ.-কে সম্বোধন করে বলেন :[১৩৯]

إِنِّىْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ.

চার. কল্যাণের স্মরণ করানো ও উৎসাহ প্রদানসহ সৎকজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ প্রদান অর্থে :[১৪০]

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِه لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيْتًا.

পাঁচ. ধমক ও ভীতি প্রদর্শনমূরক নসিহত অর্থে :[১৪১]

يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِه أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

মোটকথা, মাউয়িযা একটা ব্যাপক অর্থবোধক আরবি প্রত্যয় বা পরিভাষা, যা এক বিশেষ ধরনের কথা বা আচরণগত ভাব-ব্যঞ্জক শৈলী, যা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। আবেগ সঞ্চার করে, অনুভূতিতে নাড়া দেয়, আর তা নসিহতের মাধ্যমেই হোক, আর স্মরণকারী ক্রিয়ায় হোক বা ভীতি প্রদর্শন কিংবা বিশেষ সুসংবাদ দানের মাধ্যমেই হোক। বিভিন্ন ধরন বা শৈলীতে তা সম্পাদিত হতে পারে।

আর মাউয়িযা কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন– বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত আরবি অভিধানে মাউয়িযার সংজ্ঞায় বলা হয় : 'কথা বা কাজের মাধ্যমে যে ওয়ায করা হয় তাই মাউয়িযা।'[১৪২]

এ প্রেক্ষাপটে উলামায়ে কিরাম একে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. মাউয়িযা নাযারিয়া (ভাব বা দর্শনগত মাউয়িযা) : যা কোনো কথা বা দলিল পেশের মাধ্যমে হয়।
২. মাউয়িযা 'আমালিয়া (কার্যগত মাউয়িযা) : যা কোনো কাজ দেখানোর মাধ্যমে হয়।[১৪৩]

এমনিভাবে মাউয়িযা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক– দু'ভাবেই হতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত কোনো জলসা বা মাহফিলে হলে আনুষ্ঠানিক মাউয়িযা হিসেবে গণ্য হয়। আর হঠাৎ বা স্বভাবত সাক্ষাতে হলে, কিংবা এমনিতে মিলিত হয়ে কেউ মাউয়িযা করলে তা অনানুষ্ঠানিক মাউয়িযা হিসেবে গণ্য হবে।

---

১৩৮ 'এ মর্মে তাকেই সতর্ক করা হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।' দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৩২

১৩৯ 'তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ে যওয়ার ব্যাপারে আমি তোমাকে সতর্ক করছি।' দ্র. আল-কুরআন, ১১ : ৪৬

১৪০ 'যদি তারা তাই করে, যা তাদের বলা হলো, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য কল্যাণকর ও দৃঢ়তার উপলক্ষ হিসেবে প্রতিভাত হতো।' দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ৬৬

১৪১ 'আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও, তবে কখনো পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।' দ্র. আল-কুরআন, ২৪ : ১৭

১৪২ الْموعظة ما يوعظ به من قول أو فعل দ্র. সম্পদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৩

১৪৩ কারি মুহাম্মদ তায়্যিব, অনুঃ মাওঃ মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, *কুরআনের আলোকে দ্বীনি দা'ওয়াতের মূলনীতি*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ৩৫

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাউয়িযা হাসানা

মাউয়িযা শব্দটি কুরআন মাজিদে সর্বমোট ৯টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। সকল স্থানে একে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়। একমাত্র একটা স্থানে একে হাসানা বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। আর তাহলো দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে। যেখানে দা'ওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে মাউয়িযা হাসানা অবলম্বনের জন্য।

সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাউয়িযা হাসানার স্বরূপ নির্ধারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে আল-কুরআনের ভাষ্যকারসহ অনেক ইসলামি চিন্তাবিদগণের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে তাদের বৈচিত্রময় মত রয়েছে। যার ক'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. আল্লামা ইবন জারির তাবারির মতে মাউয়িযা হাসানা হলো– 'চমৎকার ও মাধুর্যমণ্ডিত দৃষ্টান্ত ও শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজের উপর জীবন ও জগত থেকে স্বাভাবিক হিদায়াত নেয়ার দলিল-প্রমাণ স্বরূপ স্বীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো স্মরণও করিয়ে দিয়েছেন। যেমনি সূরা নাহলে বিভিন্ন হুজ্জাত তথা দলিল-প্রমাণ একে একে বর্ণনা করে স্বীয় রাশি রাশি নি'আমত ও নিদর্শনাবলি উল্লেখ করেছেন।'[১৪৪] আল্লামা মুস্তফা মারাগিও একই মত পোষণ করেছেন।[১৪৫]

২. নিযামুদ্দীন নিশাপুরির মতে মাউয়িযা হাসানা হলো– 'ঐসব উৎসাহ ব্যঞ্জক দলিলের সমষ্টি ব্যবহার করা বুঝায়, যা স্বীকৃত অনুসিদ্ধান্তসমূহের দ্বারা প্রত্যয় সৃষ্টি করে।'[১৪৬]

৩. ইমাম রাযির মতে, 'ধারণামূলক প্রতীতির জন্ম দেয় এমন নিদর্শনাবলি ও উৎসাহ ব্যঞ্জক দলিল-প্রমাণাদি হলো মাউয়িযা হাসানা।'[১৪৭]

৪. ইবন কাসিরের মতে, 'যাতে বিভিন্ন ধরনের তিরস্কারকরণ মূলক বিষয় ও মানব গোষ্ঠি সম্পর্কিত ঘটনাবলি বিদ্যমান থাকে, তা-ই মাউয়িযা হাসানা।'[১৪৮]

৫. আল্লামা বাইদাবির মতে, 'মাউয়িযা হাসানা হলো উৎসাহমূলক বক্তৃতামালা ও উপকারি বা কার্যকরী শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক বিষযসমূহ।'[১৪৯]

৬. আল্লামা যামাখশারি ও বাইদাবির কথার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে আল্লামা আলুসি বলেন, 'মাউয়িযা হাসানা হলো উৎসাহমূলক বক্তৃতামালা ও উপকারি শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এমনভাবে উপস্থাপন করা যে, তাদের অর্থাৎ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে।'[১৫০]

৭. আল্লামা নাসাফি মাউয়িযার সংজ্ঞায় আল্লামা যামাখশারির মতেরই অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। তবে তিনি তার সাথে আরো কিছু শব্দ যুক্ত করেন এই বলে যে, 'দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিকে নসিহতের সুরে কল্যাণকামী মনোভাব প্রকাশের পাশাপাশি

---

১৪৪ মুহাম্মদ ইবন জারির তাবারি, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ. ১৩১

১৪৫ মুস্তফা মারাগি, তাফসিরুল মারাগি(দামিশক : দারুল ফিকর, ৩য় সং, ১৩৯৪ হি.), খ.১৪, পৃ. ১৬১

১৪৬ নিযামুদ্দীন নিশাপুরি, *গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি.), খ.৪, পৃ. ৩১৬

১৪৭ ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি, *তাফসিরে কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ৩৮

১৪৮ ইবন কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৯১

১৪৯ কাযি নাসিরুদ্দিন বাইদাবি, *আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তা'বিল*(ইস্তাম্বুল : মাকতাবাতুল হাকিকত, ১৪১৯ হি.), খ.৩, পৃ. ২০৭

১৫০ আল্লামা আলুসি, *তাফসিরে রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ. ৩৫৮

ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসব বা আশান্বিতকরণ এবং সুসংবাদ প্রদানের সাথে সাথে সতর্কও করণ, তাহলেই সেটা হবে মাউয়িযা হাসানা।'[১৫১]

৮. আল্লামা শাওকানির মতে, 'মাউয়িযা হাসানা হলো এক ধরনের এমন বক্তব্য, যা শ্রোতা ভালো মনে করে, আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারি হিসেবেই সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মাধুর্যপূর্ণ।'[১৫২]

৯. ভারতীয় প্রখ্যাত মুফাসসির ছানাউল্লাহ পানিপথির মতে, 'আয়াতে উদ্দিষ্ট মাউয়িযা হাসানা হলো স্বয়ং আল-কুরআন নিজেই, স্বীয় তারগিব ও তারহিব (উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন) করণের মাধ্যমে।'[১৫৩] আল্লামা যামাখশারিও এ মতটির যথার্থতা স্বীকার করেছেন।[১৫৪]

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে কয়েকটি দিক স্পষ্ট হয়ে যায় :

ক. অধিকাংশই সাধারণ মাউয়িযার সংজ্ঞাকে মাউয়িযা হাসানার স্বরূপের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

খ. কারো কারো মতে মাউয়িযা একমাত্র নসিহতেরই সমার্থক। তবে নসিহত সম্পাদনের প্রক্রিয়া তথা তা উপস্থাপনার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, সেটা তখন হাসানা হবে, যখন তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বক্তার কল্যাণকামীতা বিদিত হবে। যেমন আল্লামা যামাখশারি ও প্রমুখের মত।

গ. কারো কারো মতে তা নসিহত বটে, তবে তাতে তারগিব ও তারহিব ক্রিয়ার সংমিশ্রণ থাকতে হবে। এটা আল্লামা নাসাফির মত।

ঘ. কেউ কেউ মাউয়িযার প্রভাব বা ফলাফলের মানদণ্ডে তাকে বিচার করেছেন। যেমন– আল্লামা শাওকানি। তার মতে– উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সে মাউয়িযাকে হাসানা মনে করে তবেই তা হাসানা, এ মতটিও উপস্থাপনার প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিতবহ।

ঙ. কারো মতে জীবন ও জগতে পরিব্যাপ্ত আল্লাহ প্রদত্ত রাশি রাশি নি'আমত ও নিদর্শন, যার আলোচনা যুক্তিগ্রাহ্য বৈচিত্র্যরূপে কুরআনে এসেছে– এ সবের সমষ্টিই মাউয়িযা হাসানা। যেমন এ মতের প্রবক্তা হলেন– আল্লামা তাবারি, যামাখশারি, ছানাউল্লাহ পানিপথি ও প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনের মাউয়িযা সর্বশ্রেষ্ঠ মাউয়িযা নিঃসন্দেহে। তবে এ মাউয়িযা হাসানার ধারণাটি আরো ব্যাপক। আল-কুরআন, হাদিসে নববী, বিভিন্ন মনীষীগণের বাণী ও তথ্যবহুল ঘটনাবলিতেও মাউয়িযা হাসানার উপকরণ পাওয়া যায়।

চ. অনেকেই মাউয়িযা হাসানাকে গ্রীক তর্ক শাস্ত্রের নিছক ধারণা সৃষ্টিকারী বক্তৃতার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। যেমন আল্লামা নিশাপুরি, আর-রাযি, বাইদাবি, আলুসি প্রমুখের মন্তব্যে লক্ষণীয়।

মূলত মাউয়িযা হাসানার ওয়ায বা বক্তব্য শুধু গ্রীক তর্ক শাস্ত্রের মতো সে ধরনের কোনো কিছু নয়। কেননা মাউয়িযা হাসানা শুধু নিছক ধারণা প্রসূত বিষয়বস্তু নিয়ে হবে বা তা শুধু ধারণামূলক প্রতীতির জন্ম দিবে এমনটি নয়। অকাট্য বিষয় দ্বারাও মাউয়িযা হাসান হতে পারে। যথা আল-কুরআনের মাউয়িযাগুলো শুধু নিছক ধারণা প্রসূত বা শুধু ধারণাই জন্মায়–

---

১৫১ আবুল বারাকাত আন-নাসাফি, *মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকাইকুত তা'বিল*(মক্কা মুকাররমা : মাকতাবাতু নাজ্জার মুস্তফা আল-বায, তা.বি.), পৃ. ৬০২

১৫২ আল্লামা শাওকানি, *ফাতহুল কাদির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭

১৫৩ কাযি ছানাউল্লাহ পানিপথি, *তাফসিরে মাযহারি*(বৈরুত : দারু ইহয়াতুত তুরাসিল আরাবি, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫ হি.), খ.৫, পৃ. ২৪৫

১৫৪ আল্লামা যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩৫

এমনটি বলা যাবে না। বরং আল-কুরআনে যা এসেছে, তা আল্লাহর বাণী, যা অকাট্য সত্য এবং শাশ্বত-সুন্দর।

প্রকৃতপক্ষে মাউয়িযা প্রত্যয়টি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হাসানা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও ভালো হয় অন্য কারণে। কেননা দা'ওয়াতের ঐ আয়াতে মাউয়িযা বিষয়টি বিশেষিত করা হয়েছে হাসানা দ্বারা। মাউয়িযা হাসানা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত এর উপস্থাপনা ও উদ্দিষ্ট বিষয়াবলির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মাধ্যমে। উপস্থাপনা যতো সুন্দর হবে, এর বিষয়বস্তু যতো হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিযুক্ত হবে, ততোই তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা গ্রহণে প্রভাবিত করবে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। অন্যথায় মাউয়িযা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ অনেক সত্যকথা, ভালো কথা একমাত্র উপস্থাপনাগত ত্রুটির জন্য মানুষ তা শুনতে আগ্রহী হয় না। সাথে সাথে অনেক সাদা মাটা কথাও উপস্থাপন আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে মানুষ অত্যন্ত মনোযোগ ও উপভোগ্য হিসেবে শ্রবণ করে থাকে।

তাছাড়া, যা মানব জীবনে কল্যাণ আনতে পারে না তথা ক্ষতিকর, তা চাকুর্য ও বাগ্মিতায় যতো ভালোভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেনো, তার প্রভাব স্থায়ী হতে পারে না। একদিন না একদিন তার আসল স্বরূপ মানুষের নিকট বিদিত হবে। এভাবে এর যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলবে এবং সত্য উদয় হবে। তখন তা মানব সমাজে নিন্দিত হবে।

সুতরাং মাউয়িযা হাসানা হবে উপস্থাপনার সৌন্দর্য ও বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা ও যথার্থতার মাধ্যমে। অন্যথায় তা হবে মাউয়িযা সাইয়িয়াহ বা মন্দ ওয়ায। যা সাময়িকভাবে হৃদয় কোঠরে আবেদন সৃষ্টি করলেও কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাউয়িযা হাসানার অনুমতি দেয়া হয়। এর বিপরীতে সাইয়িয়াহর অনুমতি দেয়া হয় না।

অতএব মাউয়িযা বিষয়টি হাসানা হওয়ার জন্য তার বিষয়বস্তু ও প্রয়োগের ধরনের সাথে সম্পর্কিত বেশি। এতে কিছু মূলনীতি আছে যা মাউয়িযাকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, হিকমতপূর্ণ ও যথার্থ করে, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে এবং কার্যকর প্রভাব ফেলে।

মুজাদালার স্বরূপ

আরবি মুজাদালা (مجادلة) শব্দটি জাদল (جدل) থেকে উৎসারিত। جدل এর উৎপত্তিগত অর্থ পাকানো, শক্ত হওয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা, বাক-বিতণ্ডায় জয়ী হওয়া ইত্যাদি। এজন্য আরবিতে চামড়া, পশম দ্বারা পাকানো রশিকে জাদিল (جديل) বলা হয়।[১৫৫] শক্ত মাটিকে জাদালাহ (جدالة) বলা হয়।[১৫৬] যখন কোনো শিশু বা হরিণ শাবক শক্ত হয়ে স্বীয় মাকে হাটার অনুসরণ করে, তখন বলা হয় جدل الغلام وولد الظبية.[১৫৭] আরবিতে যখন বলা হয় جدل الرجل এর অর্থ صرعه وغلبه (লড়াই করেছে, বিজয়ী) অথবা اشتدت خصومته। (তার ঝগড়া-বিবাদ প্রকট আকার ধারণ করেছে)।[১৫৮]

১৫৫ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১৫৬ মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ১০৩
১৫৭ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১৫৮ ইমাম আর-রাযি, *তাফসিরুল কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.২৮, পৃ. ৯৬

সুতরাং উৎপত্তিগত এ সকল অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই মুজাদালা শব্দটি পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা, তর্কে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় জাদাল (جدل) শব্দটাও এর সম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইলমে মুনাযারা বা তর্ক শাস্ত্রের পরিভাষায় মুজাদালা শব্দের অর্থ বর্ণনায় এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

এক. ইবন সিনার মতে,[১৫৯]

"هى مخالفة تبغى إلزام الخصم بطريق مقبول محمود بين الجمهور".

'মুজাদালা হলো সর্ব সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য নন্দিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিরোধিতাকরণ বিশেষ, যাতে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার প্রেষণা নিহিত থাকে।'

দুই. শরিফ জুরজানির মতে,

"الجدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار الْمذاهب وتقريرها".

'বিভিন্ন মতবাদের পরস্পরকে প্রাধান্য দেয়া ও ব্যাখ্যা করা প্রসঙ্গে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাকে জাদাল বলা হয়।'[১৬০] তিনি আরো বলেন,

"الجدل هو القياس الْمؤلف من الْمشهورات والْمسلمات، والغرض منه إلزام الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان، دفع الْمرء خصمه عن فساد قوله، بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة فى الحقيقة".

'জাদাল হলো প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত হেতু বাক্য-এর মাধ্যমে কিয়াস।[১৬১] যার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করা, প্রতিষ্ঠিত যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ প্রতিপক্ষের অযোগ্যতা প্রকাশ করণ, কোনো প্রমাণ বা প্রমাণতুল্য সংশয়ী বিষয়ের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের মতের অসারতা তুলে ধরা অথবা যার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষের মতকে সংশোধন করা। আর এটা মূলত এক প্রকার ঝগড়াই বটে।'[১৬২]

তিন. প্রসিদ্ধ আরবি অভিধান আল-মু'জামুল ওয়াসিতের সম্পাদনা পরিষদের স্থিরকৃত মতে,

"هى الْمناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم".

'মুজাদালা হলো মুনাযারা (যুক্তিতর্ক), যা সঠিক বিষয়কে বিজয়ী করার জন্য নয় বরং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সংগঠিত হয়।'[১৬৩]

চার. আবুল বাকা বলেন,

"الجدل هو عبارة عن دفع الْمرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره".

---

১৫৯ ইবন সিনা, *আশ-শাফি : কিতাবুল জাদাল*(কায়রো : মাকাতাবাতুল মাতাবি'ইল আমিরিয়া, ১৩৮৬ হি.), খ.১, পৃ. ২৩

১৬০ 'আলি ইবন মুহাম্মদ আল-জুরজানি, *কিতাবুত তা'রিফাত*(বৈরুত : দারুদ দায়ান লিততুরাস, ১৪০৩ হি.), পৃ. ১০১-১০২

১৬১ 'হেতু বাক্য হলো একটা যুক্তি দাড় করানোর স্তর বা ভিত্তি। যেমন প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তু নশ্বর, জগৎ পরিবর্তনশীল, তাই জগৎ নশ্বর। এখানের প্রথম দু'টি বাক্যকে বলা হয় হেতু বাক্য।' দ্র. আল-জুরজানি, *কিতাবুত তা'রিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

১৬২ আল-জুরজানি, *কিতাবুত তা'রিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

১৬৩ গাউসুল ইসলাম সিদ্দিকি, *শারহুশ শরিফিয়া-মুনাযারা রশিদিয়া*(দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবি, তা.বি.), পৃ. ১২

'জাদাল হলো কোনো ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপক্ষকে মুকাবিলা করা বুঝায়, যাতে প্রমাণ বা প্রমাণ সাদৃশ্য সংশয়ী বিষয় দ্বারা সে প্রতিপক্ষের মত বাতিল করা হয়। আর এটা অন্যের সাথে ঝগড়া বিবাদ ছাড়া হয় না।'[১৬৪]

পাঁচ. ফুয়ুমি বলেন, ."هى مقابلة الأدلة لظهور أرجحها" 'তাহলো প্রমাণাদির পরস্পরে মুকাবিলাকরণ, যাতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিষয়টি বের হয়ে আসে।'[১৬৫]

ছয়. ড. মান্না খলিল আল-কাত্তান-এর মতে, "هى المْفاوضة على سبيل المْنازعة والمْغالبة لإلزام الخصم". 'প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার করার লক্ষ্যে পরাস্ত করার মনোবৃত্তি ও বিরোধমূলক মত বিনিময়।'[১৬৬]

সাত. ড. সাইয়িদ রিযক তাবিল বলেন,

"الجدل هو الحوار وتبادل الأدلة والبراهين بين الأطراف دعما لِما يراه كل منهما من فكر وما يعتقده من رأي".

'বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও প্রতীত মত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী পক্ষসমূহের পরস্পরে দলিল-প্রমাণাদি বিনিময় এবং সংলাপকে জাদাল বলা হয়।'[১৬৭]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে :

(ক) মুজাদালা একটা কলহমূলক তর্কাতর্কি। কিন্তু তা মানব সমাজে কাম্য নয়। এতে একটা নেতিবাচক দিক ফুটে উঠেছে। অথচ মুজাদালা করার জন্য আল-কুরআনে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ অর্থাৎ তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা করুন।[১৬৮] অন্য আয়াতে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে :

وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ.

'তোমরা আহলি কিতাবের সাথে সর্বোত্তম পন্থা ব্যতীত অন্য পন্থায় মুজাদালা করো না।'[১৬৯]

সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারণ করলে তা আল-কুরআনের নির্দেশনার সাথে বৈপরিত্য দেখা দিবে। অতএব মুজাদালার শাব্দিক অর্থ যাই হোক, তাকে কলহের সাথে নির্দিষ্ট করা বা বিশেষিত করা যথাযথ নয়। মতবিরোধ হতেই পারে। তাই বলে এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে হবে এমনটা নয়। কলহ না করেও যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে মুজাদালা হতে পারে।

(খ) যেভাবেই হোক মুজাদালায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে না পারলে যে কোনো পক্ষই ঘায়েল হতে পারে।

(গ) সত্য নিয়ে হোক, আর মিথ্যা নিয়ে হোক, এটাতে বিতর্ককারী উভয় পক্ষের মতকে উভয়ে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াস থাকতে পারে। এ জন্য দেখা যায়, মিথ্যা বা বাতিল নিয়ে

---

১৬৪ আবুল বাকা, *কিতাবুল কুল্লিয়াত*(কায়রো : বুলাক, ১৩৮১ হি.), পৃ. ১৪৫

১৬৫ আল-ফুয়ুমি, *আল-মিসবাহুল মুনির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

১৬৬ ড. মান্না খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফি 'উলূমিল কুরআন*(কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৩০৯

১৬৭ ড. সাইয়িদ রিযক তাবিল, *আদ-দা'ওয়াতু ফিল ইসলাম*(মক্কা আল-মুকাররমা : রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামি, ১৪০৪ হি.), পৃ. ৯৯

১৬৮ আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫

১৬৯ আল-কুরআন, ২৯ : ৪৬

যারা তর্কে লিপ্ত হতো, তাদের সে কাজটাকেও আল-কুরআনে মুজাদালা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ.

'আর কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।'[১৭০]

অতএব কেউ কেউ শুধু ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে মুজাদালা হওয়ার যে মতামত দিয়েছেন, তারা মুজাদালা ও মুনাযারার মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এভাবে যে, মুনাযারার উদ্দেশ্য সঠিককে প্রতিষ্ঠিত করা। আর মুজাদালার উদ্দেশ্য শুধু ঘায়েল করা। এতে সঠিক বিষয় প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য নয়।[১৭১] সুতরাং এ মন্তব্য যথাযথ নয়। বরং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পাশাপাশি সঠিক ও সত্য প্রকাশ করাও মুজাদালার উদ্দেশ্য হতে পারে।

(ঘ) কারো মতে জননন্দিত পদ্ধতিতে মুজাদালা হতে হবে। যেমন ইবন সিনার মত। আবার কারো মতে, যুক্তি প্রদর্শনের ভিত্তি-স্তর বা হেতু বাক্যগুলো সর্ব সাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ বা বহুল প্রচলিত হওয়া উচিৎ। অন্ততপক্ষে বিতর্ককারীদের নিকট স্বীকৃত হওয়া কাম্য। যেমন আল-জুরজানির অভিমত।

(ঙ) সরাসরি যুক্তি না থাকলেও যুকি সাদৃশ্য তথা প্রতিপক্ষের যুক্তিতে সংশয় সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহও মুজাদালায় ব্যবহার করা যাবে।

(চ) কারো কারো সংজ্ঞায় কিছু কিছু অস্পষ্টতাও লক্ষণীয়। যেমন ইবন সিনার নন্দিত পদ্ধতির কোনো মানদণ্ড ফুটে উঠেনি। এছাড়া তাতে বিরোধিতার ধরন– কথা না কাজে, তা স্পষ্ট নয়।

(ছ) কারো কারো সংজ্ঞায় দেখা গেছে তাতে শুধু দলিলাদির পরস্পরে মুকাবিলা বুঝায়। যেমন ফায়ুমির সংজ্হায়। কিন্তু অন্যদের সংজ্ঞায় সংলাপ বা কথোপকথনের কথা বলা হয়েছে। এটাই যথার্থ। কারণ দলিল প্রমাণের মুকাবিলা একক ব্যক্তির গবেষণাতেও হতে পারে। তখন তা মুজাদালা হবে না। একাধিক পক্ষের মাঝে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংলাপে বা ভাব বিনিময় হলেই বরং তা মুজাদালার রূপ নিবে।

এমনিভাবে এক পক্ষ যুক্তি, অপর পক্ষ যুক্তি ব্যতীত স্বীয় মতে অটল থাকার ঘোষণা দিলে এ দ্বিতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে মুজাদালা বলা হবে না। অথবা উভয় পক্ষ যুক্তি না দিয়ে বাক-বিতণ্ডা শুরু করলেও তা মুজাদালা হবে না। বরং তা হবে মুকারাবাহ (مكاربة) বা দম্ভ ও অহমিকা প্রদর্শন।[১৭২]

(জ) উপরোক্ত দিকসমূহ বিবেচনা করলে ড. রিযক তাবিলের সংজ্ঞাটা অধিক প্রামাণ্য ও গোছানো বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ এতে পক্ষ-বিপক্ষ, যুক্তি প্রদর্শন, প্রত্যেকের মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইত্যাদি উপকরণগুলো যা মুজাদালার উপাদান হিসেবে নেয়া যায়, তার অধিকাংশগুলোই তাতে রয়েছে।

পরিশেষে মুজাদালার একটা সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করা যায় যে, এটা হলো 'দু'পক্ষ বা ততোধিক পক্ষের পরস্পরের মত খণ্ডন করার অভিপ্রায় যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনমূলক মত বিনিময়।' বর্তমান আঙ্গিকে সেমিনার বা আলোচনা সভায় কোনো কোনো সময় মুজাদালার

---

১৭০ আল-কুরআন, ১৮ : ৫৬

১৭১ গাউসুল ইসলাম সিদ্দিকি, *শারহুশ শরিফিয়া-মুনাযারা রশিদিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯, ১২

১৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

রূপ নিতে পারে। তবে তর্কে না গিয়েও ব্যাখ্যা বা সংযোজনমূলক আলোচনাও হতে পারে। তাই সেমিনারের আলোচনা মুজাদালার চেয়ে ব্যাপক। বরং মত বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মত্যনৈক্যে যুক্তি প্রদর্শন ও খণ্ডনে লিপ্ত দু' বা ততোধিক পক্ষের মাঝেই মুজাদালা সংগঠিত হওয়া স্বাভাবিক।

ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা

ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মুজাদালা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– 'সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে মুজাদালা করুন।' অতএব এ দা'ওয়াতি ক্ষেত্রে মুজাদালাকে সীমিত করা হয়েছে যে, তা হবে 'সর্বোত্তম পন্থায়'।

এ সর্বোত্তমভাবে হওয়ার বিষয়টা ব্যাপক। এটা কি কথা দ্বারা, না কাজে তা বলা হয়ীন। আরবি بالتى এর موصولة (সংযুক্ত শব্দ) উহ্য রয়েছে। এজন্য মুফাসসিরগণের মাঝে এ ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য পাওয়া যায়। কারো মতে এখানে উহ্য হলো– الكلمة বা কথা।[১৭৩] অপরদিকে অধিকাংশের মতে এখানে উহ্য হলো الطريقة বা পন্থা, অর্থাৎ الطريقة التى هى أحسن সর্বোত্তম পন্থায়।[১৭৪]

এতদুভয়ের মাঝে দ্বিতীয় মতটিই অধিক প্রামাণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা তরিকা বা পন্থা অর্থ নিলে কথা ও কাজ উভয়কেই এর আওতাভুক্ত করা হয়। কেননা কোনো আচরণের যেমন পন্থা রয়েছে, তেমনি কথারও পন্থা রয়েছে। এজন্য কথার মাধ্যমে মুজাদালায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :[১৭৫]

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّه وَلِىٌّ حَمِيْمٌ. وَمَا يُلَقَّهَا إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقَّهَا إِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ.

অতএব দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার সাথে উহ্য অংশটি হলো 'সর্বোত্তম পন্থা'। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থার স্বরূপ নির্ধারণেও কোনো মন্তব্য করার পূর্বে যেহেতু এটা একটা আয়াতাংশকে কেন্দ্র করে, সেহেতু এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় মন্তব্য লক্ষণীয়। এখানে তাদের কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো :

এক. প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত মুজাহিদ রহ.-এর মতে এর অর্থ– 'দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে দা'ঈর জন্য যা কষ্টদায়ক হয়, তা এড়িয়ে যাওয়া।'[১৭৬]

আল্লামা তাবারিও এ ধরনের মত পোষণ করে وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ এর ব্যাখ্যায় বলেন– 'তাদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করুন এমন পন্থায় যা অন্য পন্থার চেয়ে উত্তম। এভাবে যে, তারা আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।'[১৭৭]

---

১৭৩ আল্লামা ইবন কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৫

১৭৪ ইমাম আর-রাযি, *তাফসিরুল কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ১৯, ২২৮

১৭৫ 'ভালো ও মন্দ সমান নয়। যা সবচেয়ে ভালো-সুন্দর তা দ্বারাই মুকাবিলা করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লঅভ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।' দ্র. আল-কুরআন, ৪১ : ৩৪-৩৫

১৭৬ মুহাম্মদ ইবন জারির, *তাফসিরে তাবারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ. ১৩১

১৭৭ প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ. ১৩১

দুই. আল্লামা যামাখশারি বলেন– ‘মুজাদালার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থায় যেমন প্রীতিসুলভ ও নরম মেজাজে মুজাদালা করা, এতে কর্কশ ও তিরস্কার ভাব না দেখানো।’[১৭৮] আল্লামা আলঅউদ্দিন বাগদাদিও একই মত পোষণ করেছেন।[১৭৯]

তিন. ইমাম আর-রাযি বলেন– ‘যে সকল দলিল উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষের ঘায়েল করা, আর যাকে বলা হয় জাদাল, তা দু’ ধরনের। প্রথম প্রকারের জাদাল হলো, যার দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বসাধারণ কিংবা বক্তার কাছে স্বীকৃত ‘হেত বাক্য’-এর উপর, তাহলে এর দ্বারা জাদাল হবে সর্বোত্তম পন্থায়। আর দ্বিতীয় প্রকার জাদাল হলো যার দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রান্ত ‘হেতুবাক্যসমূহের’ উপর, যেগুলো এর প্রবক্তা নিজেই শ্রোতাদের মাঝে প্রচারণার চেষ্টা চালায় অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা, অশান্ত, ভ্রান্ত, কূট-কৌশল ও নষ্ট পন্থায়। আর এ ধরনের জাদাল করা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে শোভনীয় নয়। তাদের জন্য শোভনীয় প্রথম প্রকারের জাদাল করা। আর আল্লাহর বাণী– ‘তাদের সাথে সর্বোত্তমভাবে মুজাদালা কর’ দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই।[১৮০] আল্লামা নিযামুদ্দিন নিশাপুরি এ মতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।’[১৮১]

চার. আবুল বারাকাত আন-নাসাফির মতে– ‘এটা এমন পন্থায় যা হলো মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থা, যা প্রীতি, সৌহার্দ্যসুলভ ও নরম মেজাজে সম্পাদিত হয়। কর্কশ মেজাজে নয়, অথবা যার দ্বারা হৃদয় জেগে উঠে, অন্তরাত্মা বিগলিত হয়, জ্ঞান চক্ষু উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।’[১৮২]

পাঁচ. ইবন কাসির বলেন– ‘যাদের সাথে মুনাযারা ও মুজাদালা করা প্রয়োজন হয়, তাদের সাথে তা করতে হবে উত্তমভাবে, প্রীতি, সৌহার্দ্য, নরম মেজাজ ও সুভাষণে।’[১৮৩]

ছয়. কাযি বাইদাবি কিছু সমন্বয় সাধনমূলক মন্তব্য করে বলেন– ‘এক গুঁয়েমিভাবে সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে মুজাদালা করুন এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থায়। যাতে প্রীতি, সৌহার্দ্য, নরম মেজাজ, সহজতর যুক্তি ও সুপ্রসিদ্ধ হেতুবাক্যসমূহের প্রাধান্য এ ধরনের দিক বিদ্যমান থাকে। কেননা এতে তাদের তপ্ত লেলিহান শিখা ঠাণ্ডা করা ও তাদের অশান্ত, উত্তেজিত ভাব প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে উপকার রয়েছে।’[১৮৪] আল্লামা আলুসিও উক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যায় প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন।[১৮৫]

সাত. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথির মতে– ‘এটা সেই ধরনের মুনাযারা বা যুক্তিতর্ক, যাতে প্রবৃত্তির সীমালংঘন বা শয়তানের কুমন্ত্রণামূলক কিছু স্থান পায় না, বরং যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর বাণীকে বিজয়ী করা।’[১৮৬]

উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

(ক) সকলের বক্তব্যে মূলত কোনো বৈপরিত্য নেই। বরং একটা আরেকটার পরিপূরক হিসেবে গণ্য করই শ্রেয়। তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে শুধু যুক্তি-কৌশল সত্যস্বীকৃত

---

১৭৮ আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩৫
১৭৯ আলাউদ্দিন বাগদাদি, *তাফসিরে খাযিন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৫১
১৮০ ইমাম আর-রাযি, *তাফসিরুল কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ. ১৩৮
১৮১ নিযামুদ্দিন নিশাপুরি, *তাফসিরু গারিবুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩০৬
১৮২ নাসাফি, *তাফসিরে নাসাফি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬০২
১৮৩ ইবন কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৯১
১৮৪ কাযি বাইদাবি, *তাফসিরে বাইদাবি*, খ.৩, পৃ. ২০৬
১৮৫ আল্লামা আলুসি, *তাফসিরে রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ. ২৫৪
১৮৬ কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি, *তাফসিরে মাযহারি*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৪৫

হেতুবাক্যসমূহ ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে যতই নেতিবাচক ও আপত্তিকর তথা কষ্টদায়ক আচার-আচরণ করা হোক না কেনো হকের দা'ঈকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজেকে সংযত রেখে অতীব প্রীতি, সৌহার্দ্য ভাব নিয়ে নরম মেজাজে সুভাষণে প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কর্কশ ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আঘাত হানে এমন কিছু করা যাবে না। আর এগুলো এজন্য যে, যাতে যুক্তিগত আক্রমণ বা পরাজয়ের গ্লানির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দা'ঈর আচার-আচরণে সে যেন মোহিত থাকে। হৃদয়-অন্তর বিগলিত হয়। জ্ঞান চক্ষু খুলে যায়। সত্য অনুধাবন করতে পারে। তা মেনে নিতে যত বাধা-প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর হয়ে যায়। দা'ঈর প্রতি সব রকম আক্রোশ প্রশমিত হয়।

(খ) কারো মতে মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থাটি হলো বিশেষ ধরনের দলিলের পন্থা, যা স্বীকৃত হেতুবাক্যসমূহের উপর নির্ভর করে পরিচালিত। কারো মতে সে পন্থাটি হলো আচরণের পন্থা নির্ভর। কারো মতে উভয়টিই। শ্রেষ্ঠ হেতুবাক্য ও শ্রেষ্ঠ আচরণ উভয়ের সমন্বিত পন্থাই এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর পন্থা। শুধু ভালো যুক্তি প্রদর্শন করলেই মানুষ কোনো কিছু মেনে নিতে চায় না। কারণ তার অন্তরে বিভিন্ন রকমের অহম বিতর্ক বিষয় মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। সেখানে অন্তর স্পর্শ করে এমন আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে যখন প্রতিপক্ষের হৃদয় আকর্ষণ করা যায়, তখন প্রতিপক্ষকে তুষ্ট করা সহজ হয় এবং উদ্ভাসিত সত্য মেনে নেয়। এটা যেমন তিক্ত ঔষধের সাথে মিষ্টি মেশানোর মতো।

(গ) কারো মতে একমাত্র এক গুঁয়েমিভাবে সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেই মুজাদালা হওয়া উচিত। তাদের মতে ওয়ায-নসিহত তাদের ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না। বরং ঘায়েল করা যুক্তি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে। যেন তাদের অহম ও দেমাগ দেখানো ভাব প্রশমিত হয়। যেমন– বাইদাবি ও আলুসির অভিমত। কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা তর্কপ্রিয় ঠিকই, কিন্তু তাদের অহংকারী এক গুঁয়েমি ভাব নেই। অপরদিকে এমন অনেক সত্য অস্বীকারকারী এক গুঁয়েমি ভাবের লোক আছে বটে, কিন্তু তারা তর্কে লিপ্ত হতে চায় না। সুতরাং এক গুঁয়েমির কথা না বলে বরং যারা তর্ক করতে চায় তাদেরকে ঘায়েল করা এবং পরিস্থিতি যখন দা'ঈকে বাধ্য করে তখন সকলের সাথে যুক্তি প্রদর্শন করা যাবে– এভাবে বলাই শ্রেয়। অতএব এ ব্যাপারে আল্লামা ইবন কাসিরের মতটি অধিক প্রামাণ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

(ঘ) কেউ কেউ দলিল-প্রমাণের হেতুবাক্যসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, এসব হেতুবাক্য যদি গ্রীক তর্ক শাস্ত্রের জটিল পদ্ধতিতে হয়, তবে কুরআন নির্দেশিত এ মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থা নির্বাচনে তা পরিত্যাজ্য। আল-কুরআনের সাথে কিছু সাদৃশ্য াকলেও গ্রীকদের দার্শনিক তর্ক কৌশলেও হেতুবাক্যসমূহ মূলত কিয়াস বা আরোহ পদ্দতিতে নির্ণীত। আর এ আরোহ পদ্ধতি কার্যত কুল্লি বা সার্বিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা সকল যুজ বা অংশকে তুল্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় উপসস্থাপন করা হয়, যা অদৃশ্য জগতের। তার সাদৃশ্য খুঁজে কিয়াস করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহর গুণাবলি, ফেরেশতাগণের বৈশিষ্ট্য, নূহ আ.-এর প্লাবন ও ইবরাহিম আ.-এর অগ্নির ঘটনা। আর আরোহ পদ্ধতি ছাড়াও ইলমে ইয়াকিন বা অকাট্য জ্ঞান লাভ করার আরো প্রক্রিয়া রয়েছে। যখন ইসতিকরা বা অবরোহ পদ্ধতি

অসংখ্য মাধ্যম পরম্পরায় প্রাপ্ত সংবাদ, অহি জ্ঞান ইত্যাদি। এজন্য আসমান-যমিনে যা কিছু আছে আল-কুরআন তা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে অবরোহ ও আরোহের সংমিশ্রণে যুক্তি প্রদর্শন করেছে। যেমন গ্রকি দর্শনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হেতুবাক্য ধরা হয়েছে– 'বস্তু নিজেই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে না, বরং তার একটা কারণ থাকতে হয়।' এটাই কার্যকারণ তত্ত্ব। এটা একটা কাল।পনিক বিষয় মাত্র। কিন্তু আল-কুরআনে তা ব্যাখ্যা করার জন্য মানব সমাজের সম্মুখে সাধারণভাবে দৃশ্যমান বস্তু ও বিষয় ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহর বাণীতে রয়েছে :

أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ. أَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ.

'তারা কি আপনা-আপনি সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।'[১৮৭]

অতএব আধুনিক যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতিতে শুধু কাল্পনিকতার আশ্রয় নেয়া হয়নি। বরং বাস্তবে দৃশ্যমান বস্তুও সুসমন্বিত করে উপস্থাপিত হয়। আল-কুরআনের এ ধরনের পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ-সরল, সাবলিল ও ফলিত। এটাই উত্তম পদ্ধতি ও কার্যকর। তাই এটাই দা'ঈর জন্য সর্বোত্তম পন্থা। তাই বলে এমন নয় যে, মুসলিম তার্কিকগণ যুক্তি-তর্কে মুকাদ্দমা বা হেতুবাক্যসমূহ এবং বিতর্কে সিদ্ধান্তকরণের আশ্রয় নিবেন না। অবশ্যই নিবেন। তবে তার ধরন হওয়া উচিত কুরআনিক ভাবে। ভাব-ব্যঞ্জনায় কোনো ত্রুটি ছাড়াই আল-কুরআনে মানুষকে হিদায়াত করার লক্ষ্যে বৈচিত্রময় বাকরীতি অনুসরণ করা হয়। যাতে ভাব অর্থের গভীরত্ব, সুতীক্ষ্ণ রূপায়ণ, অত্যন্ত সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন ইত্যাদি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য আকারে সমাহার ঘটানো হয়েছে। এমনকি আল্লামা সুয়ুতি উল্লেখ করেন, ইসলামি তার্কিকগণ সূরা হজ্জের প্রথম দিকে কয়েকটি আয়াত থেকে তার্কিক পদ্ধতিতে ধশটি মুকাদ্দমা ও পাঁচটি সিদ্ধান্ত বের করেছেন।[১৮৮]

(ঙ) কেউ কেউ বিতর্কের হেতুবাক্যসমূহ অন্তত প্রতিপক্ষের কাছে স্বীকৃত হলেও তা সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারণে ব্যবহারের কথা বলেছেন। যেমন আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি ও নিশাপুরির অভিমত। কিন্তু যে হেতুবাক্যসমূহ সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর নয়, এ ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করার অনুমতি নেই। একমাত্র প্রতিপক্ষের কথার স্ববিরোধিতা তুলে ধরার ক্ষেত্রেই তার নিকট স্বীকৃত হেতুবাক্য ব্যবহার করা যাবে।

মোটকথা, মুজাদালা বিল্লাতি হিয়া আহসান বা সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা বলতে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন বুঝায়। সর্বোত্তম বলতে গেলে তিন ধরনের পন্থা বের হয়ে আসে। প্রথমত: যা উত্তম নয় বা মন্দ, দ্বিতীয়ত: উত্তম, তৃতীয়ত: সর্বোত্তম। মন্দ মুজাদালা হলো যা খারাপ উদ্দেশ্য তথা মিথ্যা প্রতিষ্ঠা কিংবা তর্কের জন্য তর্ক এবং খারাপ পন্থায় করা হয়। উত্তম পন্থা বলতে যা ভালো উদ্দেশ্য তথা সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং ভালো যুক্তি প্রদর্শন করা হয় বটে, কিন্তু যুক্তি উপস্থাপনের পদ্দতি ও আচার-আচরণ ভালো নয়। সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ভালো উদ্দেশ্য ও যুক্তিসহ উপস্থাপন ও আচার-আচরণ তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে চমৎকার পন্থা অবলম্বন। যাতে উভয় পক্ষের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থেকে বিতর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর্যায়ে পৌছা সম্ভব হয়। অন্তত প্রতিপক্ষের তুলনায় কোনোভাবেই যেন অসুন্দর না হয়। তবে

---

১৮৭ আল-কুরআন, ৫২ : ৩৫-৩৬

১৮৮ আল্লামা জালালুদ্দিন আস সুয়ূতী, *আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৩৫-১৩৬

হবে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। তাহলেই তা হবে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা। প্রকৃতপক্ষে এটা প্রয়োগের কিছু মূলনীতি রয়েছে। যা মুজাদালাকে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যায়। তা অবলম্বন করলেই একমাত্র সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা হতে পারে।

উল্লিখিত হিকমত, মাউয়িযা হাসানা ও মুজাদালা বিল আহসানের আলোকে ইসলামি দা'ওয়াতের মৌলিক কিছু পদ্ধতি পরিস্কার হয়ে যায়। যেগুলো নিম্নরূপ :[১৮৯]

১. দা'ওয়াত দেয়ার উদ্দিষ্ট বিষয়টি দা'ঈ নিজ কর্মে প্রতিফলন ঘটানো।
২. দা'ওয়াতের উপকরণের মূল্যায়ন করা।
৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকা।
৪. দা'ওয়াতের পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
৫. মূল সমস্যা নিরূপণ করা।
৬. দা'ওয়াতের সময় নির্বাচন করা।
৭. দা'ওয়াতের উদ্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে পরিচয় ও আপনকরণ করা।
৮. প্রাথমিক পর্যায়ে দা'ওয়াতি মিশন গোপন রাখা।
৯. সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।
১০. দা'ওয়াতের ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করা।
১১. সমসাময়িক যুগ সমস্যা ও ঘটনাবলি তুলে ধরা।
১২. স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশ বিবেচনা করে দা'ওয়াত দেয়া।
১৩. টার্গেটকৃত মাদ'উর সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করা।
১৪. অবস্থা ভেদে গোপনীয় ও প্রকাশ্যভাবে দা'ওয়াত দেয়া।
১৫. সত্য ও অকাট্য যুক্তির আশ্রয়ে দা'ওয়াত দেয়া।
১৬. পর্যায়ক্রমে দা'ওয়াত উপস্থাপন করা।
১৭. বার বার দা'ওয়াত উপস্থাপন করা।
১৮. সহজ পন্থায় দা'ওয়াত উপস্থাপন করা।
১৯. ব্যক্তি ও সমষ্টিগত যোগাযোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
২০. সুস্পষ্ট, সাবলিল, প্রাঞ্জল ও মার্জিত বক্তব্য উপস্থাপন করা।
২১. অযথা বক্র বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া।
২২. আদর্শিক মডেলিং প্রক্রিয়া অবলম্বন করা।
২৩. দা'ঈ ও মাদ'উর মধ্যকার ঐক্যসূত্র অনুসন্ধান করা।
২৪. মাদ'উর দোষত্রুটি সাময়িকভাবে এড়িয়ে যাওয়া।
২৫. কোমল ও কঠোরের মিশ্রণে দা'ওয়াত দেয়া।
২৬. পরামর্শ ও নসিহতের মনোভাব নিয়ে দা'ওয়াত দেয়া।
২৭. পরোক্ষ সংশোধনের উপর গুরুত্বারোপ করা।
২৮. বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসূত ফলাফল উপস্থাপন করা।
২৯. দা'ওয়াত উপস্থাপনে বৈচিত্র্য আনয়ন করা।
৩০. দা'ঈকে ধৈর্যশীল ও সংযমী হওয়া।
৩১. হাস্যোজ্জল চেহারায় মাদ'উকে দা'ঈ কোলে কাছে নেয়া।
৩২. উত্তম আচরণের মাধ্যমে মন্দ আচরণের মুকাবিলা করা।
৩৩. উপহার-উপঢৌকন বিতরণ করা।

---

১৮৯ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক* প্রেক্ষাপট(ঢাকা : বিআইআইটি, ২য় সং., জুলাই ২০০৯), পৃ. ১৩১-১৫০

৩৪. মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা।
৩৫. দা'ঈর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি প্রদর্শন।
৩৬. ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা উদ্বেলিত করণ।
৩৭. বন্ধুত্বপূর্ণ নরম ভাষা ব্যবহার করা।
৩৮. স্বচ্ছ ও সাবলিল ভাষা ব্যবহার করা।
৩৯. শান্ত-শিষ্ট ও ধীর-স্থিরে মাউয়িযা উপস্থাপন করা।
৪০. মাউয়িযার মাত্রায় মিতব্যয়িতার নীতি অবলম্বন।
৪১. মাউয়িযাকে সতত তকওয়ার সাথে সম্পর্কিত করণ।
৪২. দা'ঈর কথা ও কাজে মিল থাকা।
৪৩. দা'ওয়াত প্রদানে উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শন– উভয়ের মাজে সুসমন্বয় সাধন করা।
৪৪. ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থকে একত্রিত করে উপস্থাপন করা।
৪৫. দা'ওয়াতে আল-কুরআন ও সুন্নাহর বাণী ব্যবহার করা।
৪৬. মাউয়িযার বিষয়বস্তুকে সম-সাময়িক জবিন যাত্রার সাথে সম্পর্কিত করণ।
৪৭. দা'ঈকে সত্যাশ্রয়ী ও বাস্তববাদী হওয়া।
৪৮. দা'ঈকে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা।
৪৯. ভাব-ব্যঞ্জনা শৈলীতে বৈচিত্র্যতা আনয়ন করা।
৫০. কোনো বিষয় সত্যায়নের সময় শপথ বাক্য ব্যবহার করা।
৫১. বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ব্যবহার করা।
৫২. কোনো কোনো বিষয় হাতের ইশারা দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া।
৫৩. চিত্র অংকন করে জটিল বিষয় পরিস্কার করা।
৫৪. বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আবেগ-উচ্ছাস প্রদর্শন করা।
৫৫. সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাধান্য দেয়া।
৫৬. দা'ওয়াত উপস্থাপনের সময় কণ্ঠস্বর ও দেহকে নিয়ন্ত্রণ করা।
৫৭. সত্যকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে মুজাদালা করা।
৫৮. উপপাদ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দলিল-প্রমাণসহ তর্কে অবতরণ করা।
৫৯. তর্কে লিপ্ত প্রতিপক্ষদের অবস্থাভেদে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৬০. তর্ক পরিবেশকে অন্ধ সমর্থন মুক্ত বলে ঘোষণা প্রদান করা।
৬১. বিতর্কে প্রচলিত ও সঠিক বশিঃকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।
৬২. যুক্তি কৌশলে বৈচিত্রময় স্টাইল অবলম্বন করা।
৬৩. তর্কে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈপরিত্যমূলক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা।
৬৪. যুক্তি প্রমাণে স্ববিরোধিতা না করা।
৬৫. ভ্রান্ত হেতুবাক্যের উপর নির্ভর না করা।
৬৬. যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের সাধারণ নিয়ম বজায় রাখা।
৬৭. প্রতিপক্ষের ব্যক্তিগত সম্মানে আঘাত না হানা।
৬৮. নরম মেজাজে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।
৬৯. পার্শ্বপ্রসঙ্গ ও গৌণবিষয়ে জড়িয়ে না পড়া।
৭০. বুদ্ধিবিত্তিক গায়েলকরণ যুক্তির পাশাপাশি আবেগ সঞ্চারি রীতিনীতি অবলম্বন করা।
৭১. ঐক্যসূত্র সন্ধান ও উভয় পক্ষের সমর্থিত হেতুবাক্যের স্বীকৃতি প্রদান করা।
৭২. কথাবার্তায় ভারসাম্য ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা।
৭৩. উভয়ের মাঝে সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
৭৪. প্রতিপক্ষ যুক্তিহীনভাবে অযথা দম্ভ দেখালে চূড়ান্ত সিদ্ধানত ঘোষণা করা।

৭৫. আনুষঙ্গিক আদব-কায়দা রক্ষা করা।

সুতরাং একজন দা'ঈর দায়িত্ব হলো মানুষকে ইসলামের পথে ডাকার সবরকম পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা। এতে করে দা'ওয়াতের কাজ করা তার জন্য অনেক সহজ হবে। একজন দা'ঈকে তার পরিবারের আপনজন থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, বাড়িতে কাজের লোকসহ প্রতিটি মানুষকেই ইসলামের দা'ওয়াহ দিতে হবে। তাকে জানতে হবে কোথায়, কখন এবং কিভাবে ইসলামের দা'ওয়াহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়। এক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ স্থানের তালিকায় থাকবে মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, জেলখানা, পার্ক, সমুদ্র সৈকত, বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্র, হাজি ক্যাম্প, আবাসিক হোটেল, বিমানবন্দর, বাস-লঞ্চ টার্মিনাল, কমিউনিটি সেন্টার, শপিং সেন্টার, বাজার এলাকা, অফিস-আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া, খাবার হোটেল রেস্তোরা ইত্যাদি। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন– পাসপোর্ট অফিস, পোস্ট অফিস, পর্যটন কেন্দ্র, বিভিন্ন তথ্য প্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদিও তার ইসলামি দা'ওয়াহর ক্ষেত্র হতে পারে।

ইসলামি দা'ওয়াহর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে একে অন্যের কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে ইসলামি দা'ওয়াহর কাজে নিয়োজিত কর্মীরা আরো দক্ষ এবং সৃজনশীল হয়ে উঠবেন। ফলে দা'ওয়াহ কার্যক্রমকে আরো সফলভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। পারস্পরিক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ইসলামের সত্যবাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মানুষকে দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে একজন দা'ঈকে প্রয়োজনীয় সবরকম দা'ওয়াহ পদ্ধতি ও কৌশলকে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইসলাম নিয়ে কাজ করতে আগ্রহীদের নিয়োগ দিতে হবে। তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি প্রিন্ট করে সেগুলো বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি ইসলামিক সিডি ও ভিসিডির কপি তৈরি করে সেগুলো বন্ধুমহলে এবং চারপাশের মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না কিভাবে ইসলামি দা'ওয়াহর কাজ শুরু করবেন। অনেকেই আবার অজ্ঞতার অজুহাত দেখিয়ে কিছু না করেই দিন পার করে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে একনিষ্ঠভাবে কাউকে দূরে ঠেলে দিয়ে নয়; দরদমাখা হৃদয় নিয়ে, ঘৃণা নয়; ভালোবাসার মন নিয়ে পৃথিবীর কল্যাণ, চিরস্থায়ী শাস্তির আবাস জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে অনন্তকালের শান্তির নিবাস জান্নাতের পথে দা'ওয়াত উপস্থাপনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে চাইলে পদ্ধতি ও কৌশল মহান আল্লাহ তা'আলা অন্তরে জাগিয়ে দিবেন।

নিচে বিভিন্ন উপায় সম্বলিত ইসলামি দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল তুলে ধরা হলো :[১৯০]

ক. পরিবারে ইসলামি দা'ওয়াহ

১. **পারিবারিক গ্রন্থাগার :** পরিবারের সকল সদস্যদের বয়স বিবেচনা করে সে অনুযায়ী বিভিন্ন ইসলামি বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং ইসলামি বক্তাদের লেকচারের সিডি-ভিসিডির একটা সংগ্রহশালা গড়ে তোলা।

---

১৯০ http://islambd.org/, visited on 15.07.2014

২. **ওয়াল পোস্টার :** বাড়িতে একটি নির্ধারিত স্থানকে নোটিশ বোর্ডের মতো পোস্টার লাগানোর জন্য ব্যবহার করা। গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি লেকচার, বিভিন্ন প্রোগ্রামের সময়সূচি ইত্যাদি পরিবারের সকলকে মনে দেয়ার জন্য ওয়াল পোস্টারের স্থানটিকে ব্যবহার করা।

৩. **পারিবারিক শিক্ষার আসর :** পরিবারের সকলেই মিলে একসাথে বসে কেউ একজন কোনো একটা বই থেকে সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করবে এবং বাকিরা তা শুনবে। এক্ষেত্রে এক সাথে বসে ইসলমি লেকচার শোনা অথবা কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াত এবং গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলো মুখস্ত করা।[১৯১]

৪. **পারিবারিক প্রতিযোগিতা :** পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নানা রকম ইসলামি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যা তাদেরকে ইসলাম মেনে চলার ক্ষেত্রে আরো বেশি অনুপ্রেরণা দিবে। পুরস্কার হিসেবে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের নামসমূহ পারিবারিক সম্মাননা তালিকার শীর্ষে রাখা। তালিকার শীর্ষে নিজের নাম থাকাটাই তাদের কাছে অনেক বড় পুরস্কার বলে মনে হবে।

৫. **পারিবারিক ম্যাগাজিন :** বাড়িতে একটা পারিবারিক ম্যাগাজিন প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা। যাতে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতে পারে।

৬. **ইসলামি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ :** নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময়, ইসলামি লেকচার শুনতে যাওয়ার সময় অথবা কোনো অসুস্থ কাউকে দেখতে যাওয়ার সময় সাথে নিজের ভাই বা সন্তানদের নিয়ে যাওয়া। ইসলামি দা'ওয়াহর কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনগুলোতেও তাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়া।

৭. **অন্যদের সামনে ভালো কাজ করা :** পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামনেও কিছু ভালো কাজ করা যাতে তারা দা'ঈকে দেখে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। যেমন তাদের সামনে নামায আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, গরীব-দুঃখীদের দান-সদকা করা।

খ. মসজিদে ইসলামি দা'ওয়াহ

৮. **দেয়াল ম্যাগাজিনে অংশগ্রহণ :** অধিকাংশ মসজিদের পিছনের দিকের দেয়ালে নোটিশ বোর্ড থাকে যা বিভিন্ন ধরনের ঘোষণা, ইসলামি পোস্টার ইত্যাদি লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ নোটিশ বোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পোস্ট করা যেতে পারে অথবা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সচেতন করে এমন তথ্যমূলক পোস্টার কিনে লাগানো যেতে পারে।

৯. **মসজিদের সুযোগ-সুবিধা এবং অনুষ্ঠানের উন্নয়ন :** মসজিদে দা'ওয়াতের কার্যক্রম এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মসজিদের পাঠাগার ও হিফজ বিভাগের উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করা। দান বাক্সের মাধ্যমেও উক্ত কাজে সহায়তা করা।

১০. **ইসলামি বই-পুস্তক এবং অডিও, ভিডিও, সিডি, ডিভিডি সরবরাহ :** বিভিন্ন ইসলামি কল্যাণমূলক সংগঠন থেকে গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ইসলামি লেকচার, প্রামাণ্যচিত্রের অডিও, ভিডিও, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করে মসজিদের বিভিন্ন স্থানে রাখা যাতে মুসল্লিদের দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন কুরআনের পাশাপাশি এর একাধিক অনুবাদসহ তাফসির গ্রন্থগুলো মসজিদের সেলফে রাখা।

১১. **মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে মানুষকে জানানো :** মসজিদে কখন কোন বিষয়ের উপর লেকচারের আয়োজন করা হয়েছে অথবা কোন সময় কুরআন

---

১৯১ আদম আব্দুল্লাহ আলুরি, *তারিখুদ দা'ওয়াতি ইলাল্লাহি বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি*(কায়রো : মাকতাবাতুল ওয়াহাবাহ, ১৯৯০), পৃ. ৬৫

শিক্ষার ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইত্যাদি জানিয়ে মসজিদের নোটিশ বোর্ড কিংবা দরজায় বিজ্ঞাপন দেয়া।

১২. **লেকচারের আয়োজন করা :** পরিচিত বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আকিদার বক্তাদের লেকচার দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ করে মসজিদে নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে অন্যান্য দা'ওয়াহ সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে অথবা ইসলামি ওয়েবসাইট থেকে ভিডিও লেকচার সংগ্রহ করে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে মানুষদের সামনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

১৩. **জুমু'আর খুৎবার পর্যালোচনা :** জুমু'আর দিন ইমাম যে খুৎবা দেন তার বিষয়বস্তু নিয়ে লোকজনের সাথে পর্যালোচনা করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুৎবার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে তা বাস্তবায়নের জন্য লোকদের উৎসাহিত করা।

১৪. **মসজিদ কমিটিতে অংশগ্রহণ :** ইসলামি দা'ওয়াহর পাশাপাশি অন্যান্য কল্যাণমূলক সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করার জন্য মসজিদ কমিটির কর্মী হিসেবে অংশগ্রহণ করা।

১৫. **ইমামের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা :** মসজিদের ইমামের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ইসলামি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লেকচার তাকে দেখানো বা শোনানো যাতে তিনি সে লেকচারের আলোকে জুমু'আর খুৎবা দিতে পারেন।

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামি দা'ওয়াহ

১৬. **সকালের পিটি-প্যারেড :** বিভিন্ন দা'ওয়াহ উপকরণ যেমন– ইসলামি বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, লেকচারের অডিও, ভিডিও, সিডি, ডিসিডি ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা এবং সকালের পিটি ও প্যারেডে পরিস্থিতি বুঝে কাজে লাগানো।

১৭. **স্কুলের নোটিশ বোর্ড :** পাঠ্যসূচি কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামি লেকচার, সভা-সেমিনার ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য আকর্ষণীয় সব পোস্টার তৈরি করে সেগুলো নোটি বোর্ডে লাগিয়ে দেয়া।

১৮. **নাট্য কর্মকাণ্ড :** ইসলামি ভাবধারা ও মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে এমন নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা।

১৯. **বক্তৃতা-ভাষণ :** বিদ্যালয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞ বক্তাদের দিয়ে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যাতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখা। এতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের করা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য জবাব পেলে ইসলাম তাদের কাছে আরো গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।[১৯২]

২০. **বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান :** বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারিদের নিয়ে বিভিন্ন ইসলামি এবং শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। বিজয়ীদের মাঝে ইসলামি পুরস্কার বিতরণ করা। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠাগুলোতে দা'ওয়াহর গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করা।

২১. **শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করা :** শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ, পরামর্শ, অভিযোগ ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। বিশেষ করে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করা।

---

১৯২ আদম আব্দুল্লাহ আলুরি, *তারিখুদ দা'ওয়াতি ইলাল্লাহি বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২২. **ইসলামি গ্রন্থাগার :** বিদ্যালয়ের সাধারণ গ্রন্থাগারকে ইসলাম বিষয়ক বই-পুস্তকের একটা সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলামি শিক্ষা বিভাগকে সহায়তা করা। এখানে ইসলামি সাহিত্যের পাশাপাশি রাসূল সা.-এর সাহাবিদের এবং ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মুসলিমদের জীবনচরিতগুলো যাতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা।

২৩. **বিভিন্ন প্রচার-প্রদর্শনী :** বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়োজিত বিভিন্ন বইমেলা, ভিডিও প্রদর্শনী কিংবা বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড বিরোধী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করা।

২৪. **ইসলামি সপ্তাহ উদযাপন করা :** বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যেন তারা বছরে একটা দিন ইসলামি সপ্তাহ হিসেবে উদযাপনের অনুমতি দেয়। এমন অনুষ্ঠানগুলোতে নানা রকম ইসলামি প্রদর্শনীর আয়োজন করা। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের বুল দারণা দূর করে এমন শ্লোগান খোচিত আকর্ষণীয় পোস্টার, ক্যালেন্ডার, আরবি ভাষা শিক্ষার সফটওয়্যার, কুরআনে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত সফটওয়্যার, কুরআনের তিলাওয়াত, ইসলামি লেকচার, প্রামাণ্যচিত্রের সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ।[১৯৩]

২৫. **গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে দা'ওয়াহ :** ছুটিতে পড়াশোনার চাপ কম থাকলে বন্ধুমহলে ইসলামেক তুলে ধরার মাধ্যমে সময়টা কাটানো। তাদের সাথে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা। সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের কি মত তা জেনে নিয়ে ইসলামে এসবের সমাধান কি তা তাদের সাথে শেয়ার করা।

ঘ. কর্মক্ষেত্রে ইসলামি দা'ওয়াহ

২৬. **দা'ওয়াহ পোস্টার :** ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আকর্ষণীয় ও নজরকাড়া পোস্টার তৈরি করে অফিসের নোটিশ বোর্ডে লাগিয়ে দেয়া। কোথাও কোনো ইসলামি অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকলে সেটাও বিজ্ঞাপন আকারে নোটিশ বোর্ডে লাগানো।[১৯৪]

২৭. **নিজের বসার টেবিল :** অফিসের টেবিলে সবসময় কিছু না কিছু দা'ওয়াহ উপকরণ রাখুন। যেমন– ইসলামি পুস্তিকা, ম্যাগাজিন, কুরআনের উপদশে সম্বলিত পেপার ওয়েট ইত্যাদি। এতে করে সহকর্মীদের থেকে শুরু করে গ্রাহকদের সকলের সেদিকে দৃষ্টি পড়বে। ফলে তাদের সাথে মুখের কথা খরচ না করেই অনেকখানি দা'ওয়াহর কাজ হয়ে যাবে। নীরব দা'ঈকে দেখে তারাও দা'ওয়াহর কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

২৮. **ইসলামি লেকচারের সিডি, ডিভিডি বিতরণ :** সহকর্মীদের চালচলন, কথাবার্তা, বয়স ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি লেকচারগুলো বিতরণ করা। বিশেষ করে এমন ধরনের লেকচার তাদেরকে শুনতে বা দেখতে দেয়া যেগুলোর বিষয়বস্তু বা শিরোনাম অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং যেগুলো বস্তুবাদী মানব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

২৯. **আমন্ত্রণ জানানো :** সহকর্মীদের আমন্ত্রণ করে ইসলামি আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সভা-সেমিনারে নিয়ে যাওয়া। তাদেরকে বিভিন্ন ইসলামি দা'ওয়াহ সংগঠনগুলোতেও সাথে করে নিয়ে যাওয়া।

৩০. **জামা'আতে সালাত আদায় করা :** সহকর্মীদর সাথে নিয়ে অফিসে এক সাথে সালাত আদায় করা অথবা তাদেরকে সাথে নিয়ে পাশের কোনো মসজিদেও জামা'আতে সালাত আদায় করা।

---

১৯৩ আদম আব্দুল্লাহ আলুরি, *তারিখুদ দা'ওয়াতি ইলাল্লাহি বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১৯৪ http://islambd.org/, visited on 15.07.2014

৩১. **ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান :** বিভিন্ন সভা-সমাবেশের আয়োজন করা এবং ইসলামের দা'ঈদেরকে অনুষ্ঠানগুলোতে আমন্ত্রণ করা। অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি ও বক্তব্য দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে ইসলামকে জানার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি করে।

৩২. **উন্মুক্ত আলোচনা :** দুপুরের খাবার কিংবা চা বিরতির সময়টা খোশগল্পে না কাটিয়ে ইসলামি আলোচনার উপলক্ষ হতে পারে।

৩৩. **ইসলামি উদ্যোগ :** ইসলামি দা'ওয়াহর সাথে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত তাদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ হাতে নিয়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করা।

৩৪. **ইসলামি দৃষ্টান্ত :** কর্তব্যপালন এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে শতভাগ আন্তরিক হওয়া এবং প্রতিটি কর্মই সাধ্যমত করার চেষ্টা করা এবং অন্যদের চোখে প্রমাণ করা যে, যা করা হচ্ছে একজন ভালো মুসলিম বলেই তা করা হচ্ছে। আর এভাবেই তাদেরকে বোঝানো যে ইসলাম কিভাবে মানুষকে সত্রিকার অর্থে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।[১৯৫]

৬. ইসলামি দা'ওয়াহর কিছু সাধারণ পদ্ধতি

৩৫. **দা'ওয়াহ পোস্টার :** অত্যন্ত দৃষ্টি-আকর্ষক এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন দৃশ্যাবলি ব্যবহার করে পোস্টার তৈরি করা। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বাস্তবিক মুহূর্তের চিত্র তুলে ধরে সেই পরিস্থিতিতে কিভাবে দা'ওয়াত দেয়া যায় তা তুলে ধরা। পোস্টারগুলোতে মানুষের চিন্তা উদ্রেককারী ইসলামি শ্লোগান লিখে দেয়া এবং সেগুলোকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা।[১৯৬]

৩৬. **ইসলামি শুভেচ্ছা কার্ড :** বিভিন্ন শুভেচ্ছাবাণী সম্বলিত কার্ড ছাপিয়ে সেগুলো বিতরণ করা। গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দিন কিংবা অনুষ্ঠানের তারিখ দিয়ে কার্ড ছাপিয়ে সেগুলোও বিতরণ করা। কার্ডগুলোতে মনোরম অক্ষরে ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয় যেমন– সুদ, ঘুষ, পরচর্চা, প্রতারণা ইত্যাদির কুফল উল্লেখ করা।

৩৭. **দা'ওয়াহ এ্যালবাম :** পরকাল সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চারকারী এবং তাদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে সব ছবি সংগ্রহে রাখা। ছবিগুলো দা'ওয়াহ সংগঠনের দর্শনার্থীদের জন্য ব্যবহার করা অথবা উপহার হিসেবে সেগুলো তাদেরকে দেয়া।

৩৮. **বিয়ের কার্ড :** বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের ইসলামি দা'ওয়াহ পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলামি দা'ওয়াহর প্রচারপত্রের উল্টো পিঠ বিয়ের কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা। যেমন– যে এলাকার লোকজন বিয়ের অনুষ্ঠানে অনৈসলামি কার্যকলাপে লিপ্ত হয় সে এলাকার লোকজনদের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য 'ইসলামে বিয়ে অনুষ্ঠানের আদাব' শীর্ষক পুস্তিকা বিয়ে কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা।

৩৯. **টাইপিং এবং রিভিশন :** কোনো সময় কাউকে সরাসরি ইসলামের দা'ওয়াত দিলে কাজ হয় না। সেক্ষেত্রে তাকে দিয়ে ইসলামি কোনো প্রবন্ধ লেখানো বা লেখা প্রবন্ধ তাকে প্রুফ রিডিং এর জন্য দেয়া। এমনি এমনি হয়তো সে এগুলো পড়তো না কিন্তু অনুরোধ করে কাজটি করতে বললে করবে এবং এক্ষেত্রে দুই কাজ হবে। লিখত গিয়ে বা প্রুফ রিডিং করতে গিয়ে সে মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং ইসলামের দা'ওয়াহর কাজও হবে।

৪০. **মোবাইলের মাধ্যমে দা'ওয়াহ :** মোবাইল এবং ই-মেইল কন্ট্যাক্ট লিস্টের সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দিন ও অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে এবং মনে করিয়ে দিয়ে মেসেজ

---

১৯৫ আদম আব্দুল্লাহ আলুরি, *তারিখুদ দা'ওয়াতি ইলাল্লাহি বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৯৬ http://islambd.org/, visited on 15.07.2014

পাঠানো। ইসলামে দা'ওয়াহর গুরুত্ব উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখে তাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া।

৪১. **ইন্টারনেটে দা'ওয়াহ :** বিভিন্ন জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের সাইট যেমন– ফেইসবুক, টুইটার, ব্লগ, বন্ধুদের ই-মেইল ঠিকানাসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটে ইসলামি প্রবন্ধ, বই-পুস্তক, অডিও, ভিডিও লেকচার শেয়ার করা, মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়া। ইন্টারনেটে এমন অসংখ্য চ্যাট রুম বা ব্লগ আছে যেগুলোতে ইসলামের কুৎসা রটনা করা হয়, ইসলামের নামে অপপ্রচার চালানো হয়। এমন চ্যাট রুম বা ওয়েবসাইটগুলোতে আলোচনায় অংশ নেয়া এবং তাদের মিথ্যাচারকে যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে খণ্ডন করা।

৪২. **গণমাধ্যমে দা'ওয়াহ :** রেডিও ও টেলিভিশনের জন্য ইসলামি অনুষ্ঠান নির্মাণ করে সেগুলো সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা। অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচারের আগেই সেগুলোর প্রচার সময় এবং চ্যানেলের নাম উল্লেখ করে ব্যাপক প্রচারণা চালানো। এক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে পোস্টারের মাধ্যমে তা করা। ফেইসবুকের সাইডবারেও আকর্ষণীয় ইমেজ ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেয়া। স্থানীয় সংবাদপত্রেও ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে পাঠানো।[১৯৭]

৪৩. **স্টিকারের মাধ্যমে দা'ওয়াহ :** সালাত আদায় করা, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, দুস্থদের সহায়তা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানুষকে মনে করিয়ে দেয় এমন মেসেজ লিখে স্টিকার আকারে সেগুলো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ পাবলিক যানবাহন যেমন– বাস, ট্রেন, লঞ্চ ইত্যাদিতে লাগানোর ব্যবস্থা করা। স্টিকারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দু'আ যেমন– বাড়ির বাইরে যাওয়ার দু'আ, বাড়িতে প্রবেশের দু'আ, টয়লেটে প্রবেশের দু'আ, টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু'আ ইত্যাদি লিখে মানুষের মাঝে বিতরণ করা যাতে তারা সেগুলো বাড়ির যথাস্থানে লাগিয়ে রাখতে পারে। আবাসিক হোটেলের মালিকদের অনুমতি নিয়ে হোটেলের রুমগুলোকে সালাতের জন্য কিবলা উল্লেখ করে আকর্ষণীয় স্টিকার লাগানো।

৪৪. **সালাত ও সাওমের সময়সূচি প্রচার করা :** সালাতের সময়সূচি এবং রমযান মাসে ইফতারের সময়সূচি ছাপিয়ে সেগুলোকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানোর ব্যবস্থা করা। এতে করে মুসল্লিদের এবং রোযাদারদের অনেক উপকার হবে। এতে করে সালাতের ব্যাপারে অন্যান্যদেরও স্মরণ করিয়ে দেয়া যাবে।

৪৫. **দিনপঞ্জি ও কর্মসূচি :** গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দিন এবং কর্মসূচির তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করে আকর্ষণীয় দিনপঞ্জি ছাপিয়ে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

৪৬. **কলিং কার্ড :** বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে ব্যালেন্স রিচার্স কার্ডের উপরে দা'ওয়াহ মেসেজ লিখে সেগুলো দোকানে দোকানে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা। এতে করে ব্যালেন্স রিসার্চ কার্ডের মাধ্যমেও গ্রাহকদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াহ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

৪৭. **পোস্ট কার্ড :** প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য ব্যবহার করে আকর্ষণীয় পোস্ট কার্ড ডিজাইন করা। পোস্ট কার্ডের উল্টো পিঠে ইসলামি দা'ওয়াহ সম্পর্কিত মেসেজ লিখে সেগুলো ছাপানোর ব্যবস্থা করা। যেমন– কোনো খেজুর বাগানের মনোরম দৃশ্যকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে তার উপর কুরআনে বর্ণিত 'পানি চক্র' সম্পর্কিত আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া।

৪৮. **দা'ওয়াহ ব্রিফকেইস :** বিশেষ ধরনের একাধিক পকেট বিশিষ্ট ব্রিফকেইস কিনে তা কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা। একাধিক পকেট বিশিষ্ট এমন ব্রিফকেইস বিভিন্ন ধরনের

---

১৯৭ আদম আব্দুল্লাহ আলুরি, *তারিখুদ দা'ওয়াতি ইলাল্লাহি বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

লিফলেট, পুস্তিকা, গুরুত্বপূর্ণ লেকচারের অডিও-ভিডিও, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি বহনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়।[১৯৮]

৪৯. **পত্রিকার চাঁদা :** উপহার হিসেবে কাউকে ইসলামি কোনো পত্রিকার চাঁদা পরিমাণ টাকা কোনো দা'ওয়াহ সংগঠনকে পাঠিয়ে দেয়া। ফলে তারাই পত্রিকাটি গ্রাহকের কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া।

৫০. **পঠিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ :** পঠিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের একটা উদ্যোগ হাতে নেয়া। সেগুলো সংগ্রহ করে এমন সব এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেখানকার লোকেরা সেগুলো এখনো পড়ার সুযোগ পায়নি।

৫১. **পুস্তিকা-প্রচারপত্র :** গুরুত্বপূর্ণ বই বা লেকচারে ভিডিও সিডি, ডিভিডি থেকে নির্বাচিত অংশ ছাপিয়ে পুস্তিকা বা প্রচারপত্র আকারে প্রকাম করা। বিভিন্ন উপলক্ষে এমনটা করা যেমন– হজ্জ মৌসুমে, লম্বা ছুটির ভিতরে, প্রবাসী শ্রমিকদের উপলক্ষে, বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে, রমযান মাস কিংবা ঈদ উপলক্ষে।

৫২. **বিভিন্ন বিলের রশিদ :** সাধারণ ব্যবহার্য ইউটিলিটি বিল যেমন– টেলিফোন বিল, পানির বিল, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল ইত্যাদি বিলের রশিদের উল্টো পিঠে সংক্ষিপ্ত দা'ওয়াহ বিষয়ক বিবৃতি ও কুরআনের উপদেশাবলি লিখে তা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

৫৩. **ইসলামি শ্লোগান :** মানুষের নজর কাড়ে এমন সব আকর্ষণীয় শ্লোগান বা বক্তব্য দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন– ক্যালেন্ডার, শপিংব্যাগ, গাড়ির সানক্রিন ইত্যাদিতে লেখা। এক্ষেত্রে অবশ্যই শপিংব্যাগ বা গাড়ির সানক্রিন-এর প্রস্তুতকারক কোম্পানির অনুমতি নেয়া আবশ্যক।

৫৪. **খোলা চিঠি :** বিভিন্ন বয়সের মানুষকে পাঠক হিসেবে কল্পনা করে চিঠি লেখা। এ চিঠির প্রাপক হতে পারে মসজিদের কোনো প্রতিবেশি, সে মসজিদের ইমাম, কিংবা একজন পাবলিক স্পিকার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র, প্রকাশক, পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, চাকুরিদাতা, ব্যবসায়ী, ভোক্ত, ক্রেতা, নিরাপত্তা প্রহরী, কারাবন্দী কয়েদি অথবা একজন মুসাফির। পাঠককে উদ্দেশ্য করে তার অনুভূতিতে নাড়া দেয় এমন ভাষায় তাকে ইসলামের পথে আহ্বান করা।[১৯৯]

৫৫. **সাধারণ প্রতিযোগিতা :** বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের বয়সের কথা মাথায় রেখে বয়সের সাথে মানানসই বিভিন্ন ইসলামি পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে ইসলামি বই-পুস্তক, লেকচারের সিডি, ভিসিডি, ডিবিডি ইত্যাদি বিতরণ করা।

৫৬. **সাধারণ প্রকাশনা :** আগে হয়ত ইসলাম মেনে চলতো না অথবা বিপথে চলে গিয়েছিলো পরে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান করেছেন এমন মানুষদের গল্প বা তাদের স্বকিারোক্তিমূলক কথাকে গল্প আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। এ ধরনের প্রকাশনায় নিয়মিত বিভাগ হিসেবে আরো যা থাকতে পারে তা হলো কবিতা, নাটক, ছোট গল্প, ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, বিখ্যাত লোকদের জীবনী, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপট, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবদান ও আবিস্কারের উপর প্রবন্ধ। প্রকাশনায় এ সকল বিভাগ রাখার উদ্দেশ্য হলো সেসব পাঠকদের ধরে রাখা যারা হয়তো পুরোপুরি ইসলামি পত্রিকা পড়তে আগ্রহী নয়।

---

১৯৮ http://islambd.org/, visited on 15.07.2014

১৯৯ জুমআ' আলি আল-খাওলি, *তারিখুদ দা' ওয়াহ*(কায়রো : দারুত তাবা'আ আল-মুহাম্মাদিয়া, ১ম সং., ১৯৮৪), খ.১, পৃ. ১৩৯

৫৭. **বিভিন্ন দা'ওয়াহ উপকরণ বিতরণ :** ইসলামের দা'ওয়াহ পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত সংগঠনগুলো নিয়ম করে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দা'ওয়াহ বিষয়ক পুস্তিকা, ক্রোড়পত্র, লেকচারের সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি পৌঁছে দিতে পারে। এমন কাজগুলো বিদ্যালয়গুলোতেও করা।[২০০]

৫৮. **প্রোডাকশন কোম্পানি :** বড় ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করে থাকে এমন কমিউনিটি সেন্টার বা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে গিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করা। তাদের সহযোগিতায় উপস্থিত অতিথিদের মাঝে দা'ওয়াহ উপকরণ যেমন– পুস্তিকা, বিখ্যাত বক্তাদের আকর্ষণীয় লেকচারের সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৫৯. **দা'ওয়াহ কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ি :** দা'ওয়াহ কাজে ব্যবহারের জন্য হালকা দামের খোলা জিপ গাড়ি কেনা। ভ্রাম্যমান এ গাড়িতে দা'ওয়াহ বিষয়ক এবং উৎসাহমূলক শব্দগুচ্ছ বা বাক্য লিখে রাখা। জনসমাগম বেশি হয় এমন স্থানে গাড়ি পার্ক করে লোকজনের মাঝে পূর্বোল্লিখিতি দা'ওয়াহ উপকরণ যেমন– দা'ওয়াহ পুস্তিকা, বিখ্যাত বক্তাদের আকর্ষণীয় লেকচারের সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি বিতরণ করা।

৬০. **বিশালাকৃতির বিল বোর্ড :** দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ন সাইন বিজ্ঞাপন বা বিল বোর্ড টাঙিয়ে সেগুলোতে দা'ওয়াহ মেসেজ এবং ইসলামি অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা করা। বিশালাকৃতির বিল বোর্ডগুলো সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে। আজকাল রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন প্রসাধনী পণ্যের কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপনের স্থানে ইসলামি বিল বোর্ড দেখা গেলে তা লোকজনের মাঝে বৈপ্লবিক সাড়া জাগাবে।

৬১. **ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন :** দা'ওয়াহ সংগঠনগুলো কিশোর এবং যুবকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন শারি'আহ সম্মত খেলাধুলার আয়োজন করা। এমন অনুষ্ঠানগুলোতে বিজয়ীদেরসহ দর্শকদের মাঝে দা'ওয়াহ সংশ্লিষ্ট উপকরণ পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করা।

৬২. **বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান :** ইসলামের জন্য কাজ করতে আগ্রহী এমন ডাক্তারদের দিয়ে কোনো সমমনা প্রাইভেট ক্লিনিকের অধীনে সাধারণ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের মানুষদের সুবিধা দেয়া। যেমন– নও-মুসলিম, যারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী ইত্যাদি।

৬৩. **মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন :** মহিলাদের উদ্দেশ্যে এমন সব কল্যাণধর্মী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা যে ব্যাপারে তারা স্বভাবতই আগ্রহ বোধ করে। যেমন– রান্না-বান্না, গার্হস্থ অর্থনীতি, সন্তান প্রতিপালন, দাম্পত্য জীবন, গৃহ ব্যবস্থাপনা, গৃহকর্ম ও গৃহকর্মী, দাম্পত্য প্রস্তুতি, স্তন্যদান, শিশুদের রোগবালাই, গৃহ নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি। এসব কোর্সের পাঠ্যসূচির বই-পুস্তকের মধ্যে দা'ওয়াহ বিষয়ক মেসেজ সন্নিবেশ করা।

৬৪. **সাহায্য মেলা :** তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে 'চ্যারিটি ফেয়ার', 'চ্যারিটি ফিস্ট' ইত্যাদি নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ ইসলামি দা'ওয়াহ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তাদের সাধ্যমতো আর্থিক অনুদান দেয়ার চেষ্টা করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা নারী বিষয়ক ইসলামি বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন।

৬৫. **সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান :** ইসলামি স্কলার, দা'ঈ, দা'ওয়াহ সংগঠন, ইসলামি পত্রিকা, ইসলামি ওয়েবসাইট, ইসলামি সিডি, ভিসিডির দোকান ইত্যাদি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিজ নিজ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা পদক প্রদান

---

২০০ http://islambd.org/, visited on 15.07.2014

উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। অনুষ্ঠানে ইসলামে দা'ওয়াহর গুরুত্ব তুলে ধরে উপস্থিত সাধারণের জন্য বক্তব্যের ব্যবস্থা রাখা। এতে করে সাধারণ মানুষ দা'ওয়াহর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হবে।

৬৬. **দা'ওয়াহ নির্দেশিকা :** দেশে বেড়াতে আসা বিদেশী পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে দা'ওয়াহ গাইড বা ট্যুরিস্ট গাইড প্রকাশ করা। এ গাইডে যেসব বিষয় স্থান পেতে পারে তাহলো বিভিন্ন স্থানের ইসলামি সংগঠন বা দা'ওয়াহ সংগঠনের ঠিকানা, ইসলামি গ্রন্থাগার, স্টুডিও, বিখ্যাত মসজিদ, ইসলামি মাদরাসা, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান, বর্তমানে অনুষ্ঠিতব্য দা'ওয়াহ কনফারেন্স-এর সময়সূচি, স্থানীয় ইসলামি বিশেষজ্ঞদের ঠিকানা ইত্যাদি।[২০১]

৬৭. **ইসলামি প্রদর্শনী :** সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগরে সহায়তায় বড় বড় ইসলামি বুকস্টল এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নিয়ে ইসলামি প্রদর্শনীর আয়োজন করা। এমন প্রদর্শনীতে ইসলামি দা'ওয়াহ কার্যক্রমের সাথে সমমনা স্কুল-কলেজ এবং বিভিন্ন কোম্পানির স্টল থাকবে যেখানে তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এমন কিছু তুলে ধরবে যা ইসলামি দা'ওয়াহর প্রচার-প্রসারে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

৬৮. **দা'ওয়াহ ওয়েবসাইট :** দা'ওয়াহ কার্যক্রম চালানোর জন্য সব রকম চাহিদা মেটাতে পারে এমন দা'ওয়াহ ওয়েবসাইট নির্মাণ করা। এ ধরনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সবরকম দা'ওয়াহ উপকরণ সরবরাহ করা। ফলে ওয়েবসাইগুলো ইসলামি বিশেষজ্ঞ বোর্ড-এর ন্যায় ভুমিকা পালন করবে। এখানে দা'ওয়াহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনাও স্থান পাবে। দা'ওয়াহ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর সেকশনও থাকবে।

৬৯. **ইফতার পার্টির আয়োজন করা :** দা'ওয়াহ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রমাযান মাসে ইফতার পার্টির আয়োজন করা এবং অন্যান্যদের ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করা। ইফতার অনুষ্ঠানে সাওমের অসাধারণ উপকারিতা এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য এর তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করা। অথবা সপ্তাহের যে কোনো দু'টি দিনকে নির্ধারণ করে সে দিনগুলিতে অন্যান্য যারা দা'ওয়াহর কাজ করছে তাদের সাথে মিলিত হয়ে পারস্পরিক মত বিনিময়ের আয়োজন করা। এ কাজটি সারা বছর ধরেই চালিয়ে যাওয়া যায়।

৭০. **হজ্জ ও উমরা ক্যাম্পিং :** হজ্জ অথবা উমরা করতে যাচ্ছেন এমন মানুষদের এবং বিশেষ করে নতুন মুসলিমদের হজ্জ সফর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে যথাসম্ভব সহায়তা করা। ইসলামের দা'ওয়াহর কাজে তাদের স্পৃহাকে উজ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে হজ্জের পূর্বে, হজ্জ পালনের সময় এবং হজ্জ পরবর্তী কি ধরনের ভুমিকা তাদের হওয়া উচিৎ তা তুলে ধরে হজ্জে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা।

৭১. **যাতায়াত যানবাহন :** অনেকেই দূরবর্তী কোনো ইসলামি অনুষ্ঠান, অথবা কোনো দা'ওয়াহ কার্যালয়ের কোনো কোর্সে যোগদানের জন্য যেতে চান কিন্তু যাতায়াত সুবিধা না থাকায় যেতে পারেন না। এক্ষেত্রে দা'ঈগণ কর্তৃক ইসলামের স্বার্থে নিজের গাড়িতে করে এবং একটু সময় ব্যয় করে এমন লোকজনকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া।

৭২. **দা'ওয়াহ বিপণী :** বিভিন্ন স্থানে দা'ওয়াহ বিপণী স্থাপন করা। এ বিপণীগুলো বিভিন্ন দা'ওয়াহ উপকরণ সংগ্রহের কাজ করবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ দা'ওয়াহ উপকরণ হিসেবে ইসলামি বই-পুস্তক, সিডি, ভিসিডির কপি ইত্যাদি দিতে চাইলে সেগুলো গ্রহণ করা। সংগৃহীত দা'ওয়াহ উপকরণগুলো নামমাত্র দামে মসজিদ-মাদরাসা এবং স্কুল-কলেজগুলোতে সরবরাহ করা।

---

২০১ জুমআ' আলি আল-খাওলি, *তারিখুদ দা'ওয়াহ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৯০

৭৩. **দা'ওয়াহ কার্যালয় :** স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দা'ওয়াহ কার্যালয় স্থাপন করা। অন্যান্যদেরও কার্যালয়গুলোতে নিয়ে যাওয়া। কার্যালয়গুলোর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা। যারা সেখানে ইসলামের দা'ওয়াহর কাজে নিয়োজিত তাদের সহায়তা করা ও উৎসাহ দেয়া।[২০২]

৭৪. **মানুষের জন্য দু'আ করা :** মানুষকে ইসলামের পথে ডাকার অংশ হিসেবে তাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে দু'আ করা। যেমন– কাউকে কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হতে দেখলে তাকে এ কথা বলা– 'আল্লাহ আপনাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।' অথবা কেউ কোনো ভালো কাজ করলে তার জন্য বলা– 'আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেনো আমাদের সকলকে জান্নাতে তাঁর রাসূল সা.-এর কাছাকাছি রাখেন।' অথবা কোনো ছাত্রের জন্য দু'আ করলে বলা– 'আল্লাহ আপনাকে ইহকাল এবং পরকালের উভয় পরীক্ষায় সাফল্য দান করুন।'

৭৫. **ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ :** সালাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন বা একেবারে সালাত আদায় করে না এমন লোকদের সাথে সরাসরি দেখা করা। আযানের সময় হয়ে এসেছে এমন সময় তাদের সাথে দেখা করা যাতে করে তাদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে যাওয়া যায়।

৭৬. **ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা :** সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নও-মুসলিমকে জুমু'আর মসজিদে নিয়ে আসা। সালাত শেষে তাদের মুখ থেকেই শোনা কিভাবে বা কেনো তারা ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো। ইসলামের কোন কোন দিক তাদেরকে বেশি আকর্ষণ করেছে। তাদের কাছ থেকে শোনার পর উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে দা'ওয়াহর বিভিন্ন পদ্ধতি-উপায় তুলে ধরে কিছু বলা যা তাদের কাজে আসে। ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি কোনো মহিলা হলে তাকে কোনো মহিলা বিদ্যালয় বা কোনো মহিলা সংস্থায় নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে তার মুখ থেকে ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শোনা। এতে অন্যান্যরাও অনুপ্রাণিত হবে।[২০৩]

৭৭. **সাধারণ যানবাহন :** আকর্ষণীয় এবং প্রাসঙ্গিক পোস্টার, স্টিকার, অডিও সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ছাপিয়ে এবং তৈরি করে বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট যানবাহনের মালিক সমিতির কাছে সরবরাহ করা। এগুলো তারা তাদের বাস, প্রাইভেট কার, মোটর বা ট্যাক্সি ক্যাব ইত্যাদিতে ব্যবহার করবে। মাঝে মাঝে ইসলামি দা'ওয়াহর কাজে সহযোগিতার জন্য তাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৭৮. **দা'ওয়াহ বুথ :** শহরের বড় বড় শপিং মল, সুপার মার্কেট এলাকা, নিউ মার্কেট এলাকা ইত্যাদি যে স্থানগুলোতে প্রচুর জনসমাগম হয় এমন স্থানগুলোতে দা'ওয়াহ বুথ স্থাপন করা। দা'ওয়াহ বুথ বা দা'ওয়াহ স্টলগুলোর টেবিলে দা'ওয়াহ বিষয়ক ক্লিপ্স দেখানোর জন্য বড় পর্দার টেলিভিশন রাখা। সাথে সাথে নজরকাড়া প্রচ্ছদের সব দা'ওয়াহ সংশ্লিষ্ট ইসলামি বই-পুস্তক, দা'ওয়াহ পত্রিকা, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদির অনন্য সমাহার রাখা যা সমবেত দর্শনার্থীদের মনোযোগ আর্কষণে সক্ষম হয়।

৭৯. **টেলিফোন দা'ওয়াহ :** মোবাইল বা টেলিফোনের ওয়েলকাম টিউন হিসেবে বিভিন্ন দা'ওয়াহ মেসেজ ব্যবহার করা। যাতে কোনো কলার কল করলে তিনি তা শুনতে পান। ফোন কলটি রিসিভ না করা পর্যন্ত কলার মেসেজটি শুনতে খাতবে। ওয়েলকাম টিউনটি হতে পারে, 'সম্মানিত কলার, আপনি আজকে সালাত আদায় করেছেন তো? কারণ সালাতই হলো একজন কাফির ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়।' এছাড়া

---

২০২ জুমআ' আলি আল-খাওলি, *তারিখুদ দা'ওয়াহ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১২১
২০৩ http://islambd.org/, visited on 15.07.2014

মোবাইল এবং টেলিফোনের মাধ্যমে দা'ওয়াহ সেন্টার থেকে লোকজন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারে।

৮০. **আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্স :** কুরআনের ভাষা আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্চ চালু করা। এ কোর্সগুলো কথোপকথনমূলক আরবি ভাষা এবং আরবি ব্যাকরণের উপর গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরবি ব্যাকরণের জ্ঞান কুরআন বুঝে পড়তে সাহায্য করবে। সরাসরি কোর্সের বদলে ধারণকৃত ক্লাস লেকচার প্রোজেক্টরের সাহায্যে প্রদর্শনের মাধ্যমেও আরবি ভাষা শেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কাজটি নিজের বাড়ি কিংবা কর্মক্ষেত্রে যেখানে সুবিধা করা যেতে পারে।

৮১. **ইসলামি কোর্স :** ঈমান, কুফর, তাওহিদ, শিরক, বিদ'আহ, হালাল-হারাম, ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলামে দাম্পত্য জীবন, ইসলামে নারী অধিকার, বিয়ে অনুষ্ঠানের শিষ্টাচার ইত্যাদিসহ আকিদাগত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইসিলামি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা। কোর্সগুলো স্থানীয় মসজিদ বা দা'ওয়াহ সংগঠনে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এছাড়া যারা ইসলামের দা'ঈ হিসেবে কাজ করতে চাই তাদের জন্য দা'ওয়াহ ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করা।[২০৪]

৮২. **দা'ওয়াহ দিবস পালন :** উন্মুক্ত দা'ওয়াহ দিবসের আয়োজন করা এবং এতে বিভিন্ন শিক্ষমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা। অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ, দেশি-বিদেশি সকলশ্রেণির মানুষদের জন্য সুব্যস্থা রাখা। দা'ওয়াহ দিবস অনুষ্ঠানের একমাস আগে থেকেই স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদরাসাসহ সকল স্থানে মৌখিক ঘোষণা এবং পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে তা সকলকে জানিয়ে দেয়া যাতে দা'ওয়াহ দিবসের আয়োজন মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়।[২০৫]

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জীবনে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে অসংখ্য ও অগণিত হিকমত, কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; যাতে মানুষ ঈমানের পথে অটল থাকতে পারে। এগুলো অনুসরণ করে একজন দা'ঈ তার দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করলে সফলতা অর্জন করা সহজ হবে।

---

২০৪ জুমআ' আলি আল-খাওলি, *তারিখুদ দা'ওয়াহ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১১০
২০৫ http://www.quraneralo.com/, visited on 15.07.2014

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামি দা'ওয়াহ্

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশে ভৌগোলিক অবস্থান : বাংলাদেশ ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশে[২০৬] এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমায়[২০৭] অবস্থিত। ১৪৭৫৭০ বর্গকি.মি. বা ৫৬৯৭৭ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আবাস।[২০৮] বাংলাদেশের প্রমাণ সময় (জিএমটি) +৬ ঘন্টা।[২০৯] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ স্থলে ৪২৪৬ কি.মি. সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও মিজোরাম এবং মায়ানমার দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে ৭১৪ কি.মি. দীর্ঘ উপকূল জুড়ে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান : ওআইসির ১৪তম সদস্য এ দেশটি জনসংখ্যার বিচারে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ৩য় বৃহত্তম এবং আয়তনের দিক দিয়ে ৩৭তম স্থানে অবস্থান করছে।

আয়তন ও ভূ-প্রকৃতি : নদীমাতৃক এ দেশটির ভূখণ্ডের আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গ কি.মি.। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত দেশটির মধ্যাঞ্চল দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। প্রায় সমগ্র দেশটি নদীবিধৌত পলি দ্বারা সৃষ্ট এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। জালের মতো নদ-নদী, খাল-বিলে ছেয়ে থাকা এরূপ বিশাল ও উর্বর শস্য-শ্যামলা সমভূমি পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যায় না। উত্তর-পশ্চিমাংশের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ধূসর ও লাল বর্ণের মাটি দ্বারা গঠিত উচ্চভূমি বরেন্দ্র ও মধুপুর ভাওয়ালের গড় অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রয়েছে তৃণবেষ্টিত নয়নাভিরাম পাহাড়ি অঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চলের ৫৫৭৫ বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট এক বিরাট এলাকা জুড়ে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন।

জনসংখ্যা ও শিক্ষার হার : প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার এ দেশটি বিশ্বের ৭ম জনবহুল দেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৫৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে খুব ছোট কয়েকটি দেশ বাদ দিলে এ দেশটি অর্ধশতাব্দীকার যাবৎ শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। যার ৬০% হলো অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী এবং মাত্র ৩%-এর বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে। শিক্ষার হার ৪৯.০৭%।

ভাষা : ৯৮% লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাকি ২% হলো উর্দুভাষী বিহারি ও নিজস্ব ভাষাভাষী উপজাতি।

---

২০৬. 'বিষুবরেখা হতে যে কোন দূরত্বে যে কোন কোণ অঙ্কন করা যায়। এরূপে কোন স্থান বিষুবরেখার সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, *ইসলামী ভূগোল*(ঢাকা : মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৯), পৃ. ৪২

২০৭. 'লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচের উপর দিয়ে সুমেরু হতে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত একটি কাল্পনিক অর্ধবৃত্ত রয়েছে। এটাকে প্রধান দ্রাঘিমা রেখা বলা হয়। প্রধান দ্রাঘিমা রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, প্রাগুক্ত, *ইসলামী ভূগোল*, পৃ. ৪৪-৪৫

২০৮. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. xvi

২০৯. প্রাগুক্ত।

স্বাধীনতা লাভ : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভের পর অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৮০০ কি.মি. দূরত্বে থেকে দেশটি পাকিস্তানের ৫টি প্রাদেশিক রাজ্যের একটি ছিলো। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসব্যাপি এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

ধর্ম : মুসলিম অধ্যুষিত দেশটিতে জনসংখ্যার শতকরা ৮৯.৭% মুসলিম। যার বিভাগ অনুযায়ী গড় পরিসংখ্যান হলো– বরিশাল ৮৮%, চট্টগ্রাম ৮৪%, ঢাকা ৯০%, খুলনা ৮২.৮৭%, রাজশাহি ৮৬৮৪% ও সিলেটে ৮১.১৬%। এছাড়া হিন্দু ৯.৩%, বৌদ্ধ ০.৭%, খ্রিস্টান ০.৩% যার অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক। শহরাঞ্চলে বিহারি জনগোষ্ঠিভুক্ত শি'আ ও কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক অনুসারী রয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে চাকমা, মারমা, ম্রো প্রভৃতি উপজাতিরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। কুকি, খুমি ইত্যাদি উপজাতি প্রকৃতিপূজারি।

সরকার কাঠামো : এ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রয়েছে। পাঁচ বছর পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান হলেও সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশাসনিক কাঠামো : দেশে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে যা ৬৪টি জিলা পরিষদে বিভক্ত। প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে ৪৭৬টি ও থানা রয়েছে ৫০৩টি।

বিচার বিভাগ : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট যার দু'টি শাখা হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ। অধস্তন আদালত রয়েছে আরো ৬টি। (ক) ফৌজদারি আদালত (খ) দেওয়ানি আদালত (গ) সালিশি বোর্ড (ঘ) গ্রাম্য আদালত (ঙ) পারিবারিক আদালত ও (চ) কিশোর আদালত।

বাংলাদেশে ইসলামি দা'ওয়াহ্

দা'ওয়াতি কাজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৎকালীন মুসলিমগণ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন। যাদের জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিলো ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণ। মহানবী সা.-এর নির্দেশনায় সাহাবিগণ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে নানান ভাষা আয়ত্ব করে কুরআনের বাণী প্রচারে বেরিয়ে পড়তেন। প্রাক-ইসলামি যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন। আরবের বণিকেরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত, মসলা ও সূতি কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন। ভারতের বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক সাইয়িদ সুলাইমান নদবি তার লিখিত গ্রন্থ 'আরবোঁ কি জাহাজরানি'-তে উল্লেখ করেন যে, মিশর থেকে সুদূর চিন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌপথে আরবগণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূল ধরে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[২১০]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক মাওলানা আকরাম খাঁ তার রচিত 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন যে আরব বণিকগণ এ পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ

---

২১০ মুহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র*(ঢাকা : মদিনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২), পৃ. ৪১

(আসাম) হয়ে চিনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিলো মধ্য পথের প্রধান বন্দর।[২১১] বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পূর্বে তারা মদ্রাজ উপকূলেও নোঙ্গর করতেন বলে প্রতীয়মান হয়।[২১২]

মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়াযির গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবি আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওয়াহিব রা. নবুওয়াতের ৫ম সনে খৃস্টীয় ৬১৫ সালে হাবশায় হিজরত করেন। নবওয়াতের ৭ম সনে তিনি কায়িস ইবন হুযাইফা, উরওয়াহ ইবন আছাছা, আবু কায়িস ইবন হারিস রা. এবং কিছু সংখ্যক হাবশি মুসলিমসহ দু'টি জাহাজে চড়ে চিনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেন।[২১৩] শাইখ যাইনুদ্দিন তার রচিত গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুজাহিদিন'-এ উল্লেখ করেন যে, ভারতের তামিল ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে একদল আরব জাহাজে চড়ে মালাবার এসেছিলেন। তাদের প্রভাবে রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় গিয়ে কিছুকাল রাসূলুল্লাহ সা.-এর সান্নিধ্যে থাকেন।[২১৪] আবু ওয়াক্কাস রা. দীর্ঘ ৯ বছর সফরে ছিলেন। মালাবার বা চেরর রাজা চেরুমল পেরুমল তাঁর কাছেই ইসলামের দা'ওয়াত পেয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। চিন যাওয়ার পথে তাকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে নোঙ্গর করতে হয়েছে। আর তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এসে বাংলাদেশের কিছু সংখ্য মানুষ নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। চিনের মুসলিমদের প্রাচীন বই-পুস্তক থেকে জানা যায় যে, আবু ওয়াক্কাস রা. তাঁর সাথীদের নিয়ে খ্রিস্টীয় ৬২৬ সনে চিনে পৌঁছেন।[২১৫] তিনি ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। সমুদ্র তীরের কোয়াংটা মসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন। মসজিদের নিকটেই রয়েছে তাঁর সমাধি। দু'জন সাহাবির কবর রয়েছে চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের উপর। চতুর্থজন দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করেন।[২১৬]

এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগেই চিনে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌঁছে এবং তা পৌঁছে একদল খাঁটি আরব মুসলিমের নেতৃত্বে। যারা বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে নোঙ্গর করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে চিন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন তারা বাংলাদেশেও অবশ্যই ইসলাম প্রচার করেছেন। আর তা যদি হয়ে থাকে তাহলে খৃস্টীয় সপ্তম শতকেই বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে।

আরব ভূগোলবিদ ইবন খুরদাধবিহ উল্লেখ করেন যে সরন্দ্বীপ (শ্রীলঙ্কা) এবং গোদাবরি নদী পেরিয়ে এগিয়ে গেলে সমন্দর নামে একটি বন্দর রয়েছে যার আশেপাশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। তিনি আরো জানান যে, এ বন্দরে কামরূপ (আসাম) থেকে মিষ্টি পানির পথে ১৫/২০ দিনে নৌকাযোগে চন্দন কাঠ আনা হয়।[২১৭] আরব ভূগোলবিদ আল-ইদরিসিও এ বন্দরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটা একটা বড়ো বন্দর এবং কামরূপ থেকে নদীপথে কাঠ এনে এখানে বিক্রি করা হতো। তিনি আরো জানান যে এ বন্দরুট একটা বড়ো নদীর মোহনায় অবস্থিত।[২১৮] এসব বর্ণনা ইঙ্গিত বহন করে যে মেঘনা তীরের চাঁদপুরই ছিলো সে নদীবন্দর যেখানে আরব বণিকগণ প্রধানত চন্দন কাঠের জন্য আসতেন। আল-ইদরিসি লিখেন যে, বাগদাদ ও বসরা থেকে আরব বণিক ও পর্যটকগণ মেঘনার মোহনার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আসা-

---

২১১ মুহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২১২ প্রাগুক্ত।

২১৩ মুহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২১৪ প্রাগুক্ত।

২১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২১৬ প্রাগুক্ত।

২১৭ ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল*(ঢাকা : ইফাবা, নভেম্বর ২০০৩), পৃ. ৩০

২১৮ প্রাগুক্ত।

যাওয়া করতেন। এছাড়া আরব ভূগোলবিদ ইবন খুরদাধবিহ লিখেন যে, সরন্দ্বীপের পর জাজিরাতুর রামি নামক একটা ভূখণ্ড রয়েছে।[২১৯] অন্য আরব ভূগোলবিদ আল-মাস'উদি উল্লেখ করেন যে ভারত সাগরের তীরে নদী বেধৌত একটা দেশ রয়েছে।[২২০] অপর আরব ভূগোলবিদ ইয়াকুত ইবন আব্দুল্লাহ বলেন যে এ ভূখন্ডটা মালাক্কার দিকে ভারতের দূরতম অঞ্চল।[২২১] এক সময় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রামি বা রামু নামে একটা রাজ্য ছিলো। সুলাইমান নামক একজন আরব বণিক বলেন যে রামির রাজার ৫০ হাজার হাতি ও ১৫ হাজার সৈন্য ছিলো।[২২২]

এসব তথ্য ইঙ্গিত বহন করে যে আরব ভূগোলবিদগণ জাজিরাতুর রামি নামে যে ভূখণ্ডের উল্লেখ করেছেন তা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই ছিলো। কক্সবাজারের সমুদ্র সন্নিটকবর্তী বর্তমানের রামু সে রাজ্যেরই একটা ক্ষুদ্রাংশ। আরব ভূগোলবিদগণের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরব বণিকগণ তাদের বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম আসতেন এবং মসলা, হাতির দাঁত, সূতি বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করতেন।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে পালবংশের রাজত্ব শুরু হয়। পালগণ বৌদ্ধ ছিলেন। পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল। তিনি ৭৭০ খ্রি. থেকে ৮১০ খ্রি. পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ধর্মপাল পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে কান্যকুব্জে অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর রাজ্যের রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন। ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মুজমদার মন্তব্য করেন যে যবন রাজ্যটি সম্ভবত সিন্ধু নদীর তীরবর্তী কোনো মুসলিম অধিকৃত রাজ্য হবে।[২২৩] ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের উক্তি থেকে বুঝা যায় যে খ্রিস্টীয় ৮ম শতকের শেষভাগ এবং ৯ম শতকের প্রথম ভাগে সিন্ধু নদের তীরবর্তী আরব মুসলিম শাসিত এক বা একাধিক রাজ্যের সাথে পাল শাসিত বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিলো। খ্রিস্টীয় ৭৫০ সনে বাংলাদেশে পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয় আর একই সনেই বাগদাদে আব্বাসিয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপাল যখন বাংলার শাসক তখন বাগদাদের খলিফা ছিলেন হারুনুর রশিদ। রাজশাহির পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহার খননকালে একটা আরবি মুদ্রা পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটা তৈরি হয়েছে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনকালে।[২২৪] কুমিল্লা জিলার ময়নামতিতে অনরূপ খননকার্য কালে আব্বাসিয় যুগের দু'টি মুদ্রা পাওয়া যায়।[২২৫] সম্প্রতি লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরিতে নির্মিত একটা প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। উপকূলীয় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির বিভিন্ন স্থানের নাম ও ভাষায় আরবি অপভ্রংশের প্রচুর উপস্থিতি রয়েছে। এসব মুদ্রাপ্রাপ্তি ও অন্যান্য ঘটনা এ কথাই প্রমাণ করে যে খ্রিস্টীয় ৯ম শতকে বাংলাদেশে আরব মুসলিমদের যাতায়াত ছিলো।

বাংলাদেশের সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরের তীরে রয়েছে আরাকান। এক সময় এটা বড়ো একটা রাজ্য ছিলো। আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রাজা মা-বা তুইং ৭৫০ খ্রি. থেকে ৮১০ খ্রি. পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। উল্লেখ্য যে, সে সময় বাংলাদেশের শাসক ছিলেন বৌদ্ধ

---

২১৯ ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২২০ https://www.google.com.bd/search?q=বাংলাদেশের+ইতিহাস+:+প্রাচীন+যুগ, on 1.8.2014

২২১ ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২২২ প্রাগুক্ত।

২২৩ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ*(কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৪৩-৪৪

২২৪ ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

২২৫ প্রাগুক্ত।

রাজা ধর্মপাল। আর বাগদাদকেন্দ্রিক বিশাল আব্বাসিয় খিলাফতের খলিফা ছিলেন হারুনুর রশিদ। রাজা মা-বা-তুইং-এর শাসনকালে আরব মুসলিমদের কয়েকটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে আরাকান উপকূলের নিকটে বিধ্বস্ত হয়। যাত্রীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তারা রামরি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তারা আরাকানের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে রাজার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের আলাপ ও আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাদের বসবাসের জন্য কয়েকটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দেন। আরব মুসলিমগণ সে গ্রামগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[২২৬] আরাকানের ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায় যে, রাজা Tsu-la-Taing-Tsan-da-ya ৯৫১ খ্রি. থেকে ৯৫৭ খ্রি. পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন। তাঁর রাজত্বকালে একজন থু-রা-তান (Thu-ra-tan) কে পরাজিত করে তিনি Tset-ta-going (চাটিগাঁও) নামক স্থানে একটা বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন। গবেষকদের মতে থু-রা-তান শব্দটা আরবি শব্দ সুলতান-এর অপভ্রংশ রূপ।[২২৭] এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, খ্রি. ১০ম শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম জনপদ গড়ে উঠে এবং মুসলিমদের নেতা এতোখানি শক্তিধর হয়ে উঠে যে আরাকান-রাজ তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ইসলামের সোনালি যুগের এবং এর নিকটবর্তী যুগের মুসলিমগণ যে উদ্দেশ্যে যেখানেই গমন করতেন না কেনো তারা ইসলামি জীবনদর্শনের মর্মকথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেসব মুসলিম বাংলাদেশে এসেছিলেন তারাও নিশ্চয়ই দা'ঈ ও মুবাল্লিগ হিসেবে তাদের কর্তব্য পালন করেছেন। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্যই এসেছেন অনেকেই। মধ্য এশিয়ার বালখের শাসক শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখি রাজ্য শাসন ত্যাগ করে দামিশক এসে তাওফিক নামক একজন বুযুর্গের সান্নিধ্যে থাকেন বহু বছর। উক্ত বুযুর্গ তাকে বাংলাদেশে এসে ইসলাম প্রচারে উৎসাহিত করেন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখি নৌপথে সন্দীপ পৌঁছেন। অতঃপর নৌপথে তিনি আসেন হিন্দু রাজা বলরামের রাজ্য হরিরামনগর। সম্ভবত মানিকগঞ্জ জিলার হরিরামপুরই সে কালের হরিরামনগর। রাজা বলরাম একজন মুসলিম দা'ঈ ও মুবাল্লিগের উপস্থিতি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখি ও তাঁর সঙ্গীদের উপর চড়াও হন। সুলতান বালখিও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। সংঘর্ষে রাজা নিহত হন। রাজার মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলতান বালখি এ নও মুসলিম মন্ত্রীকেই সিংহাসনে বসান। এরপর তিনি রাজা পরশুরামের রাজ্য বগুড়ার মহাস্থানে আসেন। রাজার বোন শিলাদেবি তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করে সুলতান বালখিকে তাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রাজা পরশুরাম সুলতান বালখি ও তাঁর সঙ্গীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালান। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। পরে তার মন্ত্রীও যুদ্ধ চালিয়ে প্রাণ হারান। শিলাদেবি কালি মন্দিরে আশ্রয় নেন। পরে করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। রাজকুমারি রত্নমনি বন্দী হন। মুসলিমদের কথা ও আচরণ তাকে মুগ্ধ করে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নিহত রাজা পরশুরামের সেনাপতি সুরখাবও ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলতান বালখির উদ্যোগে সুরখাব ও রত্নমনির বিয়ে সুসম্পন্ন হয়।[২২৮] মহাস্থানে শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখি মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষালয় স্থাপন করেন। নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

খ্রিস্টীয় ১১শ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের নেত্রকোনা অঞ্চলে এসেছিলেন একজন বিশিষ্ট দা'ঈ ও মুবাল্লিগ। তাঁর নাম শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমি। তিনি ১০৫৩ সনেও জীবিত ছিলেন।

---

২২৬ ড. আবদুল করীম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*(ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯৯), পৃ. ১৫-১৬
২২৭ ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২২৮ ড. এনামুল হক, *এ হিস্ট্রি অব সুফিজম ইন বেঙ্গল*(ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯৫), পৃ. ২০৮

একদল সঙ্গী নিয়ে তিনি মদনপুর নামক স্থানে পৌঁছেন। এটা ছিলো তখন একজন কোচ রাজার শাসনাধীন। কোচ রাজা প্রথমে তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। পতে তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়। কোচ রাজা সুলতান রুমিকে মদনপুর গ্রামটা দান করেন। এখানে অবস্থান করে তিনি ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[২২৯]

খ্রিস্টীয় ১২শ শতকের গোড়ার দিকে বিক্রমপুরে (যার একাংশ মুনশিগঞ্জ জিলার অন্তর্ভুক্ত) একদল সঙ্গী নিয়ে আদম নামক একজন দা'ঈ ও মুবাল্লিগ এসেছিলেন। এ স্থানটি তখন বল্লাল সেন নামক একজন রাজার শাসনধীন ছিলো। আদম সঙ্গীদেরকে নিয়ে এক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে খাওয়ার জন্য একটা গরু জবাই করেন। একটা কাক গরুর গোশতের একটা টুকরো নিয়ে উড়ে যায়। আরেকটা কাকের তাড়া খেয়ে কাকটা গরুর গোশতের টুকরোটা ফেলে দেয়। রাজা বল্লাল সেনের সৈন্যদের একটা ক্যাম্পে গোশতের টুকরোটা পড়ে। সৈন্যরা বিষয়টা রাজাকে জানায়। হিন্দুরাজা বল্লাল সেন রাগান্বিত হন এবং মুবাল্লিগ দলের উপর হামলা করার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। আদমের নেতুত্বে মুবাল্লিগগণ আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। ১৪ দিন পর্যন্ত লড়াই চলে। ১৫তম দিনে রাজা নিজে রণাঙ্গনে আসেন। ১৪ দিন যুদ্ধ চলাতে রাজা বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি রাজধানীতে একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করালেন এবং মহিলাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি পরাজিত হয়েছেন জানতে পেলে তারা যেনো অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তিনি তার পোশাকের নিচে একটা কবুতর লুকিয়ে নিলেন। বলে গেলেন যে কবুতরটা উড়ে আসলে বুঝতে হবে যে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছেন। রাজার প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসলিমগণ একে একে প্রাণ হারাতে থাকেন। অবশেষে আদমও শাহাদাত বরণ করেন। এটা ছিলো ১১১৯ সনে ঘটনা। রামপাল গ্রামে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজা পুকুরে নেমে রক্তে রঞ্জিত পোশাক ধুতে থাকেন। হঠাৎ কবুতরটা পোশাকের নিচ থেকে বেরিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে উড়ে যায়। তার আগমনে রমণীকূল অীগ্নকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রাজা ছুটলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। এসে দেখেন সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শোকের প্রাবল্যে তিনিও ঝাঁপ দিলেন সে অগ্নিকুণ্ডে।[২৩০] মনে হয় স্থানীয় লোকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুসলিম ছিলেন। তারা শহিদ আদম এবং তাঁর সাথীদের মৃতদেহ কবরস্ত করেন। অমুসলিমদের তো মুসলিমদের মৃতদেহ দাফন করার পদ্ধতি জানা থাকার কথা নয়।

খ্রিস্টীয় ১২শ শতকের শেষ দিকে শাহ মাখদুম নামে একজন দা'ঈ ও মুবাল্লিগ আসেন রাজশাহি অঞ্চলে। খ্রিস্টীয় ১১৮৪ সনেও তিনি সেখানে ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে অঞ্চলে তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ। রামপুর নামক গ্রামে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর আচরণ লোকদেরকে আকৃষ্ট করে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতো। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে কিংবা তাঁর সান্নিধ্যে থাকার আকর্ষণে বহু নও-মুসলিম রামপুর গ্রামে বসতি সস্থাপন করেন। তাদের সংখ্যা এতো বেশি হয় যে রামপুর গ্রামে আর ঠাঁই মিলছিলো না। তাই পার্শ্ববর্তী গ্রাম বোয়ালিয়াতেও তারা বসবাস করতে শুরু করেন। রামপুর-বোয়ালিয়া বাস্তবে ইসলামি লোকালয়ে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে এ রামপুর-বোয়ালিয়াকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে রাজশাহি শহর গড়ে উঠে।

---

২২৯ আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*(ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৭৯), পৃ. ৬৯

২৩০ ড. এনামুল হক, *এ হিস্ট্রি অব সুফিজম ইন বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

বাংলাদেশে পাল বংশের শাসন এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেনগণ বৌদ্ধ পালদেরকে পরাজিত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রিস্টীয় ১২শ শতকের গোড়ার দিকে ১১২৫ খ্রি. বিজয় সেন নদিয়াকেন্দ্রিক রাজ্যের অধিপতি হন। বিজয় সেনের পুত্র ছিলেন বল্লাল সেন। আর বল্লাল সেনের পুত্র ছিলেন লক্ষণ সেন। উত্তরে গৌড় ও পূর্বে বিক্রমপুর পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিলো। সেনগণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তারা পালদেরকে উৎখাত করেন। প্রজাগণের উপর হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালান। কৌলিণ্য প্রথা প্রবর্তন করে তারা সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করেন। সেন রাজাদের রাজত্বকালেও বাংলাদেশে মুসলিমদের যায়াত ছিলো। ইতিহাসবিদ মিনজাদুদ্দিন সিরাজ রচিত তাবাকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বিক্রয়ের জন্য উন্নত জাতের ঘোড়া নিয়ে মুসলিম বণিকগণ স্থল পথে নদিয়া– বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য স্থানে আসতেন।[২৩১]

এদেশে অসংখ্য ইসলাম প্রচারক সূফি, পীর-মাশাইখ, উলামা, মুসলিম ব্যবসায়ী ও মুসলিম শাসকগণের প্রচেষ্টায় অত্র এলাকায় ইসলামের প্রসার ঘটে এবং এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। তবে অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচারে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হলেন পীর-মাশাইখ, সুফিয়ানে কিরাম। তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, চারিত্রিক গুণাবলি ও সাধারণ মানুষের সেবার নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৩২]

যাদের দা'ওয়াতে বাংলদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে : ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যারা এ অঞ্চলে আগমন করেন তারা মূলত আরব, মধ্যএশিয়া ও পারস্য থেকে এ দেশে আগমন করেন। এক নজরে তারা হলেন–
(১) আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব রা. (৬১৭ খ্রি. চট্টগ্রাম, চাঁদপুর) (২) কায়েস ইবন হুযাইফা রা. (৬১৭ খ্রি. চট্টগ্রাম, চাঁদপুর) (৩) উরওয়াহ ইবন আছাছা রা. (৬১৭ খ্রি. চট্টগ্রাম, চাঁদপুর) (৪) আবু কায়েস ইবন হারিস রা. (৬১৭ খ্রি. চট্টগ্রাম, চাঁদপুর) (৫) শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখি রহ. (১০৪৭ খ্রি. বগুড়ার মহাস্থান) (৬) শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমি রহ. (১০৫৩ খ্রি. নেত্রকোনা) (৭) বাবা আদম শহিদ রহ. (১১১৯ খ্রি. মুনশিগঞ্জ) (৮) শাহ মাখদুম রুপোশ রহ. (১২৮৯ খ্রি. রাজশাহি) (৯) শাহ নি'আমত উল্লাহ বুতশিকন রহ. (১১২০ খ্রি. ঢাকা) (১০) জালালুদ্দিন তাবরিযি রহ. (১২০৫ খ্রি.) (১১) তাকিউদ্দিন আল-আরাবি রহ. (১২৫০ খ্রি. ধামুরাইহাট, নওগাঁ) (১২) শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা রহ. (১৩০০ খ্রি. সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ) (১৩) শাহজালাল ইয়ামনি রহ. (১৩০৩ খ্রি. সিলেট) (১৪) ফরিদুদ্দিন শক্করগঞ্জ রহ. (মৃ. ১২৬৯ খ্রি.) (১৫) শাহ বদরুদ্দিন আল্লামা রহ. (মৃ. ১৩৯৭ খ্রি.) (১৬) নূর কুতুবুল আলম রহ. (মৃ. ১৪৪৭ খ্রি.) (১৭) খান জাহান আলী রহ. (মৃ. ১৪৫৮ খ্রি.) এবং আরো অনেক অলি আল্লাহ।

যেসব মুসলিম শাসকগণের যুগে বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার ঘটে : প্রসিদ্ধ মুসলিম শাসকগণের নাম নিম্নরূপ :

(১) ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খালজি রহ. (মৃ. ১২০৬ খ্রি.) (২) ইযযুদ্দিন মুহাম্মদ শিরান খালজি (মৃ. ১২০৮ খ্রি) (৩) হুসামউদ্দিন আইওয়াদ খালজি (মৃ. ১২১০) (৪) আলি মারদান খালজি (মৃ. ১২১৩) (৫) গিয়াসউদ্দিন আইয়াদ খালজি (মৃ. ১২২৭ খ্রি.) (৬) প্রিন্স

---

২৩১ ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২৩২ ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতের পথে সমস্যা ও সমাধান*(কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), পৃ. ৯

নাসিরুদ্দিন (মৃ. ১২২৯ খ্রি.) (৭) মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন বলকা খালজি (মৃ. ১২৩১ খ্রি.) (৮) মালিক আলাউদ্দিন মাস'উদ জানী (৯) মালিক সাইফুদ্দিন আইবেক (মৃ. ১২৩২ খ্রি.) (১০) তুগ্রল তুগান খান (১১) মালিক তামার খান (মৃ. ১২৪৬ খ্রি.) (১২) মালিক জালালুদ্দিন মাস'উদ জানী (১৩) মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন ইউজবাক (মৃ. ১২৫৭ খ্রি.) (১৪) মালিক ইযযুদ্দিন বলবন ইউজবাকি (মৃ. ১২৫৯ খ্রি.) (১৫) মালিক তাজউদ্দিন আরসালান (১৬) তাতার খান (মৃ. ১২৬৮ খ্রি.) (১৭) শের খান (মৃ. ১২৭২ খ্রি.) (১৮) আমিন খান মুগিসুদ্দিন তুগ্রল (মৃ. ১২৮০ খ্রি.) (১৯) সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বুগরা খান (মৃ. ১২৯০ খ্রি.) (২০) সুলতান রুকনুদ্দিন কাইকাউস (মৃ. ১৩০০ খ্রি.) (২১) সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ (মৃ. ১৩২২ খ্রি.) (২২) নাসিরুদ্দিন ইবরাহিম (২৩) বাহরাম খান, বাহাদুর শাহ (২৪) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ রহ. (মৃ. ১৩৪৯ খ্রি.) (২৫) আলাউদ্দিন আলি শাহ, ইখতিয়ারউদ্দিন গাজি শাহ (২৬) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (মৃ. ১৩৫৭ খ্রি.) (২৭) আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ (মৃ. ১৩৯০ খ্রি.) (২৮) গিয়াসুদ্দিন আযম শাহ (মৃ. ১৪১২ খ্রি.) (২৯) সাইফুদ্দিন হামযা শাহ, শিহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহ (৩০) জালালুদ্দিন আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ শাহ (মৃ. ১৪৩৪ খ্রি.) (৩১) শামসুদ্দিন আবুল মুজাহিদ আহমাদ শাহ (৩২) নাসিরুদ্দিন আবুল মুযাফফর মাহমুদ শাহ (মৃ. ১৪৫৯ খ্রি.) (৩৩) রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ (মৃ. ১৪৭৫ খ্রি.) (৩৪) শামসুদ্দিন আবুল মুযাফফর ইউসুফ শাহ (মৃ. ১৪৮১ খ্রি.) (৩৫) জালালুদ্দিন আবুল মুযাফফর ফাতেহ শাহ (মৃ. ১৪৮৭ খ্রি.) (৩৬) সুলতান বারবাক শাহ (মৃ. ১৪৮৭ খ্রি.) (৩৭) সাইফুদ্দিন আবুল মুযাফফর ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয়) (মৃ. ১৪৮৯ খ্রি.) (৩৮) নাসিরুদ্দিন আবুল মুযাফফর মাহমুদ শাহ (দ্বিতীয়) (মৃ. ১৪৯১ খ্রি.) (৩৯) শামসুদ্দিন মুযাফফর শাহ সিদি বদর (৪০) আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ (মৃ. ১৫২০ খ্রি.) (৪১) নাসিরুদ্দিন আবুল মুযাফফর নুসরাত শাহ (মৃ. ১৫৩২ খ্রি.) (৪২) আলাউদ্দিন আবুল মুযাফফর ফিরোজ শাহ (মৃ. ১৫৩৩ খ্রি.) (৪৩) গিয়াসুদ্দিন আবুল মুযাফফর মাহমুদ শাহ (তৃতীয়) (মৃ. ১৫৩৮ খ্রি.) (৪৪) ফরিদুদ্দিন আবুল মুযাফফর শেরশাহ (মৃ. ১৫৪৫ খ্রি.) (৪৫) মুহাম্মদ খান শুর (মৃ. ১৫৫৫ খ্রি.) (৪৬) গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ (৪৭) গিয়াসুদ্দিন আবুল মুযাফফর জালাল শাহ (মৃ. ১৫৬৩ খ্রি.) (৪৮) তাজ খান কররানী (৪৯) সুলাইমান খান কররানী (মৃ. ১৫৭৩ খ্রি.) (৫০) বায়েজিদ খান কররানী (মৃ. ১৫৭৩ খ্রি.) (৫১) দাউদ খান কররানী (মৃ. ১৫৭৬ খ্রি.) (৫২) খান জাহান হুসাইন কুলি বেগ (মৃ. ১৫৭৮ খ্রি.) (৫৩) মুযাফফার খান তুরবাতি (মৃ. ১৫৮০ খ্রি.) (৫৪) খান-ই-আযম (৫৫) শাহবাজ খান (৫৬) সাঈদ খান (৫৭) কুতুবুদ্দিন খান কোকা (৫৮) জাহাঁগীর কুলি খান (৫৯) শাইখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান চিশতি (৬০) কাসিম খান (৬১) ইবরাহিম খান (৬২) মহব্বত খান (৬৩) মুকাররম খান (মৃ. ১৬২৭ খ্রি.) (৬৪) মির্যা হিদায়াতুল্লাহ ফিদাই খান (৬৫) কাসিম খান (মৃ. ১৬৩২ খ্রি.) (৬৬) আযম খান (৬৭) ইসলাম খান মাশহাদি (৬৮) শাহজাদা মুহাম্মদ শুজা (৬৯) মুয়াযযাম খান মীর জুমলা (৭০) দাউদ খান (৭১) শায়েস্তা খান (৭২) ফিদাই খান (আযম খান) (মৃ. ১৬৭৮ খ্রি.) (৭৩) শাহজাদা সুলতান মুহাম্মদ আযম (৭৪) শায়েস্তা খান (৭৫) খান-ই-জাহান বাহাদুর (৭৬) ইবরাহিম খান (৭৭) আযিমুদ্দিন (৭৮) সুলতান আওরঙ্গজেব (মৃ. ১৭০৭ খ্রি.) (৭৯) খান-ই-জাহান (৮০) ফারখুন্দা সিয়ার (৮১) মীর জুমলা উবাইদুল্লাহ (৮২) নওয়াব মুর্শিদ কুলি খান (মৃ. ১৭২৭ খ্রি.) (৮৩) শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান (মৃ. ১৭৩৯ খ্রি.) (৮৪) আলাউদ দাওলাত সরফরাজ খান (মৃ. ১৭৪০ খ্রি.) (৮৫) আলিবর্দি খান (মৃ. ১৭৫৬ খ্রি.) (৮৬) নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ খান (মৃ. ১৭৫৭ খ্রি.)।

এসব মুবাল্লিগগণের নাম ইতিহাসে এসেছে যাদের দা'ওয়াতি তৎপরতায় বর্ণবৈষম্যে অত্যাচারিত ও শাসন নিপীড়ণে বিপর্যস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধরা ব্যাপকহারে দলে দলে ইসলামের শান্তি ও ন্যায়ের বার্তা গ্রহণ করেছিলো। শুধু তাই নয় এ সময় অনেক শাসক ইসলামের

সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে সহযোগিতা করেন। আবার অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে মুবাল্লিগদের বিতাড়িত করার জন্য অস্ত্রধারণ করেন। অনেক মুবাল্লিগ এ সময় তাদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন যাদের মধ্যে বাবা আদম শহিদের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় মুবাল্লিগ ও নওমুসলিমরাও সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে এসব রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৩০৩ সালে বিখ্যাত শাহজালাল ইয়ামনি রহ. ৩৬০ জন সঙ্গীসহ রণপ্রস্তুতি নিয়েই দিল্লি থেকে সিলেটে আগমন করেছিলেন এবং অত্যাচারী রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করেন। তাঁর উন্নত চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলার হাজার হাজার হিন্দু-বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।[২৩৩]

উল্লিখিত তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আরব বণিক এবং দ্বীনের দা‘ঈ ও মুবাল্লিগদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো পৌছে। পরবর্তীকালে অনারব অঞ্চল থেকেও মুসলিমগণ এ দেশে আসতে থাকেন। মুসলিম বণিক এবং মুবাল্লিগদের উপস্থাপিত শিক্ষা ও আচরণ স্থানীয় লোকদের একাংশকে মুগ্ধ করে। তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম হন। এভাবেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম লোকালয় গড়ে উঠে। সকল প্রকারের দা‘ঈগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইসলামি দা‘ওয়াতের কাজ করেন। অনেকেই মসজিদ, মকতব, খানকা প্রতিষ্ঠা করেন, কেউ ওয়ায-নসিহত করেন, কেউ ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্র শক্তির মুকাবিলা করেন, কেউ দেশ শাসন করেন, কেউ সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। শান্তিপূর্ণ এসব দা‘ওয়াতি মিশনের ফলেই বাংলাদেশে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বর্তমান চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২৩৩ http://www.weeklysonarbangla.net/news_details, visited on 18.07.2014

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাক্কি সূরায় ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ : মাক্কি সূরায় ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পদ্ধতি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহ তা'আলা সত্য দ্বীন সহকারে মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক হিসেবে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক রূপে পাঠিয়েছেন।[১] বাল্যকাল থেকেই আল্লাহ তাকে দ্বীনের দা'ঈ হিসেবে প্রস্তুত করে নিতে থাকেন। জাহিলিয়াতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন্দ অভ্যাসগুলো থেকে আল্লাহ তাকে সর্বদাই দূরে ও মুক্ত রাখেন। নবুওয়াতের পূর্বে আরবে যে শিরক ও মূর্তিপূজার প্রচলন ছিলো তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনো কোনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি। মূর্তির নামে পশু উৎসর্গ করেননি এবং উৎসর্গকৃত কোনো প্রাণীর গোশতও আহার করেননি। তখন থেকেই তাঁর মনে তাওহিদের ধারণা বদ্ধমূল ছিলো। নবুওয়াতের পূর্বে মক্কায় কোনো অশ্লীল কাজে তিনি কখনো অংশগ্রহণ করেননি। তৎকালীন সমাজ তাকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় গুণাবলি, উন্নত মনোবল, উত্তম চরিত্রে বিভূষিত, নম্র, বিনয়ী, সত্যবাদী, আমানতদার, কটুক্তি ও অশ্লীল বাক্য ব্যবহারে বিমুখ ধারণা করতো। এমনকি তাঁর জাতির লোকেরা তাকে 'আস-সাদিক আল-আমিন' (বিশ্বস্ত আমানতদার) নামে আখ্যায়িত করে।[২]

জ্ঞান অন্বেষণ : হেরা গুহায় প্রথম অহি নাযিল হওয়ার মধ্য দিয়ে রাসূল সা. নবুওয়াত, আর সূরা মুদ্দাসসিরের মাধ্যমে রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে রাসূল সা.-কে জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তৎকালীন সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলো। বিশেষত সাহিত্যের অঙ্গনে তাদের বিচরণ ছিলো অত্যাধিক। এজন্য মহানবী সা.-কে দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রস্তুতিস্বরূপ জ্ঞান অর্জন করার আহ্বান জানানো হয়। কারণ আল্লাহর পথে মানুষকে যিনি দা'ওয়াত দিবেন, তাকে অবশ্যই উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত অহির জ্ঞান, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, বাতিলের পথ থেকে হকের পথে, সন্দেহ-সংশয় থেকে বিশ্বাসের পথে চলতে সাহায্য করে। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু সময় অহির আগমন বন্ধ থাকে।[৩] সময়টি ছিলো সূরা আলাক ও সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হওয়ার মধ্যবর্তী সময়। তারপরও আবার কিছুদিন অহি বন্ধ থাকার পর সূরা দুহা নাযিল হয়। ফলে রাসূল সা. অত্যন্ত অস্থির ও বিচলিত হয়ে মানসিকভাবে কষ্ট অনুভব করেন। তাঁর মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে মহান আল্লাহ অহি নাযিল করেন। এ সময় সূরা মুদ্দাসসিরের ১-৭ আয়াত নাযিল হয়, যার মাধ্যমে রাসূল সা.-কে দা'ওয়াতি কাজে অগ্রবর্তী হয়ে সংশোধন ও সংস্কারের নির্দেশসহ পবিত্রতা অর্জন, অন্যায়-অবিচার থেকে বিরত থাকা, অল্পে তুষ্ট থাকা ও যাবতীয় বাধা-বিপত্তিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪]

---

১ আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৫

২ ইবন হিশাম, অনূঃ মাওলানা আকরাম ফারূক ও অন্যান্য, *সীরাতুননবী (সা.)*(ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ১৯৯৪), খ.১, পৃ. ১৮৩

৩ আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনূঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী, *আর রহীকুল মাখতুম*(ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ৯ম সং., জুন ২০০৩), পৃ. ৮৬

৪ আল-কুরআন, ৭৪ : ১-৭

গোপনে দা'ওয়াতি কার্যক্রম : রাসূল সা.-এর প্রতি সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম ৭টি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ইসলামি দা'ওয়াতের সূচনা হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ শুরু করেন। সে সময় তিনি সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তিদের দা'ওয়াত দেয়ার টার্গেট নির্ধারণ করেন। স্বীয় পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ইসলামের সুমহান দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সে সকল লোকদের দা'ওয়াত দিয়েছেন, যাদের চেহারায় সরলতা ও নমনীয়তার ছাপ রয়েছে এবং যারা তাকে সত্যবাদী, ন্যায় পরায়ণ ও সৎমানুষ হিসেবে জানে ও শ্রদ্ধা করে।[৫] তাঁর স্ত্রী খাদিজা রা. অহির অবতরণ ও ওয়ারাকা ইবন নওফলের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তাঁর প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দেন এবং দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর রাসূল সা. তাঁর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে স্বীয় চাচাতো ভাই আলি রা. ও স্বীয় গোলাম যায়িদ ইবন হারিসা রা.-কে দা'ওয়াত দেন। এভাবে রাসূল সা. প্রথমে নিজ পরিবারে দা'ওয়াতের কাজ করেন। এরা সকলেই প্রিয় রাসূলের সততা, সত্যবাদিতা ও মহানুভবতা দেখে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। সর্বপ্রথম স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর রা., মহিলাদের মধ্যে খাদিজা রা., আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে যায়িদ ইবন হারিসা রা এবং বালকদের মধ্যে আলি রা.। ইতিহাসে তারা সাবিকিন আউয়ালিন নামে পরিচিত।[৬] খাদিজা রা. ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল সা. খাদিজাকে নিয়ে প্রথম দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। তখন সালাত দু'রাক'আতই ছিলো। পরে আলি রা.-কে নিয়ে কা'বাগৃহে সালাত আদায় করেন। আফিফ কিন্দি বলেন, আমি জাহিলি যুগে স্ত্রীর আতর ও কাপড় ক্রয় করার জন্য মক্কায় এসেছিলাম। সেখানে ভোর বেলায় কা'বার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। আমার সাথে আব্বাস রা.ও ছিলেন। এ সময় একজন যুবক আগমন করেন এবং একজন বালক এসে তাঁর ডান পাশে দাঁড়ায়। অতঃপর একজন নারী এসে তাদের পিছনে দাঁড়ায়। তারা দু'জন সালাত আদায় করে চলে গেলে আমি আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাস ঘটনাটা কি? তখন আব্বাস রা. বললেন, তুমি কি জানো এ যুবক ও মহিলাটা কে? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন যুবকটা হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ। আর বালকটা হচ্ছে আলি ইবন আবি তালিব। আর এ মহিলা হচ্ছে মুহাম্মদ সা.-এর স্ত্রী খাদিজা রা.। আমার ধারণা সারা পৃথিবীতে এ তিনজন ছাড়া কেউ তাদের দ্বীনের অনুসারী নেই। আফিফ বলেন, এ কথা শুনে আমার মনে হয়েছিলো, চতুর্থ ব্যক্তি যদি তাদের সাথে আমি হতাম।

আবু বকর রা. ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীন প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, নরম মেজায, উত্তম চরিত্র এবং উদার মনের মানুষ। চমৎকার ব্যবহারের কারণে সবসময় তার কাছে মানুষ আসা-যাওয়া করতো। এ সময় তিনি সমাজের এমন কিছু ব্যক্তিবর্গকে দা'ওয়াতের জন্য বেছে নিলেন, যাদের উপর তাঁর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় অনেক লোক ইসলামের অমীয় সুধা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা হলেন– উসমান, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ রা.। পরবর্তীতে এদের অনেকেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হন। এরা সংখ্যায় আট জন, তারাই ছিলো প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দল। তারা রাসূল সা.-এর প্রতি অহি নাযিলে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করেন। এভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় দলে দলে যোগদান করতে লাগলেন। মক্কার সর্বত্র ইসলামের আলোচনা চলতে থাকে এবং ইসলাম ব্যাপকতা লাভ করে।[৭] গোপন দা'ওয়াতে যারা ইসলাম

---

৫ আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনূঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী, *আর রহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৬ ইবন কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪২৫ হি.), খ.৩, পৃ. ৩১

৭ ইবন হিশাম, অনূঃ মাওলানা আকরাম ফারূক ও অন্যান্য, *সীরাতুননবী (সা.)*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৬২

গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা ছিলো ৬০ জন। যার মধ্যে ১২ জন মহিলা ও ১৪ জন গোলাম ছিলো।[৮]

দা'ওয়াতের এ পর্যায়ে রাসূল সা. নিজ পরিবারকে সর্বপ্রথম তাঁর এ কাজে সহযোগী স্থির করেন। ফলে সর্বপ্রথম স্বীয় স্ত্রীর নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন করেছিলেন। কারণ, নিজের স্ত্রী যদি তাঁর আদর্শের সাথে একমত না থাকে তাহলে এ কাজ যতই ভালো হোক অন্যরা তা গ্রহণ করতে কখনো এগিয়ে আসবে না। মানুষ কোনো ব্যক্তিকে তখনই সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করে যখন তাকে স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দেখে। রাসূল সা.-এর উপর দা'ওয়াতের এ গুরুদায়িত্ব সাময়িক কোনো কাজ ছিলো না। বরং এটা ছিলো মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব। ফলে পরিবারের সহযোগিতা না থাকলে এ কাজের ব্যবস্থাপনা করা দুরূহ ব্যাপার ছিলো। এ কারণে তিনি প্রথমেই তাঁর স্ত্রীকে এ কাজের সাথী হিসেবে পেলেন।

অপরদিকে আলি রা. ছিলেন তাঁর পরিবারের অন্য সদস্য ও স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত দশ বছর বয়সের এক বালক। আজ হয়তো সে বালক, কিন্তু আগামী দিনে সে হবে যুবক। একটা সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য যুবকদের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা যুবকেরাই সমাজ গড়ে; সমাজ ভাঙ্গে। সুতরাং যুবকেরা যদি প্রথমেই একটা আদর্শের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তাদের পক্ষে রিসালাতের এ মহান দায়িত্বের বোঝা বহন করা এবং সেটা প্রতিষ্ঠার কাজে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও যাবতীয় কষ্ট-মসিবত সহ্য করা সম্ভব। তাই তিনি এ পর্যায়ে আলি রা.-কে প্রথমে টার্গেট নিলেন।

অতঃপর তিনি স্বীয় ক্রীতদাস যায়িদ ইবন হারিসা রা.-কে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। মূলতঃ সে ছিলো তাঁর পরিবারেরই একজন সদস্য। পরিবারের ভালো-মন্দ সবই তার জানা আছে। তৎকালীন সমাজে দাস-দাসীদের মাধ্যমে মালিকগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাতো। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি ভালো না মন্দ তার পরিচয় পাওয়া যায় দাস-দাসীদের নিকট থেকে। অতএব, দাসদের ইসলাম গ্রহণ অত্যধিক গুরুত্বের দাবি রাখে।

এ পর্যায়ে তিনি জাহিলি সমাজের চরিত্রবান, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আবু বকর রা.-কে ইসলামের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হন। এভাবে গোপন দা'ওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী সকল মুসলিম নিজের জানমাল দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থেকে একজন নেতার আনুগত্যের পরাকাষ্ঠার অধীনে ইসলামের সুমহান আলোকে চারদিকে বিচ্ছুরিত করে দেন। স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা দা'ওয়াত দিয়েছেন। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে দা'ওয়াত দিলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো অত্যাধিক।

প্রাথমিক যুগের মাক্কি সূরাগুলোর আলোকে এ পর্যায়ে রাসূল সা.-এর গোপন দা'ওয়াতের পশ্চাতে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো–

- মক্কার কাফিররা যাতে এ বিষয়ে অবগত হয়ে প্রথম থেকে দা'ওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ না পায়।
- গোপন দা'ওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন একদল সাহায্যকারী লোক তৈরি অতীব প্রয়োজন ছিলো। কেননা, কোনো আদর্শই সমাজে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ সে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একদল সাহায্যকারী ও সমর্থক পাওয়া না যায়।

---

৮ ড. আকিল আব্দুহ মিশরি, *তারিখুদ দা'ওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ*(মদিনা মুনাওয়ারা : মাকতাবা দারুল মদিনা, ১৯৮৭), পৃ. ৮৬

- গোপন দা'ওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের জাহিলিয়াতের সকল বন্ধন ও সম্পর্ক ভুলে গিয়ে নতুন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। যা অতি অল্প সময়ে সম্ভব নয়, বরং সুদীর্ঘ সময়ে তিন বছরে এ ধরনের একদল ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন লোক তৈরি হয়েছিলো।
- গোপনে দা'ওয়াতি কাজ পরিচালনার মাধ্যমে মক্কার সকল গোত্রের নিকট দা'ওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিলো। সমাজের সকল শ্রেণি ও পর্যায়ের লোকদের অংশগ্রহণ একটি আন্দোলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- এ পর্যায়ে রাসূল সা. নবাগত মুসলিমদের 'দারুল আরকামে' প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যারা পরবর্তীতে কুরাইশদের নিষ্ঠুর, নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন ও কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সময়ও ইসলাম থেকে বিচ্যুত হননি। বরং সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় একতাবদ্ধ থেকে রাসূল সা.-কে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য সার্বক্ষণিক নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

প্রকাশ্য দা'ওয়াত : নবুওয়াতের সূচনালগ্নে সুদীর্ঘ তিন বছর গোপন দা'ওয়াতের মাধ্যমে যখন একদল লোক রাসূল সা.-এর আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীপ্ত শপথে মুষ্টিবদ্ধ হাতে দা'ওয়াতের কাজ পরিচালনা করছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে এ দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ج فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.

'তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করো এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উপহাসকারীদের বিপক্ষে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। অতএব তারা তা জানতে পারবে।'[৯]

কুরআনের অন্যত্র এ মর্মে ঘোষিত হয়েছে-

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ.

'আর আপনি নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনকে (আল্লাহর) ভয় প্রদর্শন করুন। মু'মিনদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি আপনি আপনার বাহুকে অবনত করুন। তারপর যদি তারা আপনার অবাধ্য হয়, তাহলে বলুন, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।'[১০]

আল্লাহর এ নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে রাসূল সা. ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে আল্লাহর নির্দেশিত মহাসত্য এবং আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন গ্রহণের জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানাতে প্রস্তুত হলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দু'টি মাধ্যম গ্রহণ করেন।

(ক) ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপন : ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্পর্ক বৃদ্ধির

---

৯ আল-কুরআন, ১৫ : ৯৪-৯৬

১০ আল-কুরআন, ২৬ : ২১৪-২১৬

অন্যতম রূপ হলো একত্রে আহার করা। রাসূল সা.-এর জীবনে এ পদ্ধতির সমাবেশ ঘটেছিলো। তিনি প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের নির্দেশ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব পরিবারের লোকদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করেন। এ ভোজে তাঁর চাচা হামযা রা., আবু তালিব ও আব্বাস রা.-এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গও যোগদান করেন। আহারের পর তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন,

'হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি আপনাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের এমন কল্যাণ নিয়ে আগমন করেছি, যা আরবের কোনো ব্যক্তি তার স্বজাতির জন্য কোনোদিন আনয়ন করেনি। আমি আপনাদেরকে সে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। এ কাজে আমার সাথী হওয়ার জন্য কে কে প্রস্তুত? সত্যের আহ্বানে আসুন। পথ প্রদর্শক কখনো তার সঙ্গীদের কাছে মিথ্যা বলে না। আল্লাহর শপথ! যদি সকল লোক মিথ্যা কথা বলে, তবুও আমি আপনাদের নিকট মিথ্যা বলবো না, যদি সকল লোক ধোঁকা দেয়, তবুও আমি ধোঁকা দিবো না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি বিশেষভাবে আপনাদের ও সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে মনোনীত।'

আল্লাহর শপথ! যেভাবে তোমরা নিদ্রা যাও সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে, যেভাবে তোমরা নিদ্রা থেকে উঠো সেভাবে তোমরা কবর থেকে জাগ্রত হবে। তোমরা যে কাজই করো না কেনো আল্লাহর কাছে তার জন্য অবশ্যই হিসেব দিতে হবে। ভালো কাজের জন্য ভালো পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য মন্দ বিনিময় পাবে। মনে রেখো, জান্নাত চিরস্থায়ী, জাহান্নামও চিরস্থায়ী। আল্লাহর শপথ! হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, আমি আপনাদের নিকট উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছি। আমার জ্ঞাতসারে জাতির মধ্যে কোনো যুবক তা নিয়ে আসেনি। আমি পৃথিবী ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। এসব বিষয় শুনে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী সকলে একটু নরম সুরে কথা বলতে লাগলো। আবু তালিব তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলো। কিন্তু পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগের পক্ষপাতি হলো না। আর আবু লাহাব বললো, চলো সে আমাদের ধ্বংস করে দিবে।'

(খ) সংক্ষিপ্ত জনসভা : জনসভার মাধ্যমে সমবেত অসংখ্য মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সহজ। অতএব, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে জনসভার গুরুত্ব অত্যাধিক। জনসভার প্রাঞ্জলময় ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় এবং মানুষের হৃদয়ে সত্য গ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তিকে কার্যকর করা যায়। ফলে কোনো কোনো ভাষণ যাদুর ন্যায় প্রভাব ফেলে থাকে। প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের এ পর্যায়ে রাসূল সা. এ পদ্ধতিটাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি হিম্মত ও সাহস সঞ্চার করে নতুন সম্ভাব্য সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে একদিন সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আরবের বিশেষ রীতি অনুযায়ী জনতাকে ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে কোনো বিপদের মুহূর্তে জনগণকে সাহায্যের জন্য একটা বিশেষ সাংকেতিক ধ্বনি দিয়ে ডাকার প্রথা প্রচলিত ছিলো। আর তা হলো, يَا صَبَاحَاه (হে প্রভাত কালের বিপদ!) তিনি সে পদ্ধতি অবলম্বন করে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে (ওহে ফিহরের বংশধর, ওহে আদির বংশধর!) ডাক দিলেন। অতঃপর কুরাইশ গোত্র ও আবু লাহাবসহ বিরাট জনতার দল ছুটে আসলো। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে রইলো কী হয়েছে তা জানার জন্য। রাসূল সা. প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন,

"أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليكم كذبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد".

'আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণের অপেক্ষায় রয়েছে। তারা এখনই তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই সমবেত স্বরে বলে উঠলো, হ্যাঁ কেনো করবো না? আমাদের জানামতে তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলোনি। তখন রাসূল সা. বললেন, তাহলে শোনো! আমি বলছি তোমরা এক আল্লাহকে প্রভু ও উপাস্য মেনে নাও। তা নাহলে তোমাদের উপর কঠিন আযাব নেমে আসবে।'[১১]

এভাবে তিনি অতি সংক্ষেপে প্রথমবারের মতো উন্মুক্তভাবে দা'ওয়াত পেশ করলেন। তাঁর চাচা আবু লাহাব কথাটা শোনামাত্রই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো, 'হতভাগা! তুমি আজকের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাও। এ কথা বলার জন্যই কি আমাদের এখানে ডেকেছিলে। ফলে আবু লাহাবসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে গেলো।[১২]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাসূল সা. দা'ওয়াতের প্রথম পর্যায়ে নিকটাত্মীয়দের ও নিজ বংশীয় লোকদের মাঝে এ মহান আহ্বান পৌঁছাতে সচেষ্ট ছিলেন। কেননা, নিকটতর লোকজনের সাথে দা'ঈকে সবসময় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে চলাফেরা করতে হয়। এমনকি বিভিন্ন বিপদাপদে তারা সর্বদা পাশে থাকে। কোনো ব্যক্তির ভালো-মন্দের সাক্ষ্য স্বীয় বংশের লোকদের দ্বারাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং নিজ বংশীয় লোকজন যদি কোনো ব্যক্তির আদর্শের প্রতি একাত্মতা পোষণ করে তাহলে সে আদর্শ বাস্তবায়ন করা অনেক সহজ হয়। আর যদি বংশের লোকেরা প্রথম বিরোধী ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে বহিরাগত লোকদের সে আদর্শ গ্রহণের প্রতি চরম অনীহা সৃষ্টি হয়। অতএব, যে কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ বংশের লোকদের সর্বপ্রথম সে আদর্শে অনুপ্রাণিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাসূল ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ দা'ঈ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মাক্কি সূরাগুলোর শিক্ষার আলোকে অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় তৎকালীন আরবের বর্বর ও জাহিলি সমাজে ইসলামি দা'ওয়াত উপস্থাপন করেছেন। তার দা'ওয়াত ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, কাফির-মুশরিক, নারী-পুরুষ, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলেই মাক্কি যুগের সূরাগুলোর দা'ওয়াতের আওতাভুক্ত ছিলো।

---

১১ ইবন হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি লি শারহি সহিহুল বুখারি*(কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত তুরাস, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.), খ.৮, পৃ. ৩৬০, হাদিস নং ৪৭৭০

১২ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২৪ হি.), খ.১, পৃ. ১২৮-১২৯, হাদিস নং ২০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মাক্কি সূরায় জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

মহান আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি মানবকুলকে সৃষ্টির পর রুহের জগতে রেখে দেন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় মানবজাতি ইহজগতে আগমন করেছে। কিন্তু এখানে তারা চিরদিন থাকবে না; বরং এটা নির্ধারিত সময়ের পর তাদেরকে বারযাখের জগতে চলে যেতে হবে। সেখানেও তারা চিরকাল থাকবে না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে এর অপেক্ষায় থাকতে হবে। তারপর হাশর, নশর ও বিচার শেষে তাদেরকে যেতে হবে আখিরাতের জগতের শেষ গন্তব্যস্থল চিরস্থায়ী ঠিকানায়। পৃথিবী বা কবর জগত কোনোটাই তাদের স্থায়ী ঠিকানা নয়; বরং যাত্রা পথে বিরতির স্থান মাত্র। তাদের ভ্রমণের যেখানে পরিসমাপ্তি ঘটবে, সেখানে দু'টো জায়গা আছে– একটা জান্নাত, অপরটা জাহান্নাম। যাত্রা শেষে তারা কে কোথায় যেতে চায় তা তাদেরকে এখনই এই ইহকালেই স্থির করতে হবে। কারণ ভুল পথে হেটে কখনোই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছা যাবে না। তাদের মধ্যে যারা জান্নাতে যাওয়ার ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে, তারা নিশ্চয়ই জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ বোধ করে। একজন দা'ঈ যখন তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দ্বীনের দা'ওয়াত দেন তিনি মূলত তাকে এই জান্নাতের দিকে দা'ওয়াত দেন। সাথে সাথে তিনি জাহান্নামের পথও ব্যাখ্যা করে থাকেন। পবিত্র কুরআনের মাক্কি সূরাগুলোতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা খুব বেশি রয়েছে। তাই এখানে মাক্কি সূরায় যে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা রয়েছে তা আলোচনা করা হলো :

মাক্কি সূরায় জান্নাতের বর্ণনা

জান্নাতের পরিচয়

আরবি জান্নাত (جنة) শব্দটা একবচন, বহুবচনে جنات, যার অর্থ ঘন সন্নিবেশিত বাগান, বাগ-বাগিচা। আরবিতে বাগানকে রওদাতুন (روضة) এবং হাদিকাতুন (حديقة)ও বলা হয়।[১৩]

কিন্তু জান্নাত (جنة) শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব একটা পরিভাষা। পারিভাষিক অর্থে জান্নাত বলতে এমন স্থানকে বুঝায়, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য প্রস্তুত ও নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যা দিগন্ত বিস্তৃত নানা রকম ফুলে ফুলে সুশোভিত সুরম্য অট্টালিকা সম্বলিত মনোমুগ্ধকর বাগান; যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহমান বিভিন্ন ধরনের নদীনালা ও ঘর্ণাধারা। যেখানে চির বসন্ত বিরাজমান। জান্নাতকে ফারসি ভাষায় বেহেশত বলা হয়। এখানে আরবি শব্দ জান্নাত ব্যবহার করা হবে।

জান্নাত চিরশান্তির জায়গা। সেখানে আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদ, চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ-আহলাদের চরম ও পরম ব্যবস্থা বিদ্যমান। সেখানে ভোগ-বিলাস ও পানাহারের আতিশয্য বিরাজমান। জান্নাতিরা যা কামনা করবে কিংবা কোনো কিছু পাওয়ার আহ্বান জানাবে, সকল কিছু পাবে। সেখানে সকলেই যুবক হয়ে বাস করবে। শরীরে কোনো রোগ-শোক জরাজীর্ণতা, মন্দা, বার্ধক্য, দুর্বলতা ও অপারগতা থাকবে না। যত ধরনের ফল-ফলাদি, খাদ্য-খাবার, পানীয়, দুধ, মধু, সুস্বাদু খাবার সব খেতে পারবে। ভোগ-বিলাসের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান। সেগুলো স্বাদ ও গন্ধ অপূর্ব। আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ-বিহার, খেলাধুলা,

১৩ ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াজিয*(কায়রো : দারুত তাহরির, ১৯৮৯), পৃ. ১২১

পর্যটন, বাজার করা ও শুভেচ্ছা-স্বাগত জানাতে পারবে। প্রাচুর্যের কোনো অভাব হবে না। দ্রুতগামী যানবাহনসহ মনের ইচ্ছা চোখের নিমিষেই পূরণ করতে পারবে।

নারীদের জন্য থাকবে নয়নাভিরাম স্বামী এবং স্বামীদের জন্য থাকবে নয়নাভিরাম স্ত্রী ও রূপবতী, লাবণ্যময়ী হুর। তারা সেখানে সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন-যাপন করবে। মানুষ সেখানে পেশাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা থেকে মুক্ত এবং নারীরা থাকবে ঋতুমুক্ত।

এক কথায়, পরম ও চরম শান্তি বলতে যা বুঝায়, তা সবই জান্নাতে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর সুখ-শান্তির যত ব্যবস্থা আছে, জান্নাতের সুখ-শান্তির তুলনায় তা কিছুই না। বরং তা পৃথিবীর সকল আরাম-আয়েশকে হার মানাবে। মানুষ সুখ পেতে চায়। তাই তাদের পরম সুখ লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

জান্নাতের ব্যাপক পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আক বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে।'[১৪]

জান্নাতের প্রকার

জান্নাতের নাম, অর্থ ও শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, জান্নাতের সিফাতসমূহ বিবেচনায় জান্নাতের নাম একাধিক। কিন্তু জান্নাত একাধিক নয়; জান্নাত একটিই। সুতরাং এ দিকটির বিবেচনায় একাধিক নামের অর্থ অভিন্ন আর জান্নাতের সিফাতসমূহের দিক বিবচনায় প্রতিটি নামের অর্থ ভিন্ন। বিভিন্ন প্রকার জান্নাতের কথাই কুরআন মাজিদে ও সহিহ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। জান্নাতগুলো হলো :

১. জান্নাতুল ফিরদাউস;[১৫]
২. জান্নাতুন নাঈম;[১৬]
৩. জান্নাতুল মা'ওয়া;[১৭]
৪. জান্নাত আদন;[১৮]
৫. জান্নাতু দারুস সালাম;[১৯]
৬. জান্নাতু দারুল খুলদ;[২০]
৭. জান্নাতু দারুল মাকাম[২১]
৮. জান্নাতু দারুল কারার।[২২]

এছাড়া জান্নাতের আরো কিছু স্তরের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। সেগুলো হলো–.

৯. আল-মাকামুল আমিন;[২৩]
১০. মাক'আদু সিদকিন।[২৪]

---

১৪ আল-কুরআন; ৩২ : ১৭
১৫ আল-কুরআন, ১৮ : ১০৭
১৬ আল-কুরআন, ৩১ : ৮
১৭ আল-কুরআন, ৫৩ : ১৫
১৮ আল-কুরআন, ১৯ : ৬১
১৯ আল-কুরআন, ১০ : ২৫
২০ আল-কুরআন, ৫০ : ১০
২১ আল-কুরআন, ৩৫ : ৩৫
২২ আল-কুরআন, ৪০ : ৩৯
২৩ আল-কুরআন, ৪৪ : ৫১

জান্নাতের অবস্থান : জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। রাসূল সা. বলেছেন– জান্নাত আসমানে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[২৫]

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى.

কুরআনে আরো আছে,[২৬]

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ.

এখানে وَمَا تُوْعَدُوْنَ দ্বারা জান্নাত উদ্দেশ্য।

জান্নাত হলো সপ্ত আকাশের উপরে অবস্থিত, যেখানে সৎ ও নেককার লোকদের আমলনামা থাকবে। এ জগতটার নাম ইল্লিয়্যিন।[২৭]

كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ.

সম্পূর্ণ জান্নাত হবে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত : জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল-ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্য শ্যামলতা কখনো ম্লান হবে না। এমন কি গোটা জান্নাত শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২৮]

لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا.

জান্নাতে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না : পৃথিবীতে মানুষ যতো বিত্তশালী হোক এবং যতো সুখ-শান্তিই ভোগ করুক না কেনো তবু কোনো না কোনো দুঃখ বা অশান্তি থাকেই। কোনো মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ সুখী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জান্নাতে কোনো দুঃখই থাকবে না, এমন কি পৃথিবীতে মাল্টি বিলিয়ন সম্পদের অধিকারী হয়েও আরো বেশি পাওয়ার জন্য এবং ভোগ করার জন্য দুঃখের শেষ থাকে না। পক্ষান্তরে জান্নাতিগণ– যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেয়া হবে তারও কোনো অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না এবং কোনোদিন সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না। আল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন,[২৯]

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ.

জান্নাতিগণ বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে চিরস্থায়ী আবাসস্থল দান করেছেন এবং আমাদের কোনো দুঃখ এবং ক্লান্তি নেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,[৩০]

اَلَّذِىْ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِه ج لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ.

জান্নাতে অশ্লীল কথাবার্তা শোনা যাবে না : পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ সমস্তই স্বার্থপরতা, অহংকার ও হিংসার কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। জান্নাতে স্বার্থপরতা, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি থাকবেনা। তাই সেখানে গিবত, পরনিন্দা, পরচর্চা, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীল কথাবার্তা

---

২৪ আল-কুরআন, ৫৪ : ৫৫
২৫ আল-কুরআন; ৫৩ : ১৩-১৫
২৬ আল-কুরআন; ৫১ : ২২
২৭ আল-কুরআন; ৮৩ : ১৮
২৮ আল-কুরআন; ৭৬ : ১৩
২৯ আল-কুরআন; ১৫ : ৪৮
৩০ আল-কুরআন; ৩৫ : ৩৫

ইত্যাদি থাকবে না। সেখানে শুধু সম্প্রীতি ও সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,[৩১]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلَّا سَلٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا.

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,[৩২]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا. إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا.

জান্নাতে কোনো মিথ্যা কথাও শ্রুত হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন,[৩৩]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا.

অবশ্য এ ব্যাপারে জান্নাতবাসীদের জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণই সুসংবাদ প্রদান করবে। ইরশাদ হচ্ছে,[৩৪]

حَتّٰى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.

জান্নাতিদের আর মৃত্যু হবে না : পৃথিবীতে যতগুলো বাস্তব ও চাক্ষুষ বস্তু আছে তার মধ্যে মৃত্যু একটা। প্রকৃতপক্ষে মানুষ পার্থিব কোনো বস্তু থেকেই অমনোযোগী ও গাফিল নয় একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। যদিও প্রত্যেকেরই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। তবুও মৃত্যুকে মানুষ ভীতির চোখে দেখে এবং মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এ ভীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি থাকবে জান্নাতিদের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,[৩৫]

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ.

জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান-যমিনের সমান : মহান প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে যারা ধাবিত হয় তারা জান্নাতের দিকে ধাবিত হয়, যে জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান-যমিনের সমান, যা মুত্তাকিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[৩৬]

وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۙ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

জান্নাতের দরজাসমূহ : পৃথিবীতে যেসব পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সৎকাজ করবে তাদের কাছে ফেরেশতাগণ জান্নাতের প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে যে, পৃথিবীতে অসীম ধৈর্য ধারণের কারণেই আজ আখিরাতের এ সর্বোত্তম পরিণাম। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,[৩৭]

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ. سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

মুত্তাকিদের জন্য যে উত্তম আবাস– চিরস্থায়ী জান্নাত, তার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যেমন আল্লাহর বাণী,[৩৮]

---

৩১ আল-কুরআন; ১৯ : ৬২
৩২ আল-কুরআন; ৫৬ : ২৫-২৬
৩৩ আল-কুরআন; ৭৮ : ৩৫
৩৪ আল-কুরআন; ৩৯ : ৭৩
৩৫ আল-কুরআন; ৪৪ : ৫৬
৩৬ আল-কুরআন; ৩ : ১৩৩
৩৭ আল-কুরআন; ১৩ : ২৩-২৪
৩৮ আল-কুরআন; ৩৮ : ৪৯-৫০

هٰذَا ذِكْرٌ وَّإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ. جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ.

জান্নাতের স্তরসমূহ : যারা সৎকর্ম করে আল্লাহর কাছে গমন করবে তাদের জন্য থাকবে উচ্চতম মর্যাদা।[৩৯]

জান্নাতিদের মর্যাদাভেদে জান্নাতের প্রকারভেদ : পবিত্র কুরআনে জান্নাতিদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ ডান দিকের দল এবং দ্বিতীয় ভাগ অগ্রবর্তী দল। ডান দিকে দল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,[৪০]

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ.

আর অগ্রবর্তী দলের লোকেরা অগ্রবর্তী এবং আল্লাহর সান্নিধ্যশালী। আল্লাহ বলেন,[৪১]

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ. أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ.

জান্নাতিদের উষ্ণ সম্বর্ধনা : মুত্তাকিদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে এ বলে অভ্যর্থনা জানাবে, তোমাদের প্রতি সালাম, শুভেচ্ছা, তোমরা সুখে থাকো এবং সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন জান্নাতিরা বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। পরিশ্রমকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪২]

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتّٰى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَه وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

জান্নাতের বহুতল ভবন ও নির্ঝরণী : যারা মুত্তাকি তাদের জন্য থাকবে কক্ষের উপর কক্ষ– বহুতল ভবন। এ অঙ্গীকার মহান আল্লাহ তা'আলা করেছেন। জান্নাতিদের বাসস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৩]

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ لا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ.

জান্নাতে সকল প্রকার মজাদার খাবার, পেয়ালা ও ফল-ফলাদি : জান্নাতিদের কাছে সোনার তৈরি পেয়ালা ও পানপাত্র পেশ করা হবে এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। আরও রয়েছে প্রচুর ফল-মূল। আল্লাহ বলেন,[৪৪]

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ إِلاَّ تُحْبَرُوْنَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ.

---

৩৯ আল-কুরআন; ২০ : ৭৫
৪০ আল-কুরআন; ৫৬ : ৮
৪১ আল-কুরআন; ৫৬ : ১০-১১
৪২ আল-কুরআন; ৩৯ : ৭৩-৭৪
৪৩ আল-কুরআন; ৩৯ : ২০
৪৪ আল-কুরআন; ৪৩ : ৭০-৭৩

জান্নাতে যা পেতে ইচ্ছে করবে তাই পাবে : পৃথিবীতে কোনো জিনিস পেতে হলে বা ভোগ করতে চাইলে সে জিনিসের জন্য চেষ্টা-শ্রম ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা ও সম্পদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জান্নাতে ইচ্ছে হওয়া মাত্রই সে জিনিস তার সামনে উপস্থিত পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৫]

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ.

জান্নাতে ফলের সাথে গোশতও থাকবে। বলা হয়েছে,[৪৬]

وَأَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ.

জান্নাতের এ দান স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে না। নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় চিরদিন প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৭]

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا.

জান্নাতের অসীম সুখ-সম্ভার কোনো দিন শেষ হবে না : পৃথিবীতে যদিও কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুখ-সম্ভোগ লাভ করতে পারে না। তবুও যতটুকু পায় তার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে চোর-ডাকাত, প্রতারক এবং মৃত্যুর ভয়ে। কিন্তু জান্নাতের নি'আমত এবং সুখ-সম্ভোগ কোনো দিন হ্রাস বা শেষ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৮]

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ. وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ. وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ. وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ. وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ. لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ.

অন্যত্র বলা হয়েছে,[৪৯]

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَه مِنْ نَّفَادٍ.

জান্নাতিদেরকে আল্লাহ পবিত্র স্ত্রী ও হুরদের সাথে বিয়ে দেবেন : জান্নাতিরা সামনা-সামনি সাজানো সারি সারি আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং আল্লাহ তাদের সাথে সুনয়না হুরদের বিয়ে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেন,[৫০]

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ.

জান্নাতিদের জন্য সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শন স্ত্রীগণ থাকবে। কুরআনে বলা হয়েছে,[৫১]

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ.

জান্নাতি হুরেরা কুমারী হবে : আল্লাহ জান্নাতি নারীদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদেরকে চিরকুমারী, কামিনী ও সমবয়স্কা বানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,[৫২]

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا.

---

৪৫ আল-কুরআন; ৪১ : ৩১-৩২
৪৬ আল-কুরআন; ৫২ : ২২
৪৭ আল-কুরআন; ১৯ : ৬২
৪৮ আল-কুরআন; ৫৬ : ২৮-৩৩
৪৯ আল-কুরআন; ৩৮ : ৫০-৫৪
৫০ আল-কুরআন; ৫২ : ২০
৫১ আল-কুরআন; ৫৫ : ৭০
৫২ আল-কুরআন; ৫৬ : ৩৫-৩৭

জান্নাতি হুরদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,[৫৩]

لَمْ يَطْمِسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

হুরেরা হবে আবরণে রক্ষিত উজ্জ্বল মণি-মুক্তার মতো সুন্দরী : হুরেরা মণি-মুক্তার মতো সুন্দরী উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,[৫৪]

وَحُوْرٌ عِيْنٌ. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ.

হুরদের নয়ন সর্বদাই অবনত, সুন্দর নয়ন বিশিষ্ট এবং তারা যেনো ডিমের আবরণের মধ্যে সুপ্ত উজ্জ্বল।[৫৫]

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ.

জান্নাতিরা সোনার খাটে মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে : তারা সোনার খাটে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে আরামের সাথে আলাপচারিতা করবে।[৫৬]

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ. مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ.

জান্নাতিরা ও তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে খাটে হেলান দিয়ে বসবে।[৫৭]

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ.

জান্নাতিদের খিদমতের জন্য অসংখ্য গিলমান থাকবে : জান্নাতিদের সেবার জন্য জান্নাতে হুরদের পাশাপাশি গিলমান থাকবে মণি-মুক্তার মতো ছড়ানো।[৫৮]

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ.

অন্যত্র বলা হয়েছে,[৫৯]

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا.

কচিকাঁচা ছোট শিশুদের আপ্যায়ন : শিশুরা আনন্দের খোরাক। তাদের কচিকাঁচা চাল-চলন মনোমুগ্ধকর। তারাই জান্নাতে আপ্যায়ন করবে এবং এ দৃশ্য অত্যন্ত আনন্দঘন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬০]

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ. بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ. لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ.

জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ : জান্নাতে মোট চার ধরনের নদী প্রবাহিত হবে। (১) পানি (২) দুধ (৩) মধু (৪) শরাব। এছাড়া ঝর্ণাগুলো হলো– (১) কাফুর নামক ঝর্ণা। এর পানি সুঘ্রাণ এবং সুশীতল। (২) সালসাবিল ঝর্ণা। এর পানি ফুটন্ত চা ও কফির ন্যায় সুগন্ধি ও উত্তপ্ত থাকবে। (৩) তাসনিম নামক ঝর্ণা। এর পানি থাকবে নাতিশীতোষ্ণ।

---

৫৩ আল-কুরআন; ৫৫ : ৫৬
৫৪ আল-কুরআন; ৫৬ : ২২-২৩
৫৫ আল-কুরআন; ৩৭ : ৪৮-৪৯
৫৬ আল-কুরআন; ৫৬ : ১৫-১৬
৫৭ আল-কুরআন; ৩৬ : ৫৬
৫৮ আল-কুরআন; ৫২ : ২৪
৫৯ আল-কুরআন; ৭৬ : ১৯
৬০ আল-কুরআন; ৫৬ : ১৭-২১

মু'মিন ও সৎলোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে জান্নাত নির্ধারণ করে রেখেছেন তার তলদেশ দিয়ে নদী ও ঝর্ণা প্রবাহমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬১]

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ.

মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ যে জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন তাতে থাকবে উপরোল্লিখিত চার প্রকার নদী। এর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,[৬২]

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ج وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ ج وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى.

জান্নাত থাকবে নিরাপদ স্থানে– উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬৩]

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ. فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ.

উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ। আল্লাহ বলেন,[৬৪]

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ.

উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।[৬৫]

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ.

জান্নাতিরা জান্নাতে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারাসমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে।[৬৬]

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ.

জান্নাতের প্রাসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসমূহ : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকিদের জন্য উত্তম বাসস্থানের ওয়াদা দিয়েছেন।[৬৭]

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ.

জান্নাতিরা জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।[৬৮]

وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,[৬৯]

أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا.

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,[৭০]

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ لا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ.

---

৬১ আল-কুরআন; ২ : ২৫
৬২ আল-কুরআন; ৪৭ : ১৫
৬৩ আল-কুরআন; ৪৪ : ৫১-৫২
৬৪ আল-কুরআন; ৫৫ : ৫০
৬৫ আল-কুরআন; ৫৫ : ৬৬
৬৬ আল-কুরআন; ৫১ : ১৫-১৬
৬৭ আল-কুরআন; ৯ : ৭২
৬৮ আল-কুরআন; ৩৪ : ৩৭
৬৯ আল-কুরআন; ২৫ : ৭৫
৭০ আল-কুরআন; ৩৯ : ২০

জান্নাতের বৃক্ষ ও বিহঙ্গকুল : জান্নাতে রয়েছে কাঁটাবিহীন কুলগাছ, কাঁদি ভরা কলাগাছ; আর সম্প্রসারিত ছায়া। সদা প্রবাহমান পানি, প্রচুর ফলমূল ও বিহঙ্গকুল।[৭১]

وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ەلا مَا أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ. فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ. وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ. وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ. وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ. وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ.

জান্নাতে এমন দু'টি উদ্যন রয়েছে যা বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট।[৭২]

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتٰنِ. فَبِأَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ.

উক্ত দু'টি জান্নাত ছাড়াও আরো দু'টি জান্নাত রয়েছে যা ঘন সবুজে পরিবেষ্টিত।[৭৩]

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ. فَبِأَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. مُدْهَامَّتٰنِ.

মুত্তাকিরা ছায়া বিশিষ্ট ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে বসবাস করবে।[৭৪]

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ.

জান্নাতিদের আসবাবপত্র : জান্নাতিদের সামনে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হবে। সে কাঁচ যা রৌপ্য জাতীয় হবে এবং সেগুলোকে পরিমাণ মতো পরিপূর্ণ করে রাখা হবে।[৭৫]

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا. قَوَارِيْرَاْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا.

জান্নাতিদের সামনে সোনার থালা ও পানপাত্র আবর্তিত হবে এবং মন মাতানো ও চোখ জুড়ানো আসবাবপত্র বিদ্যমান থাকবে।[৭৬]

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ.

জান্নাতিদের খাদ্য ও পানীয় : জান্নাতে থাকবে পছন্দ মতো ফলমূল ও আর ঈপ্সিত পাখির গোশত।[৭৭]

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ.

জান্নাতের ফলমূল ও পানীয় থাকবে বহুবিধ।[৭৮]

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ.

জান্নাতিরা এমন পূর্ণ পানপাত্র থেকে পান করবে যার মিশ্রণ হবে কাফুর। তারা প্রবাহিত প্রস্রবণ থেকেও পান করবে।[৭৯]

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا. عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا.

জান্নতিদের জীবনোপকরণ হবে অফুরন্ত; অগণিত।[৮০]

---

৭১ আল-কুরআন; ৫৬ : ২৭-৩২
৭২ আল-কুরআন; ৫৫ : ৪৬-৪৮
৭৩ আল-কুরআন; ৫৫ : ৬২-৬৪
৭৪ আল-কুরআন; ৭৭ : ৪১
৭৫ আল-কুরআন; ৭৬ : ১৫-১৬
৭৬ আল-কুরআন; ৪৩ : ৭১
৭৭ আল-কুরআন; ৫৬ : ২০-২১
৭৮ আল-কুরআন; ৩৮ : ৫১
৭৯ আল-কুরআন; ৭৬ : ৫-৬

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

জান্নাতিদের বলা হবে, তোমরা খাও ও পান করো মজা ও তৃপ্তি সহকারে।[৮১]

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

জান্নাতিরা জান্নাতে বাঞ্ছিত সুখভোগ করবে। তাদের অবস্থান হবে জান্নাতের উচ্চতম স্থানে। যেখানে ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলতে থাকবে। তারা তৃপ্তি সহকারে পানাহার করবে।[৮২]

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

জান্নাতের ফল দেখতে পৃথিবীর ফলের মতোই হবে।[৮৩]

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا.

জান্নাতবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার : জান্নাতিদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।[৮৪]

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ.

জান্নাতিদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র।[৮৫]

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,[৮৬]

ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا.

জান্নাতের বিছানা : জান্নাতে থাকবে উন্নত শয্যাসমূহ। আর প্রস্তুত থাকবে সারি সারি বালিশ এবং বিছানো গালিচা।[৮৭]

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ. وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ. وَزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ.

জান্নাতের গালিচার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের।[৮৮]

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.

জান্নাতিরা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর গালিচার উপরে।[৮৯]

---

৮০ আল-কুরআন; ৪০ : ৪০
৮১ আল-কুরআন; ৫২ : ১৯
৮২ আল-কুরআন; ৬৯ : ২১-২৪
৮৩ আল-কুরআন; ২ : ২৫
৮৪ আল-কুরআন; ২২ : ২৩
৮৫ আল-কুরআন; ১৮ : ৩১
৮৬ আল-কুরআন; ৭৬ : ২১
৮৭ আল-কুরআন; ৮৮ : ১৩-১৬
৮৮ আল-কুরআন; ৫৫ : ৫৪
৮৯ আল-কুরআন; ৫৫ : ৭৬

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.

জান্নাতিদের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি : তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা ও বৈরিতা থাকবে না। তারা ভাইয়ের মতো পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনসমূহে সমাসীন থাকবে।[৯০]

জান্নাতিরা জান্নাতি পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানসহ একান্নবর্তী পরিবারের ন্যায় বসবাস করবে : জান্নাতিদেরকে বংশের অন্যান্য জান্নাতিদের সাথে একত্রিত করা হবে।[৯১]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ.

জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান : জান্নাতিরা জান্নাতে চিরকাল থাকবে।[৯২]

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا.

রবের সামনে দণ্ডায়মানে ভীত ব্যক্তির জন্য দু'টি জান্নাত : আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হতে যারা ভীত তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত দু'টি জান্নাত।[৯৩]

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتٰنِ. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ.

জান্নাতিদের সর্বাধিক বড় নি'আমত আল্লাহর দর্শন লাভ : আল্লাহর দর্শনের ব্যাপারে কুরআনের মাত্র দু'জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। সূরা কিয়ামাতে এবং সূরা মুতাফ্‌ফিফিনে। যেমন–[৯৪]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

সূরা মুতাফফিফিনে বলা হয়েছে।[৯৫]

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ.

জান্নাত সর্বাধিক মূল্যবান জিনিস। তাই তা সংগ্রহের আপ্রাণ ও জোরদার চেষ্টা চালানো বাঞ্ছনীয়। তাকওয়া মূলত: জান্নাত লাভের উপায় এবং তা অর্জনের জন্য বাস্তব চেষ্টা ও পরিশ্রমের বাস্তব প্রশিক্ষণ।

মাক্কি সূরায় জাহান্নামের বর্ণনা

চির দুঃখ, কষ্ট, পেরেশানি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, বিড়ম্বনা,দুর্ভাগ্য, লজ্জা-শরম, ক্ষুধা-পিপাসা, আগুন, অশান্তি, হতাশা, নিরাশা, চীৎকার-কান্নাকাটি, শাস্তি, অভিশাপ, আযাব-গযব ও অসন্তোষের স্থান হলো জাহান্নাম, দোযখ বা নরক।[৯৬] জাহান্নামে শান্তির কোনো লেশমাত্র নেই। হাত-পা ও ঘাড়-গলা শিকলে বেঁধে বেড়ি পরিয়ে দলে দলে জাহান্নামের অতল গহ্বরে

---

৯০ আল-কুরআন; ১৫ : ৪৭
৯১ আল-কুরআন; ৫২ : ২১
৯২ আল-কুরআন; ১৮ : ১০৭-১০৮
৯৩ আল-কুরআন; ৫৫ : ৪৬-৫২
৯৪ আল-কুরআন; ৭৫ : ২২-২৩
৯৫ আল-কুরআন; ৮৩ : ১৫
৯৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা* অভিধান(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৩শ সং., সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ৩৭৮

নিক্ষেপ করা হবে। যেখানে শুধু অতি বেশি তেজ ও দাহ্য শক্তিসম্পন্ন আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। জাহান্নামের অগ্নিশিখা তারেকে উপর, নীচ এবং ডান ও বাম থেকে স্পর্শ করবে, জ্বালাতে-পোড়াতে থাকবে। একবার চামড়া পুড়ে গেলে আবারো নতুন চামড়া গজাবে যেনো বারবার আগুনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, পেটের নাড়ি-ভূড়ি গলে যাবে। এ হচ্ছে আযাবের উপর আযাব। তাতে তাতে পিপাসা না কমে আরো তীব্র হবে। অতি দুর্গন্ধময় যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত ঘাস ও গিসলিন হবে তাদের খাদ্য। ক্ষুধার তাড়নায় জঠর জ্বালায় তা ভক্ষণ করতে গেলে পেটের ভিতরে আরো যন্ত্রণা বাড়াবে। খাদ্য এবং পানীয় হবে আযাবের অন্যতম উপকরণ।

অতিশয় ঠাণ্ডা ও হিম প্রবাহ দ্বারাও আরেক প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। বরফের চেয়ে শতগুণ ঠান্ডা যামহারিরে তাদেরকে রাখা হবে। সে আযাব হবে করুণ। তারা শাস্তির মধ্যে মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু তা কবুল হবে না। নিরুপায় হয়ে জাহান্নাম থেকে বাইরে যেতে চাইবে। কিন্তু সেদিন কোনো সাহায্যকারী নেই, নেই কোনো সুপারিশকারী।

জাহান্নাম হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যাতনার বিশাল কারাগার। জাহান্নামে আযাবের কারণে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি দেহের মধ্যে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড, নাড়ি-ভূড়ি, শিরা-উপশিরা, অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি বিকৃতি ঘটবে। কিন্তু সে তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার অথবা পালিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তাও খোলা থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন,[৯৭]

وَمَا أَدْرٰكَ مَا سَقَرَ. لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

জাহান্নামিরা মরবেও না আবার জীবিতও থাকবে না।[৯৮]

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى.

জাহান্নামিরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে এর ক্ষিপ্রতার তর্জন-গর্জন শুনবে। তা উতাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ ও আক্রোশে এমন অবস্থা ধারণ করবে যেনো তা গোস্বায় ফেটে পড়বে।[৯৯]

إِذَا أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ.

জাহান্নামের শ্রেণিবিন্যাস : জাহান্নামের সাতটি দরজা বা স্তর আছে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত রয়েছে।[১০০]

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۭ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ.

জাহান্নাম হচ্ছে পরলোকের এমন একটা বিশাল এলাকা যেখানে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্ধারিত আছে। সেগুলোকে প্রধানত: সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১. হাবিয়া;[১০১]
২. জাহিম;[১০২]
৩. সাকার;[১০৩]

---

৯৭ আল-কুরআন; ৭৪ : ২৭-৩০
৯৮ আল-কুরআন; ৮৭ : ১৩
৯৯ আল-কুরআন; ৬৭ : ৭-৮
১০০ আল-কুরআন; ১৫ : ৪৪
১০১ আল-কুরআন; ১০১ : ৯
১০২ আল-কুরআন; ৭৯ : ৩৬
১০৩ আল-কুরআন; ৭৪ : ২৭

৪. লাযা;[১০৪]
৫. সা‘ঈর;[১০৫]
৬. হুতামাহ;[১০৬]
৭. জাহান্নাম।[১০৭]

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করবে। যেমন– কাফির, মুশরিক, ব্যভিচারি, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি সকলের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। আবার প্রত্যেকটি স্তরের অনেকগুলো ঘাঁটি আছে। যথা–

(ক) **গাসসাক :** এটা একটা হ্রদ। যা জাহান্নামিদের রক্ত, ঘাম ও পূঁজ ইত্যাদি প্রবাহিত হয়ে সেখানে জমা হবে।

(খ) **গিসলিন :** এটা হচ্ছে জাহান্নামিদের মল-মূত্র জমা হওয়ার স্থান। জাহান্নামিরা যখন খুব ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুবভ করবে তখন উপরোক্ত দু'জায়গা থেকে পানাহার করতে দেয়া হবে। তাছাড়া ‘তিনাতুল খাবাল’ নামক বিষ ও পূঁজে পরিপূর্ণ আরেকটি কুপের কথাও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) **স‘উদ :** এটা তিনাতুল খাবালের পাড়ে অবস্থিত একটা বিশাল পাহাড়। এক শ্রেণির জাহান্নামিদেরকে সে পাহাড়ের উপর উঠিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলা হবে। পুনরায় উঠানো হবে এবং ফেলা হবে– এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহপাক বলেন,[১০৮] سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا

(ঘ) **যুববুল হুযন :** এটা জাহান্নামিদের আরেকটি ঘাঁটি। এখানে অহংকারী লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

(ঙ) **গাই :** এটা জাহান্নামের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গা। কেননা ‘গাই’-এর ভীতিজনক হুংকার শ্রবণে জাহান্নামের অন্যান্য স্থান প্রতিদিন সেখান থেকে চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম : যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার ও অমান্য করবে তাদের জন্যই জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে।[১০৯]

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

জাহান্নামের অবস্থান : জাহান্নাম হলো সপ্ত যমিনের তলদেশে অবস্থিত, যেখানে অসৎ ও মন্দ লোকদের আমলনামা থাকবে। এ জগতটার নাম সিজ্জিন।[১১০]

إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ.

জ্বিন, মানুষ ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হবে : আল্লাহ জাহান্নামের জন্য এমন অনেক জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন যাদের অন্তর আছে, কিন্তু তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। চোখ আছে তবুও তারা দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু শুনে না। তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো।[১১১]

---

১০৪ আল-কুরআন; ৭০ : ১৫
১০৫ আল-কুরআন; ৪২ : ৭
১০৬ আল-কুরআন; ১০৪ : ৪
১০৭ আল-কুরআন; ৭৮ : ২১
১০৮ আল-কুরআন; ৭৪ : ১৭
১০৯ আল-কুরআন; ৬৭ : ৬
১১০ আল-কুরআন; ৮৩ : ৭
১১১ আল-কুরআন; ৭ : ১৭৯

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ صلى لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط أُولٰئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط أُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

জাহান্নামের ইন্ধন হবে পাথর এ মর্মে আল্লাহ বলেন,[১১২]

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج صلى أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

জাহান্নাম যাকে আহ্বান করবে : জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে আহ্বান করবে যে সত্য ও সুন্দর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।[১১৩]

تَدْعُوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّٰى. وَجَمَعَ فَأَوْعٰى.

জাহান্নামিদের গ্রাস করে জাহান্নাম তৃপ্ত হবে না : আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করার পর জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি পূর্ণ হয়েছো? জবাবে জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি?[১১৪]

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ.

জাহান্নামিরা ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন হবে : আল্লাহ নির্দেশ দিবেন– ধরো এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে ভালোভাবে বেধে দাও।[১১৫]

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ. ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ. ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ.

জাহান্নামিদের বলা হবে, চলো সে ছায়ার দিকে যা তিনটি শাখা বিশিষ্ট। যেখানে না ছায়া আছে আর না আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষাকারী কোনো বস্তু। সে আগুন প্রাসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। তা এমনভাবে লাফাতে থাকবে যা দেখলে মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উট।[১১৬]

اِنْطَلِقُوْا إِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ. لَا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ. إِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. كَأَنَّه جِمَالَةٌ صُفْرٌ.

জাহান্নামিদের গলায় শিকল ও জিঞ্জির লাগানো হবে, তখন তা ধরে টগবগে ফুটন্ত পানি দিয়ে টানা হবে এবং পরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[১১৭]

إِذِ الأَغْلٰلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ. فِي الْحَمِيْمِ لا ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ.

আল্লাহদ্রোহী লোকদের নিকৃষ্ট পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে তারা অনন্তকাল জ্বলবে। এটা অত্যন্ত খারাপ স্থান। সেখানে তারা টগবগ করা ফুটন্ত পানি, পূঁজ, রক্ত এবং এ ধরনের আরো অনেক কষ্টের স্বাদ আস্বাদন করবে।[১১৮]

وَإِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ. جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمِهَادُ. هٰذَا لا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ. وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِه أَزْوَاجٌ.

---

১১২ আল-কুরআন; ৮৩ : ৭
১১৩ আল-কুরআন; ৭০ : ১৭-১৮
১১৪ আল-কুরআন; ৫০ : ৩০
১১৫ আল-কুরআন; ৬৯ : ৩০-৩২
১১৬ আল-কুরআন; ৭৭ : ৩০-৩২
১১৭ আল-কুরআন; ৪০ : ৭১-৭২
১১৮ আল-কুরআন; ৩৮ : ৫৫-৫৮

জাহান্নামিদের মাথায় তীব্র গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, তাদের জন্য লোহার ডাণ্ডাবেড়ি থাকবে।[১১৯]

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ. يُصْهَرُ بِه مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ. وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ.

পূঁজ পান করানো হবে : জাহান্নামিদেরকে পূঁজের মতো নিকৃষ্ট বস্তু পান করানো হবে।[১২০]

مِّنْ وَّرَائِه جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ. يَّتَجَرَّعُه وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُه.

আগুনের পোশাক, গরম পানি ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে : জাহান্নামিদেরকে নানামুখী শাস্তি দেয়া হবে। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইলে তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।[১২১]

উপরে ও নিচে আগুনের ছাতা : জাহান্নামিদের নিচে ও উপরে এবং ডানে ও বামে আগুন ছাড়া আর কিছু থাকবে না।[১২২]

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ.

আকার-আকৃতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে আযাব দেয়া হবে : পৃথিবীর মতো এতো সুন্দর চেহারা বা আকার-আকৃতি জাহান্নামিদের থাকবে না। সেদিন তাদের চেহারাকে বিকৃতি ও কুৎসিত করে দেয়া হবে।[১২৩]

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَالَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ج كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُمُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا.

অন্যত্র বলা হয়েছে,[১২৪]

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ.

গায়ের চামড়া পরিবর্তন করে জ্বালানো হবে : যখন জাহান্নামিদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে পুড়ে গলে যাবে, তখন সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেয়া হবে।[১২৫]

كَلَّا ط إِنَّهَا لَظٰى. نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى.

কুরআনের অন্য আয়াতে রয়েছে,[১২৬]

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ.

জাহান্নামিরা অস্বস্তিকর ছায়ার মধ্যে থাকবে : তারা এমন ধোঁয়াটে ছায়ার মধ্যে থাকবে যা কখনো ঠাণ্ডা হবে, শান্তি দায়কও নয়।[১২৭]

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ. وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ. لَا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ.

---

১১৯ আল-কুরআন; ২২ : ১৯-২২
১২০ আল-কুরআন; ১৪ : ১৬-১৭
১২১ আল-কুরআন; ২২ : ১৯-২২
১২২ আল-কুরআন; ৩৯ : ১৬
১২৩ আল-কুরআন; ১০ : ২৭
১২৪ আল-কুরআন; ২৩ : ১০৪
১২৫ আল-কুরআন; ৭০ : ১৫-১৬
১২৬ আল-কুরআন; ৪ : ৫৬
১২৭ আল-কুরআন; ৫৬ : ৪২-৪৪

জাহান্নামিদের খাদ্য ও পানীয় : তাদের খাদ্য হবে যাক্কুম ও পানীয় হবে ফুটন্ত পানি। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ. طَعَامُ الأَثِيْمِ. كَالْمُهْلِ ج يَغْلِيْ فِى الْبُطُوْنِ. كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ. خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ . ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِه مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ.[১২৮]

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ.[১২৯]

সূরা ওয়াকি‘আতে বলা হয়েছে,[১৩০]

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ. فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ. فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ. فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ.

যাক্কুম ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। আরবের তিহামা অঞ্চলে এ গাছ জন্মে। এর স্বাদ তিক্ত এবং গন্ধ অসহ্য। ঐ গাছ ভাঙ্গলে দুধের মতো সাদা কস বের হয়, যা গায়ে লাগলে সাথে সাথে ফোসকা পড়ে ঘা হয় এবং গা ফুলে উঠে। পৃথিবীর সাথে আখিরাতের কোনো বস্তুর নামের মিল থাকলেও মূলতঃ ঐ দুই বস্তু এক নয়। পৃথিবীর যাক্কুম গাছের তুলনায় আখিরাতের যাক্কুম আরো নিকৃষ্ট। যাক্কুম গাছের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, তা এমন একটা গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। তার ছড়াগুলো এমন যেনো শয়তানের মাথা।[১৩১]

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّه رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ.

সূরা গাশিয়ায় বলা হয়েছে,[১৩২]

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ.

সে পানি শুধুমাত্র গরম ও ফুটন্তই হবে না, বরং তা তামা বা কঠিন কোনো ধাতুকে তাপ প্রয়োগে তরল করা হলে তা-ই উত্তপ্ত তরলের মতো হবে। ইরশাদ হচ্ছে,[১৩৩]

وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ط وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

আরো বলা হয়েছে,[১৩৪]

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ.

জাহান্নামিরা সেখানে ঠাণ্ডা ও পানোপযোগী কোনো বস্তুর স্বাদ পাবে না। যদিওবা কিছু পায় তা হচ্ছে উত্তপ্ত গরম পানি ও দুর্গন্ধযুক্ত মিশ্রিত রক্ত।[১৩৫]

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا. إِلاَّ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا.

সূরা ইবরাহিমে বলা হয়েছে,[১৩৬]

مِّنْ وَّرَائِه جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ. يَّتَجَرَّعُه وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُه وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ.

---

১২৮ আল-কুরআন; ৪৪ : ৪৩-৪৮
১২৯ আল-কুরআন; ৩৭ : ৬৭
১৩০ আল-কুরআন; ৫৬ : ৫২-৫৫
১৩১ আল-কুরআন; ৫৬ : ৫২-৫৫
১৩২ আল-কুরআন; ৮৮ : ৫-৭
১৩৩ আল-কুরআন; ১৮ : ২৯
১৩৪ আল-কুরআন; ৪৭ : ১৫
১৩৫ আল-কুরআন; ৭৮ : ২৪-২৫
১৩৬ আল-কুরআন; ১৪ : ১৬-১৭

জাহান্নামিরা জান্নাতিদের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাবে : জাহান্নামিরা জান্নাতিদের ডেকে তাদেরকে সামান্য পানি দিতে বলবে কিংবা আল্লাহ জান্নাতিদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু তাদের দিকে নিক্ষেপ করতে বলবে। কিন্তু এতদুভয়ই আল্লাহ কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[১৩৭]

وَنَادٰى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۚ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

জাহান্নামিরা শুধুই আফসোস করবে : জাহান্নামে কাফিরদের জীবন হবে কঠিন। যালিমরা সেদিন আপন হাত দু'টো দংশন করবে আর বলবে, আফসোস আমি যদি রাসূলের পথ অনুসরণ করতাম। হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম।[১৩৮]

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً. يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِىْ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلاِنْسَانِ خَذُوْلاً.

জাহান্নামের শাস্তি স্থায়ী : অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরস্থায়ী অবস্থান করবে।[১৩৯]

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ.

শিকলে বেঁধে দাহ্য আলকাতরার জামা পরানো হবে : সেদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।[১৪০]

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْأَصْفَادِ. سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ.

জাহান্নামিদেরকে যখ ফেরেশতারা এক হাতে চুলের মুঠি এবং অপর হাতে পা ধরে চ্যাংদোলা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে, তখন জাহান্নামের পাহারাদারগণ জিজ্ঞেস করবে– তোমাদের কাছে কি কোনো সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পৌঁছেনি? তখন তারা আফসোস করে বলবে,[১৪১]

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

সূরা আন'আমে বলা হয়েছে,[১৪২]

وَلَوْ تَرٰى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

জাহান্নামিদের আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ সরাসরি তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন,[১৪৩]

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ.

---

১৩৭ আল-কুরআন; ৭ : ৫০
১৩৮ আল-কুরআন; ২৫ : ২৬-২৯
১৩৯ আল-কুরআন; ৪৩ : ৭৪
১৪০ আল-কুরআন; ১৪ : ৪৯-৫০
১৪১ আল-কুরআন; ৬৭ : ১০
১৪২ আল-কুরআন; ৬ : ২৭
১৪৩ আল-কুরআন; ৬ : ২৮

সূরা যুমারে বলা হয়েছে,[১৪৪]

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًاؕ حَتّٰى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَاؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

জাহান্নামিরা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে : জাহান্নামিরা সেখান থেকে বের হওয়ার পথ খুজতে থাকবে এবং পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে। তারা বলবে,[১৪৫]

قَالُوْا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ.

একই কথা সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে,[১৪৬]

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَاۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ.

জাহান্নামিদের পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদনের জবাবে বলা হবে যে, তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বয়স দেয়া হয়েছিলো যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে সেখানে প্রচুর সময় ছিলো।[১৪৭]

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ.

আত্মীয়-স্বজন ও দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও জাহান্নামিরা বাঁচতে চাইবে : জাহান্নামিরা সেদিন চাইবে তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই এবং সাহায্যকারী নিকটবর্তী পরিবার এমনকি দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও নিজেকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিতে।[১৪৮]

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ. وَصَاحِبَتِه وَأَخِيْهِ. وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُؤْوِيْهِ. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًاۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ.

কিন্তু সেদিন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তা থাকবে না। এমনকি পরস্পর দেখা হলেও কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।[১৪৯]

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ.

অন্যত্র বলা হয়েছে, সেদিন কোনো প্রাণের বন্ধু অপর প্রাণের বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না।[১৫০]

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا.

প্রত্যেক জাহান্নামি দল পূর্ববর্তী দলকে দোষারোপ করবে : প্রত্যেকটি জাহান্নামি দল যখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে নিজের সঙ্গের দলটির উপর অভিশাপ দিতে দিতে অগ্রসর হবে। শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন সেখানে সমবেত হবে, তখন প্রত্রেক পরবর্তী লোক পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি দোষারোপ করবে।[১৫১]

---

১৪৪ আল-কুরআন; ৩৯ : ৭১
১৪৫ আল-কুরআন; ৪০ : ১১
১৪৬ আল-কুরআন; ৩৫ : ৩৭
১৪৭ আল-কুরআন; ৩৫ : ৩৭
১৪৮ আল-কুরআন; ৭০ : ১১-১৪
১৪৯ আল-কুরআন; ২৩ : ১০১
১৫০ আল-কুরআন; ৭০ : ১০
১৫১ আল-কুরআন; ৭ : ৩৮

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ط حَتّٰى إِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا قَالَتْ أُخْرٰهُمْ لأُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ.

এ কথাগুলোই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অন্যভাবে বলেছেন, 'আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখান এবং কাফিরদের বন্ধু তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে পথ দেখায়।'[১৫২]

অনুসারীগণ জাহান্নামে তাদের নেতাদের শাস্তি দাবি করতে থাকবে। জাহান্নামিরা জাহান্নামে জ্বলতে জ্বলতে অসহ্য হয়ে যাবে। তখন চিৎকার করে বলতে থাকবে,[১৫৩]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَّالإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الأَسْفَلِيْنَ.

জাহান্নামিদের অনুভুতি তীব্র হবে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সেদিন বুঝবে অন্ধভাবে নেতাদের অনুসরণ করা কতো বড় ভ্রান্তনীতি ছিলো।[১৫৪]

تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

জাহান্নামে ধৈর্য ধরা আর না ধরা সমান হবে : যেদিন জাহান্নামিদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে এ সেই আগুন যাকে তোমরা ভিত্তিহীন গুজব মনে করতে। এবার যাও এর মধ্যে ভস্ম হতে থাকো। এখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করো বা না করো সবই তোমাদের জন্য সমান।[১৫৫]

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ. أَفَسِحْرٌ هٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ.

শয়তান নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করবে : মানুষ যে শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণার কারণে পাপ করেছে এবং মন্দ পথে চলেছে সে শয়তান হাশরের দিন জাহান্নামিদেরকে দেখে বলবে, তোমাদের শাস্তির জন্য আমি দায়ি নই; তোমরাই দায়ি।[১৫৬]

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا أَنْفُسَكُمْ ط مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط إِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط إِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিকের নিকট অনুনয়-বিনয় : জাহান্নামিরা যখন শাস্তি ভোগ করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে তখন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক ফেরেশতাকে অনুনয়-বিনয় করে বলবে, তোমাদের রবকে ডাকো তিনি যেনো আমাদের থেকে একদিনের জন্য হলেও শাস্তি লাঘব করে দেন।[১৫৭]

---

১৫২ আল-কুরআন; ২ : ২৫৭
১৫৩ আল-কুরআন; ৪০ : ২৯
১৫৪ আল-কুরআন; ২৬ : ৯৭-৯৮
১৫৫ আল-কুরআন; ৫২ : ১৩-১৬
১৫৬ আল-কুরআন; ১৪ : ২২
১৫৭ আল-কুরআন; ৪০ : ৪৯

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ.

কিন্তু সে অনুনয়-বিনয়ে কোনো কাজ হবে না। কেননা এটা হলো অনন্তকালের জন্য শেষ পরিণতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, মাক্কি সূরাগুলোতে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। একজন দা'ঈ যখন আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হবেন তখন আখিরাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাক্কি সূরার আলোকে বর্ণিত জান্নাতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাবে এবং জাহান্নামের পথ পরিহার করে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মাক্কি জীবন ও মানব জীবনে এর প্রভাব

মানবতা ও মনুষ্যত্বের মূর্তপ্রতীক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি গোটা মানবজাতির মহান শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে আখ্যা দিয়েছেন। রহমাতুল লিল 'আলামিন হিসেবে। বাস্তবেও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. গোটা মানবজাতির জন্য শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা, সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন যা চির ভাস্বর ও অমলিন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবীকে রহমাতুল লিল 'আলামিন বলে আখ্যায়িত করেছেন, এখানেই শেষ নয়। তিনি ইরশাদ করেছেন–[১৫৮]

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

সে সাথে মু'মিনদের জন্য ঘোষণা করেছেন–[১৫৯]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

আর রাসূলের আদর্শ অনুসরণের ফলে মুসলিম উম্মাহকে গোটা মানবজাতির অনুসরণীয় আদর্শে পরিণত হওয়ার ফলে শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–[১৬০]

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

এ নির্দেশনার সারকথা হলো– মুহাম্মদ সা.-কে সার্থকভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করলে, জীবনের সর্বত্র কেবলমাত্র তাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে মুসলিম উম্মাহ অবশ্যই সমগ্র মানবজাতির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

পৃথিবীর মানুষের মাঝে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠাই ছিলো নবী-রাসূলের মূল দায়িত্ব। সকল আসমানি কিতাবেরও মূল আবেদন ইনসাফ ও সাম্য। নবী-রাসূল এবং আসমানি কিতাব নাযিলের লক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–[১৬১]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

সর্বশেষ নবীর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআনের কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তুই হলো মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব শেষ করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যার অনিবার্য দাবি হলো– সব মানুষ এক আল্লাহর প্রভুত্বের অধীনে সকলে হবে একে অপরের ভাই– কেউ কারো প্রভু নয়– নয় কারো দাস। আল্লাহ তা'আলা আহ্বান করেন–

---

১৫৮ 'আর (হে নবী!) আপনি নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত।' দ্র. আল-কুরআন, ৬৮ : ৪

১৫৯ 'আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।' দ্র. আল-কুরআন, ৩৩ : ২১

১৬০ 'এভাবে তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষী হতে পারো আর রাসূল সা. তোমাদের জন্য সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হতে পারেন।' দ্র. আল-কুরআন, ২ : ১৪৩

১৬১ 'আমি আমি আমার রাসূলগণকে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড, যাতে মানবজাতি ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকে।' দ্র. আল-কুরআন, ৫৭ : ২৫

‘বলুন, হে আহলি কিতাব! তোমরা এসো এমন একটা কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাতে কোনো কিছুকে শরিক করবো না এবং আমাদের মধ্যকার কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভুরূপে গ্রহণ করবে না।’[১৬২]

শেষ নবীর উম্মতের হক আদায় করতে হলে, এ পরিচয়ের যথার্থ দাবি পূরণ করতে হলে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর আলোকে সীরাতে মুহাম্মাদির উপর গভীর অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। আর তাঁর সীরাতকে যথাযথভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে হলে, দীন প্রতিষ্ঠার বাস্তব কাজে অংশগ্রহণ এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনে পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহের প্রতি গভীর ও নিবিড় মনোযোগপূর্ণ অধ্যয়ন অপরিহার্য। দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও সুন্নাত পদ্ধতি আসলে কোনটা এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে অহিপ্রাপ্তির দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশনার পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা এবং রাসূল সা. গৃহীত কর্মনীতি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হলে, নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কুরআন অধ্যয়ন এবং মাক্কি-মাদানি অধ্যায়ের বাস্তবতা জনিত পার্থক্যের মাত্রাজ্ঞান অর্জন একান্তই অপরিহার্য। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নিচে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কি জীবনের উপর আলোচনা করা হলো :

রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কি জীবন

রাসূলে কারিম সা.- এর নবুওয়াতি জীবনকে তাঁর জীবনী লেখকদের অনেকেই মাক্কি এবং মাদানি এ দু’টি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। রাসূলের জীবন মূলত কুরআন কেন্দ্রিক। বরং তাঁর জীবন হলো জীবন্ত কুরআন। তাই কুরআনের গবেষকগণ প্রায় সকলেই এর কোন অংশ হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে, কোন অংশ হিজরতের পরে এটা চিহ্নিত করেছেন যথেষ্ট অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে। এটা শুধু ইতিহাস গবেষণার মাধ্যমে সঠিক ঘটনা জানার জন্যই নয়। বরং যুগে যুগে মানব সমাজের বিভিন্ন অধ্যায়ে, চড়াই-উৎরাইয়ের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে; ইসলামি আদর্শের প্রচার প্রসারে, অনুসরণে ও বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত নীতি-কৌশল অবলম্বনের জন্যই এটা বেশি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য।

অহিপ্রাপ্তির পর থেকে আল্লাহর রাসূল সা. দীর্ঘ ২৩ বছর তাঁর নবুওয়াতি দায়িত্ব পালন শেষে তাঁর মহান মালিকের কাছে গমন করেছেন। সে ২৩ বছরের ১৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে মক্কায় আর ১০ বছর মদিনায়। মক্কার ১৩ বছরের এ অধ্যায়টি ব্যক্তিগঠন এবং সংগ্রাম যুগ হিসেবে অভিহিত। এখানে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কি জীবনকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা করা হলো–

---

১৬২ قُلْ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِه شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ. দ্র. আল-কুরআন, ৩ : ৬৪

মাক্কি জীবনের চারটি পর্যায় : রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কি জীবনের কার্যক্রমও আবার চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে–

প্রথম পর্যায় : প্রথম পর্যায়ের ৩টি বছরের কার্যক্রমের মধ্যে আসে হেরা গুহায় অহি নাযিলের ঘটনা, মুহাম্মদ সা.-এর উপর এর প্রতিক্রিয়ায় মা খাদিজাতুল কুবরা রা.-এর সান্ত্বনা ও ওয়ারাকা ইবন নওফিলের কাছ থেকে প্রাপ্ত শুভসংবাদ। এর পাশাপাশি লক্ষণীয় হলো ঘনিষ্টজনদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বউদ্যোগে ইমানের ঘোষণা প্রদান। হযরত খাদিজা রা. শুধু ঈমানই আনেননি, রাসূলের রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য সমস্ত অর্থসম্পদ তাঁর কাছে সমর্পণ করলেন– হযরত আবুবকর বিশ্বস্ত ও গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসেবে ঈমান আনলেন। তার সাথে ঈমান আনলেন কিশোর আলি রা. এবং ব্যক্তিগত সেবাকাজে নিয়োজিত যুবক যায়িদ ইবন হারিসা রা.। মূলতঃ রাসূল সা.-এর রিসালাতের কঠিন এ দায়িত্ব পালনের কাফিলার প্রাথমিক সঙ্গী-সাথী এ চারজন মানুষ। সংখ্যার বিচারে নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু গুণ ও মানগত বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত খাদিজা রা. সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ধনাঢ্য মহিলা– নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার এক অবিসংবাদিত নারী ব্যক্তিত্ব। হযরত আবুবকর রা. সে জাহিলি যুগেও একজন সৎ, বুদ্ধিমান ও সম্মানিত মানুষ হিসেবে পরিচিত। হযরত আলি রা. কিশোরদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো একজন আদর্শ কিশোর। আর হযরত যায়িদ সে সময়ের প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি। রাসূল সা.-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দীন প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াতি আন্দোলনের ভিত্তি গঠনে এদের ভুমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম পর্যায়ের এ তিন বছরে নীরব তৎপরতার বাইরে তেমন কার্যক্রম না থাকায় কাফির ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া তেমন বড় রকমের বিরোধিতা দেখা যায়নি। প্রথমে অহির মাধ্যমে মুহাম্মদ সা.-কে তাঁর উপর অর্পিত গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। আর সে সাথে ঐ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতিমূলক নির্দেশ দেয়া হয়। সূরা আল-মুদ্দাস্সিরের প্রথম ৭টি আয়াতের মাধ্যমে, বলা হয়েছিলো–

'হে চাদর আবৃত ব্যক্তি! জড়তা ছেড়ে জেগে উঠো এবং মানবজাতিকে সতর্ক ও সাবধান করো। ঘোষণা করো তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের। তোমার বেশভূষা পূত-পবিত্র ও মার্জিত বানাও। পাপ-পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখো। প্রতিদানের আশায় কাউকে অনুগ্রহ করো না, তোমার রবের জন্য ধৈর্য ধারণ করো।'[১৬৩]

সকল নবীই আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে নবুওয়াতের ঘোষণা প্রাপ্তির আগেই পূত-পবিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাদেরকে নিষ্পাপ হিসেবেই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। অহি প্রাপ্তির পূর্বে প্রায় দীর্ঘ ৪০ বছর মুহাম্মদ সা. শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক এবং পৌঢ়ত্বের জীবন কাটিয়েছেন যাদের মাঝে তারা সকলে সাক্ষী। জাহিলিয়াতের কোনো পঙ্কিলতাই মুহাম্মদ সা.-এর জীবনকে সামান্যতম স্পর্শ করতে পারেনি। অতএব সূরা

---

১৬৩ দ্র. يٰأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.
আল-কুরআন, ৭৪ : ১-৭

মুদ্দাসসিরের প্রথম ৭টি আয়াতের নির্দেশনা সরাসরি রাসূলকে সম্বোধন করে দেয়া হলেও এটা মূলত রাসূলের সাথে যারা এ দায়িত্ব পালনে সহযোগিতার ভূমিকা পালন করবে, ভবিষ্যতেও যারা দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিবে তাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে সতর্ক সাবধান করার মতো কাজের সূচনাতেই বাধা আসতে থাকে। ব্যাপক দা'ওয়াত না হয়ে সীমিত পরিসরে হওয়ার কারণে বাধার ধরন ছিলো মৌখিক গালমন্দ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপবাদ-অপপ্রচারের মধ্যে সীমিত। এ পরিস্থিতি চলতে থাকে নবুওয়াতের চতুর্থ ও পঞ্চম বছর পর্যন্ত। এ রিসালাতের কঠিন গুরু-দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জনের জন্য এবং অবাঞ্ছিত-অনাকাংখিত বাক্যবানের মুকাবিলার মানসিক ও মনস্তাত্বিক শক্তিতে বলিয়ান থাকার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে খুবই মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ বাস্তবসম্মত নির্দেশনা আসে সূরা মুজ্জাম্মিলের ১ম রুকু'র মাধ্যমে।

উক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্য খুবই লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। এ সূরার প্রথম ৭টি আয়াতের মাধ্যমে রাসূলে কারিম সা.-কে তাঁর উপর অর্পিত কঠিন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রাত্রি জাগরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাত্রির অর্ধেক কিংবা কিছু কম বা কিছু বেশি সময় জেগে জেগে নামায আদায় ও ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে দিনের বেলায় রাসূলের ব্যস্ততার সীমা নেই। আর রাত্রি বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠার অভ্যাসটি আত্মসংযমের জন্য খুবই কার্যকর এবং এ নির্জন মুহূর্তে মুখের উচ্চারিত কথাগুলো হয়ে থাকে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। যা হৃদয়কে করে থাকে দারুণভাবে আলোড়িত এবং প্রভাবিত।

৮ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সা.-কে আল্লাহর যিকির করতে এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহর দিকে মনে-প্রাণে রুজু হতে বলা হয়েছে। বস্তুজগতের সবকিছুর উপর থেকে নির্ভরশীলতা পরিহার করে পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তের মালিক এক আল্লাহকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে রাসূলের রিসালাতের বিরোধীতাকারীদের অশোভন ও অশালীন উক্তি যা মনে দারুণ ব্যথা এবং ক্ষোভের জন্ম দেয় সেগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ধৈর্য ধারণের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। সে সাথে বলা হয়েছে–[164]

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُوْلِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً.

এ আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে আল্লাহ এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নিবেন। এদের দৌরাত্ম্য দীর্ঘদিন চলতে পারবেনা। অচিরেই তারা এর পরিণতি বোগ করবে।

---

১৬৪ 'নবুওয়াতের সত্যতা অস্বীকারকারীদের যাবতীয় কার্যক্রমের মুকাবিলার দায়িত্ব আল্লাহর উপর সমর্পণ করুন এবং এদেরকে কিছু সময় দিন।' দ্র. আল-কুরআন, ৭৩ : ১১

১৫ থেকে **১৯** পর্যন্ত আয়াতসমূহে রাসূলের দা'ওয়াতি আন্দোলন বিজয়ী হবেই এবং তাঁর বিরোধিতাকারীদের শোচনীয় পরাজয় অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী– এ কথা বলার মাধ্যমে যুগপৎ কাফির-মুশরিকদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং বিজয়ের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে রাসূল সা. এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের। ইতিহাস থেকে এ মর্মে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই বলা হয়েছে–[১৬৫]

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلاً ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً. فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذْنٰهُ أَخْذًا وَّبِيْلاً.

এ আয়াতের মধ্যে যে পরিস্কার বার্তাটি বার্তাটি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তাহলো ফির'আউনের যে পরিণতি হয়েছে আজ যারা নবী মুহাম্মদ সা.-এর বিরোধিতা করছে তাদেরও সে-ই পরিণতি হবে। পৃথিবীতে যদি কোনোক্রমে অনুরূপ শাস্তি থেকে বেঁচেও যায় আখিরাতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় থাকবেনা। শেষোক্ত বক্তব্যটি মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার মতো একটা ঘোষণা যাকে আল্লাহ তা'আলার সর্বোত্তম উপদেশও বলা যেতে পারে। আবার চেতনা সৃষ্টিকারী একটা স্মারক বক্তব্যও বলা যায়। এর মধ্যে প্রথমাংশে রিসালাতের কঠিন ও গুরু-দায়িত্ব পালনের জন্য রাত্রির নির্জন নিরিবিলি প্রহরে নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় করার চেষ্টার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে প্রতিপক্ষের আচরণের মুকাবিলায় করণীয় প্রসঙ্গে ধৈর্যের প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করতে বলা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে বিরোধী পক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিজয়ের শুভ সংবাদের পাশাপাশি প্রতিপক্ষের পরাজয়ের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। এটা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পক্ষের এবং বিপক্ষের শক্তির জন্য একইভাবে প্রযোজ্য থাকবে।

দ্বিতীয় পর্যায় : রাসূল সা.-এর মাক্কি জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় তথা নবুওয়াতের চতুর্থ ও পঞ্চম বছরের অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আগত আল্লাহর হিদায়াত সম্পর্কে। ইসলামের দা'ওয়াতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্ট প্রতিকুল পরিবেশে দা'ঈকে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে দু'টো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(ক) একটানা সারারাত জাগতে বলা হয়নি। ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে উঠতে বলা হয়েছে্ কারণ অনেকের পক্ষেই সারারাত জেগে কাটানো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একবার আরামের ঘুমের আকর্ষণে পেয়ে বসলে জেগে উঠা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধিই রাত্রি জাগরণের মূল উদ্দেশ্য তাই আরামের ঘুমের মধুর আকর্ষণ উপেক্ষা করে জেগে উঠাই এর জন্য সর্বোত্তম কার্যকর সহায়ক শক্তি যোগাতে সক্ষম।

---

১৬৫ 'আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি– যেমন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম ফির'আউনের প্রতি। অতঃপর ফির'আউন উক্ত রাসূলের কথা অমান্য করলো– আর তার পরিণতিতে আমি তাকে পাকড়াও করলাম পাকড়াও করার মতো।' দ্র. আল-কুরআন, ৭৩ : ১৫-১৬

(খ) উদ্দেশ্য বা কর্মসূচি বিহীন রাত্রি জাগরণ নয়; বরং আল্লাহর কিতাবের মর্ম অনুধাবনের জন্য নামায অবস্থায় তিলাওয়াতই এর লক্ষ্য ও কর্মসূচি। নৈশ ক্লাবে এক শ্রেণির মানুষ মদ-জুয়ার আসরের মধ্যেও রাত জেগে থাকে। নাচ-গানের আসরেও রাত জাগে অনেকেই। এ রাত জাগার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পশুশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী সা.-কে এবং নবীর মাধ্যমে মু'মিন বান্দাদের যেভাবে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত, নামায ও যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন– তার লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে পাশবিক শক্তির উপর মানবিক শক্তির কার্যকর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।

এ রাত্রি জাগরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো–[১৬৬]

قُمِ الَّيْلَ إِلاَّ قَلِيْلاً. نِصْفَه أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً.

আল্লাহর এ নির্দেশের উপর তাঁর রাসূল যে আমল করেছেন, শুধু তিনি নন বরং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও যে একইভাবে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন এর সাক্ষী ও স্বীকৃতি আছে একই সূরার দ্বিতীয় রুকু'র প্রথম আয়াতে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন–[১৬৭]

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَه وَثُلُثَه وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ.

এ আয়াত থেকে রাসূল সা.-এর রাত্রি জাগরণের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। তিনি সর্বনিম্ন রাতের এক-তৃতীয়াংশ জেগেছেন সর্বোচ্চ দুই-তৃতীয়াংশের কিছুটা কম। মধ্যবর্তী সময় দেখা যায় অর্ধেক রাত্রি জাগরণের অভ্যাস। যেহেতু ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে উঠাই আল্লাহর হিকমতপূর্ণ নির্দেশ, তাই রাসূল সা. রাতের প্রথমাংশে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়তেন।

তৃতীয় পর্যায় : রাসূল সা.-এর মাক্কি জীবনের তৃতয়ি পর্যায়টা বাকি তিনটা পর্যায়ের চেয়ে বেশি দীর্ঘ– নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর থেকে দশম বছর পর্যন্ত। এ সময়কালের মধ্যে ইসলামের ইসলামের দা'ওয়াত খুব ব্যাপকভাবে প্রসারিত না হলেও প্রায় সকল গোত্রের কিছু কিছু লোক এ দা'ওয়াতে সাড়া দিতে থাকে। যা মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিরোধিতাও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বিদ্রূপ সমালোচনা এবং গালি-গালাজ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে শারীরিক নির্যাতনও শুরু হয়। শুধু তাই নয় অমানুষিক যুলুম-নির্যাতনের পলে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জন্য মক্কার যমিন সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে আসে। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটা হলো দুই পর্যায়ে রাসূল সা.-এর সাহাবিদের এটা অংশ হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয়। আর একটা হলো

---

১৬৬ 'সামান্য অংশ ব্যতীত রাত্রি জাগরণ করো। রাতের অর্ধাংশ বা তা থেকে কিছু কম বা কিছু বেশি। আর ধীরে-সুস্থে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো।' দ্র. আল-কুরআন, ৭৩ : ২-৪

১৬৭ 'নিশ্চয় আপনার প্রবু জানেন যে, আপনি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত দাঁড়িয়ে থাকেন এবং আপনার সাথের একটা দলও।' দ্র. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

তিন বছরব্যাপী আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবিদেরকে মক্কার কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়।

আবু তালিবের বাসগৃহে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবিগণ সাংঘাতিক কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। খাদ্য সামগ্রী সরবরাহে বাধা সৃষ্টির ফলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবিগণকে গাছের ছাল-বাকল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়েছে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে তাদের পায়খানা ছাগলের পায়খানার মতো দেখাতো। এ সময়ে আর একটা বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে তায়িফের বুকে। আল্লাহর রাসূল মক্কাবাসীর ব্যাপারে হতাম হয়েই তায়িফে যান দীনের দা'ওয়াত দিতে, সেখানকার পাষণ্ড নেতারা শুধু তার দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি তারা দুষ্ট ও মস্তান শ্রেণির ছেলেদের লেলিয়ে দেয় প্রিয়নবীর উপর ঢিল-পাথর মারার জন্য। তাদের ঢিলের আঘাতে রাসূলের শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিনি মাঝে মাঝে বসে পড়েছেন, বেহুশ হয়েছেন। পাষণ্ড যালিমদের নির্যাতন তবুও থামেনি। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল আবার মক্কায় ফিরে আসেন।

এ তৃতীয় পর্যায়ের পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে যুলুম-অত্যাচার বাড়তে বাড়তে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু দা'ওয়াত থেমে থাকেনি। আবু জেহেল ও আবু লাহাব গোষ্ঠির বিরোধিতা যতই তীব্র হোক না কেনো তারা ভিতর থেকে এক অজানা আতংকে স্নায়ু চাপে ভুগতে থাকে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বৈঠকে মিলিত হয় মুকাবিলার কৌশল নির্ধারণের জন্য। আক দিকে আপোষের প্রস্তাব নিয়ে যায় রাসূলের কাছে, অপর দিকে এ কৌশলে ব্যর্থ হলে অপবাদ আর মিথ্যাচারের মাধ্যমে জনমত বিভ্রান্ত করার কৌশলও তারা নির্ধারণ করে। সূরা হা-মিম-আস-সাজদায় তাদের এ কৌশলের বর্ণনা এসেছে এভাবে–[১৬৮]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ.

চতুর্থ পর্যায় : এ পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় রাসূল সা.-এর দা'ওয়াতি আন্দোলন মক্কার দশ বছরের কঠিন কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বছরে অর্থাৎ মাক্কি জীবনের চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে পদার্পণ করে। ক্রমাগতভাবে প্রতিপক্ষের সৃষ্ট প্রতিকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ নেয়। জাগতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এ পরিস্থিতিতে সাফল্যের ন্যূনতম সম্ভাবনাও আঁচ করা সম্ভব ছিলো না। কাফির-মুশরিকদের নেতারা অবশেষে আল্লাহর রাসূলের জন্য মক্কার যমিন একেবারে সংকীর্ণ করে ফেলে। এ চতুর্থ পর্যায়ে দু'টো ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতি জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একটা মিরাজুন নবী আর অপরটা হলো হিজরত। মি'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে নিজ সান্নিধ্যে নিয়ে দুনিয়ার বস্তুগত কার্যকারণের উর্ধ্বে আল্লাহর পরিপূর্ণ কুদরতের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করে আস্থাশীল ও আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হওয়ার ব্যবস্থা করেন।

---

১৬৮ 'কাফিররা বলে এ কুরআন তোমরা শুনোনা বরং শোনার পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো গণ্ডগোলের মাধ্যমে যাতে করে তোমরা বিজয়ী হতে পারো।' দ্র. আল-কুরআন, ৪১ : ২৬

সকল শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাঁর শক্তিমত্তাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। তিনিই রাসূল সা.-কে প্রেরণ করেছেন তাঁর দনিকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।ভ অতএব এ দীন বিজয়ী হবেই। তাই প্রতিপক্ষের চতুর্মুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল যতই বিস্তৃত হোক না কেনো, এতে হতাশ হওয়া বা বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। রাসুলের মি'রাজের মাধ্যমে মু'মিনদের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় হিসেবে নামায ফরয করা হলো। আল্লাহর রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরাম পূর্বেও নামায পড়তেন। কিন্তু নিয়মিত দিনে পাঁচবার নামায চালু হয় মি'রাজের পর থেকেই। অহির সূচনা লগ্ন থেকে রাসূলুল্লাহ সা. এভাবে পর্যায়ক্রমে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে এসে আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর দা'ওয়াতি মিশনকে বিজয়েরন দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন। হিজরতের পর মদিনায় যে নতু রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সূচনা হয় তার মূলনীতি তিনি প্রাপ্ত হন সূরা আল-ইসরার মাধ্যমে যা নাযিল হয় মি'রাজের অব্যবহিত পরেই।

মানব জীবনে এর প্রভাব

মহানবী সা.-এর মাক্কি জীবনের ১৩ বছরের জীবন চার ভাগে বিভক্ত ছিলো। মূলত এর একটা আরেকটার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত একই ঘটনার ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাক্কি সূরাগুলোর শিক্ষার আলোকে গঠিত প্রিয়নবী সা.-এর নেতৃত্বে মু'মিনদের একটা কাফেলা এ চারটি স্তর অতিক্রমের মাধ্যমে ব্যতিক্রমধর্মী বিরল চরিত্রের অধিকারী হন। তারা সজ্জিত হন সকল বিচারে সর্বোন্নত মানবীয় গুণাবলিতে। যা চরম প্রতিপক্ষ ও বৈরী শক্তির উপরও নৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আল্লাহ স্বয়ং তাদের এ ব্যতিক্রমধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নত নীতি-নৈতিকতার স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন এবং তাদের মানুষ হিসেবে সফলকাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা আল-মু'মিনুন-এর প্রথম দশটি আয়াত এবং সূরা আল-ফুরকানের শেষ রুকু'র বাচনভঙ্গি থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে রাসূল সা.-এর সাহাবিগণ আল্লাহর প্রিয়বান্দা হিসেবে ঐসব গুণাবলি অর্জন করেন মূলতঃ মাক্কি সূরাসমূহ থেকে।

মাক্কি সূরা আদ-দুহায় রাসূল সা.-কে যে সান্ত্বনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা ছিলো প্রধানত অহি বন্ধের কারণে সৃষ্ট মনোব্যথা দূর করার জন্য। আর সূরা আল-ইনশিরাহ-তে যে সান্ত্বনাবাণী শোনানো হয়েছে– তা ছিলো মূলতঃ রাসূলের রিসালাত অস্বীকারকারীদের অবান্তর মন্তব্য, কদর্য সমালোচনা ও মিথ্যা প্রচারণার কারণে সৃষ্ট ব্যথা-বেদনা ও কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে।

অহি প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মক্কার সর্বস্তরের জনমানুষের কাছে মহানবী সা. ছিলেন বিশ্বস্ত ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের ঘোষণা প্রাপ্তি ও তার পরবর্তী দা'ওয়াতি কার্যক্রমের ফলে তিনি আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নিজের জাতি গোষ্ঠির লোকদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেন। মুষ্টিমেয় যে সব সাথী-সঙ্গী ঈমানের অধিকারী হওয়ার ফলে তাঁর পাশে দাঁড়ান তারাও তাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এতে মক্কার

নেতৃস্থানীয় লোকেরা বিদ্রূপ করে বলা শুরু করে যে, মুহাম্মদ শিকড় বিচ্ছিন্ন– আবতার। এর সান্ত্বনায় আল্লাহ তা'আলা ছোট্ট একটা সূরা নাযিল করেন, তা হলো সূরা কাউসার। যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়হাবিবকে বলে দিয়েছেন যে, তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই শিকড়বিহীন।[১৬৯]

মাক্কি সূরার শিক্ষার আলোকে অতীব পছন্দনীয়, সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি ও উন্নত মূলনীতি দিয়ে মহানবী সা. মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দা'ওয়াত দেয়া শুরু করলে মানুষ তাঁর দা'ওয়াতে সাড়া দিয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। মাক্কি সূরার বাণীসমূহ শুনে তারা অভিভূত হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয় কুরাইশ নেতা উতবা রাসূল সা.-এর মুখে সূরা 'হা-মিম-আস-সাজদাহ' শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যান। সে কুরাইশদেরকে মুহাম্মদ সা.-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করতে পরামর্শ দিয়েছিলো। যা ছিলো সমাজের উপর মাক্কি সূরার একটা বাস্তব প্রভাব।

মাক্কি সূরাগুলো একের পর এক নাযিল হচ্ছিলো আর মহানবী সা. এর আলোকে ইসলামি দা'ওয়াহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেদিন থেকে রাসূল সা. প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন, সেদিন থেকে মক্কাবাসীদের ক্রোধের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারা ক্ষোভে ফেটে পড়তে থাকে। মুসলিমরা তাদের নিকট একটা নিকৃষ্ট ও অপরাধী জাতিতে পরিণত হয়। তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পায়ের নিচ থেকে ধীরে ধীরে মাটি সরে যাচ্ছে। নিরাপত্তা বেষ্টিত হেরেম এলাকায় তাদের ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা ও জীবনের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ফলে তারা মুসলিমদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তাদের উপর মিথ্যারোপ, ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ইসলামের বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি, মিথ্যা অপবাদ দেয়াসহ হাজারো ষড়যন্ত্র শুরু করে। কুরআনের অবমাননা, কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি– কুরআন হলো পূর্বেকার লোকদের বানানো ও বানোয়াট কাহিনী– প্রচার করে। রাসূল সা.-কে পাগল, যাদুকর, মিথ্যুক, কবি, গণক ইত্যাদি বলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালাতে থাকে। কিন্তু এতো কিছুর পরও রাসূল সা. বিন্দুমাত্রও পিছপা হননি; তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনের বিষয়ে তাকে সাহায্য করা হবে এ আশায় কাজ চালিয়ে যান। দেখা যায় মাক্কি সূরায় কুরাইশদের ভ্রান্ত অপবাদের জবাব দেয়া হয়েছে যাতে রাসূল সা. শক্তি পেয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ দা'ঈ। তিনি অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ পন্থায় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৎকালীন আরবের বর্বর ও জাহিলি সমাজে ইসলামি দা'ওয়াত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দা'ওয়াত ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, কাফির-মুশরিক, নারী-পুরুষ, রাজা-প্রজা সকলেই তাঁর দা'ওয়াতের আওতাভুক্ত হয়। পবিত্র

---

১৬৯ আল-কুরআন, ১০৮ : ১-৩

কুরআনের মাক্কি সূরা বিশেষতঃ সূরা ত্বোয়াহা ও আল-কাসাসে বর্ণিত রাসূল সা.-এর মাক্কি জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে তা ছিলো নিম্নরূপ :

সমাজে তাওহিদ প্রতিষ্ঠায় প্রভাব বিস্তার : রাসূল সা. মানুষকে সর্বপ্রথম একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। এক আল্লাহর আহ্বান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ববিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞাত, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ইশারায় রাত-দিন আবর্তিত হয়।[১৭০] তিনি এসব কিছু সৃষ্টি করে মানুষের উপর বিশাল অনুগ্রহ করেছেন। মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল মূলতঃ তাঁরই দিকে। এসব বিষয়ের সমুদয় জ্ঞান লাভের প্রতি রাসূল সা. তৎকালীন সমাজের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন মাক্কি সূরার শিক্ষার আলোকে। যেহেতু তারা তখন আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করতো, গাছ-পালা, তরু-লতা, মূর্তি-দেবতা, পাথর প্রভৃতির পূজায় তারা নিজেদের নিয়োজিত করতো। আদি যুগে উত্তর ও দক্ষিণ আরবের মরু ও পাহাড়ি অঞ্চলে এরূপ বস্তু পূজার নানা প্রকার নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদরা উদঘাটন করেছেন। ফিলিপ. কে. হিট্টির মতে, ‘মস্ত বড় এরূপ অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্মীয় অনুভূতি মরুদ্যানের অধিবাসীদেরকে কল্যাণকর দেব-দেবী পূজায় ও তীর্থস্থান পূজায় নিবিষ্ট করে।’[১৭১] মুহাম্মদ সা.-এর তাওহিদবাণী তাদের এসব বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি ও অসংখ্য নি‘আমতরাজি নিয়ে একটু ভেবে দেখার জন্য তিনি স্বজাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানান।[১৭২] এভাবে তিনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তাদের উপাস্যদের সাথে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। কিন্তু তথাপিও তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হলো না। পরকাল দিবসে তাদের উপাস্যদের কাছ থেকে প্রমাণ চাওয়া হবে। তখনই তারা তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবে, অথচ সেদিনের তাদের অনুভূতি কোনো কাজে আসবে না।[১৭৩]

যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল তাদের স্বজাতিকে সর্বপ্রথম এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও শিরকের অপনোদনের প্রতিই আহ্বান জানিয়েছেন। নূহ, হুদ, সালিহ আ. সকলেই এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দা‘ওয়াত দিয়েছেন এবং অন্যান্য ইলাহদের অস্বীকার করার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,[১৭৪]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّه لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর অসংখ্য নি‘আমত প্রাপ্ত হয়। তদুপরি গর্ব-অহংকারবশতঃ আল্লাহর নির্দেশ মতো জীবন পরিচালনা থেকে বিরত থাকে। এ জন্য মহান আল্লাহ তাদের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে কতিপয় ইবাদত ফরয করে দিয়েছেন, যেনো বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। আর সেই নির্দেশগুলো যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকটে পৌঁছে দেন। মুহাম্মদ সা. নিজে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত রত থাকতেন এবং পাশাপাশি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে সে ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এ

---

১৭০ আল-কুরআন, ২০ : ৬-৮

১৭১ P.K. Hitti, *History of The Arabs*(Palgrave Macmillan : ST Martins, 10th edition 1972), p. 97

১৭২ আল-কুরআন, ২৮ : ৭১-৭৩

১৭৩ আল-কুরআন, ২৮ : ৭৪-৭৫

১৭৪ আল-কুরআন, ২১ : ২৫

ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের উপরই তা ফরয ছিলো। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহর সপ্রশংস মহিমা বর্ণনা করা যায় এবং পুরোপুরি তার কাছে মাথানত করে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজের উপর অবিচল থাকুন।'[১৭৫]

ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তির সংশোধনই কামনা করে না। ব্যক্তির পাশাপামি স্বীয় পরিবার-সমাজ প্রভৃতির সংশোধনও নিশ্চিত করে। আর সেজন্যে প্রয়োজন নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইসলামের অনুশীলন, যার মাধ্যমে একটা ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ হওয়া সম্ভব। পরিবার ও সমাজের পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন অসম্ভব। অতএব, ব্যক্তির সালাতসহ যাবতীয় বিধি-বিদান পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হলো আপন আপন পরিবার। এজন্যে মহান আল্লাহ তাকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল সা. তাঁর জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা বাস্তবায়ন করে গেছেন। তিনি সর্বপ্রথম পরিবারের নিকট এ বিষয়ে দা'ওয়াত উপস্থাপন করেছিলেন। ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, 'রাসূল সা.-এর উপর উক্ত আয়াতটি নাযিল হলে তিনি প্রত্যহ ফযরের সালাতের সময় হলে আলি ও ফাতিমা রা.-এর গৃহে গমন করে الصلاة، الصلاة বলতেন।'[১৭৬]

ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার : আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সা.-কে নাযির (ভীতি প্রদর্শক) রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি স্বজাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতেন। ভয়ভীতি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। যখন মানুষ ভয়হীন হয়ে এ পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে তখন তার দ্বারা যে কোনো ধরনের অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারে এবং সরল সঠিক পথের দিশা পায়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিকে জাগ্রত করেছেন। মুহাম্মদ সা. নিজেকে স্বয়ং একজন প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শকরূপে স্বজাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন। এ মর্মে তিনি অহি লাভের প্রাক্কালে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুদ্দাসসিরে বলেন, 'হে নবী! আপনি উঠুন এবং সতর্ক করুন।'[১৭৭] ফলে রাসূল সা. স্বীয় জাতিকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করে দিয়েছেন। যখন রাসূল সা.-এর উপর সূরা আশ-শু'আরার এ আয়াতটি وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ নাযিল হয়,[১৭৮] তখন তিনি কুরাইশদের সকল গোত্রকে একত্রিত করে প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে বলতে লাগলেন, হে বনি কা'ব ইবন লুই! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। এভাবে তিনি মুররাহ ইবন কা'ব, আবদ শামস, আবদ মানাফ. হাশিম, বনি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে সমভাবে আহ্বান জানান। এমনকি স্বীয় কন্যা ফাতিমা রা.-কেও একই সম্বোধন করেন এবং পরকালে নবী কারিম সা. তাঁর রক্তের সম্পর্কের হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাজে আসবে না মর্মে তাঁকে সাবদান করে দিয়েছেন।[১৭৯] ফলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন দা'ওয়াতের অন্যতম একটা মাধ্যম। তাছাড়া রাসূল সা.-এর উপর অবতীর্ণ এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঐ সকল ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের জন্যই উপদেশস্বরূপ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৭৫ আল-কুরআন, ২০ : ১৩২

১৭৬ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবি, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*(রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ১৩৭২ হি.), খ.৩, পৃ. ২৫৬

১৭৭ আল-কুরআন, ৭৪ : ১-২

১৭৮ আল-কুরআন, ২৬ : ২১৪

১৭৯ আবুল হুসাইন মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদিস নং ৩০৩

'হে আমার প্রিয় বন্ধু! আপনাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি, কিন্তু এটা তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে।'[১৮০]

এ ছাড়াও এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য অসংখ্য সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যেনো মানবজাতি উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের অনুভূতি জাগ্রত করে।[১৮১]

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার : পৃথিবীর এ জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এখানে মানুষ যদি ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়, তাহলে পরকালীন জীবনে এর চরম মূল্য দিতে হবে। পৃথিবীর প্রতি আসক্তি মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও যাবতীয় অবৈধ পথে পা বাড়াতে সহায়তা করে। অপরদিকে আখিরাতের চিন্তা মানুষের মাঝে আল্লাহপ্রেম, আল্লাহভীতি, সৎকর্ম ইত্যাদি কাজে উৎসাহ যোগায়, পবিত্র কুরআনে পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার বস্তু হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তদুপরি মানুষ এর পিছনে পাগলপারা হয়ে ছুটছে; লাগামহীন জীবন যাপন করছে এবং সীমাহীন ভোগে বিভোর হয়ে পড়ছে। মু'মিনের জন্য এ পার্থিব জীবন শুধুমাত্র পরীক্ষার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই রাসূল সা. মানুষকে আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে পৃথিবীর জীবনে প্রস্তুতিমূলক সৎকাজ সম্পন্ন করার প্রতি আহ্বান জানান। কেননা, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর পথে চলতে সাহায্য করে। অন্যথায় যে কোনো সময় তাগুতের প্ররোচনায় প্রতারিত হতে পারে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

'আমি তাদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।'[১৮২]

অতএব, মানুষের ভোগের সামগ্রী নগন্য ও ক্ষণস্থায়ী, আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। এ মর্মে সূরা আল-কাসাসে বর্ণিত হয়েছে,[১৮৩]

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَاۚ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰىؕ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

পৃথিবীর প্রতি অত্যাধিক আসক্তি, ভালবাসা ও ঝোঁকপ্রবণতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে অতীতে অনেক জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ভোগ সম্পদের দম্ভ করতো। ধ্বংসের পর খুব কম লোকই এগুলোতে বাস করতো। আর আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।'[১৮৪]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَاۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًاؕ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ.

তৎকালীন আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ রাসূল সা.-কে দা'ওয়াতের এ মহান মিশন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য পার্থিব বিভিন্ন প্রকার ভোগ-বিলাস সামগ্রীর প্রলোভন দেখায়। কিন্তু রাসূল

---

১৮০ আল-কুরআন, ২০ : ১-৩
১৮১ আল-কুরআন, ২০ : ১১৩
১৮২ আল-কুরআন, ২০ : ১৩১
১৮৩ আল-কুরআন, ২৮ : ৬০
১৮৪ আল-কুরআন, ২৮ : ৫৮

সা. আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখের প্রত্যাশায় তা প্রত্যাখ্যান করেন।[১৮৫]

অতএব, আখিরাতের চিন্তাই মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হয়, যা মূলতঃ একজন মানুষের চূড়ান্ত সফলতার মনযিল। পরকালীন জীবনকে অগ্রাধিকার না দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য জনপদকে ধ্বংস করেছেন, তারা আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমত লাভের পরও তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিলো। দা'ওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ মর্মে মক্কাবাসীকে সাবধান কল্পে মাহন আল্লাহ বলেন– 'হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা যে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে অবাধ্য হয়েছো এবং তাঁর রাসূলের সাথে বিরোধিতা করছো তোমাদের ন্যায় বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা স্বীয় ভোগ-বিলাসের বস্তুতে গর্বিত ছিলো এবং তারা আমার প্রদত্ত নি'আমতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিলো।'[১৮৬]

মাদ'ঊদের ব্যাপারে হিদায়াত লাভের প্রত্যাশী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার : দা'ঈ যে বিষয়ে মানুষকে আহ্বান করেছে তার প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হয়। দা'ওয়াত দানের পর এটা গ্রহণীয় হওয়া বা অগ্রাহ্য হওয়ার বিষয়ে তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরভাবে নিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে হতাশা অনুভব করা যাবে না। কেননা, দা'ঈর কাজ হলো মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শকে পৌঁছে দেয়া আর তা মানুষের নিকট গ্রহণীয় করে তোলার দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার। হিদায়াতের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। রাসূল সা. মাক্কি সূরার শিক্ষার আলোকে স্বীয় চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ বছর দা'ওয়াতের মহান কাজ পরিচালনা করেন। কিন্তু চাচাকে নিজ ধর্মের অনুসারী করতে পারেননি। আবু তালিব যখন মৃত্যু শয্যায় তখনও রাসূল সা. তাকে কালিমা পড়ে ঈমান আনার আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি আবু জাহল, মুগিরাসহ তার বংশীয় লোকদের চাপে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করেনি।[১৮৭] তখন রাসূল সা. স্বীয় চাচার জন্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে নিষেধ করলেন এবং ঘোষণা করলেন, 'হে রাসূল! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পতে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন না। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দান করেন। তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।'[১৮৮]

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

ইসলামের বিজয়ের জন্য হতাশা অনুভব না করে প্রত্যাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মু'মিনগণ অবশ্যই বিজিত হবে। তবে বিজয়ের জন্য আল্লাহর একটা নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। আর সেটা হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বস্ত মু'মিন হওয়া। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,[১৮৯]

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

মাদ'ঊদের জন্য দু'আ করায় প্রভাব বিস্তার : যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসু হয়ে থাকে। যেহেতু হিদায়াত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ সেহেতু আল্লাহর সাহায্যের

---

১৮৫ ইবন হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৬৬
১৮৬ ইবন কাসির, *তাফসিরে ইবন কাসির*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪০৭
১৮৭ ইবন কাসির, *তাফসিরে ইবন কাসির*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪০৭
১৮৮ আল-কুরআন, ২৮ : ৫৬
১৮৯ আল-কুরআন, ৩ : ১৩৯

প্রত্যাশী হওয়া দা'ঈর একান্ত কর্তব্য। রাসূল সা.-এর জীবনে এ গুণটির সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি টার্গেট করে প্রভাবশালী লোকদের বাছাই করে দা'ওয়াত দিতেন এবং এ বিষয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা করতেন। উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر.

'হে আল্লাহ! আবু জাহল অথবা উমর ইবন খাত্তাবের মধ্যে তোমার নিকট যিনি অধিক প্রিয় তাকে ইসলামের মর্যাদা দান করো। রাবি বলেন, রাসূলের নিকট উমর রা. বেশি প্রিয় ছিলেন।'[১৯০]

অতঃপর উমর রা. ইসলামের ছায়াতলে আসেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দা'ওয়াত শুরু হয়। মুসলিমগণ প্রকাশ্যে বাইতুল্লায় গিয়ে সালাত আদায় করেন।[১৯১]

রাসূল সা. কখনো রাগ হয়ে এবং বিরক্তবোধ করে মাদ'উদের জন্য বদদু'আ করেননি। দরদভরা মন নিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। উহুদের যুদ্ধে রাসূল সা.-এর দান্দান মুবারক শহিদ করা হয়। মাথায় তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। তদুপরি তিনি তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করেছিলেন,

اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করো, কেননা তারা বুঝতে পারেনি।'[১৯২]

বিনয় ও নম্রভাবে দা'ওয়াত উপস্থাপনে প্রভাব বিস্তার : বিনয় ও নম্রতা এমন একটা গুণ, যার মাধ্যমে অন্যের নিকট খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে দা'ঈ নিজের স্থান করে নিতে পারে। ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিনয় একজন দা'ঈর চারিত্রিক ভূষণ। বিনয়ের মাধ্যমে দা'ঈ মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যায়। ফলে দা'ওয়াত উপস্থাপন সহজ হয় এবং সমাজের সকল শ্রেণির লোক তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,[১৯৩]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

'আপনি আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে তাদের প্রতি দয়া পরবশ না হয়ে যদি কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে আপনার কাছ থেকে লোকজন দূরে সরে যেতো। অতএব, আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং যাবতীয় কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।'

---

১৯০ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি' আত-তিরমিযি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৫৭৬, হাদিস নং ৩৬৮১

১৯১ আত-তাবারি, *কাসাসুল আম্বিয়া*(দামিশক : দারু ইবন কাসির, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৮ হি.), খ.২, পৃ. ৩৯০

১৯২ ড. রউফ শালবি, *আদ-দা'ওয়াতুল ইসলামিয়া ফি আহদিহাল মাক্কি*(দুহা : জামিয়া কাতার, ১২০২ হি.), পৃ. ১৭৩

১৯৩ আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯

বিনয়ের মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন প্রিয়নবী মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাহাবিগণ। বিনয় ও নম্রতা দিয়েই তারা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ যেমন ভালোবাসেন, মানুষও তাকে পছন্দ করে। সকল মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন।[১৯৪] এ মর্মে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ আমার নিকট এ মর্মে অহি প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয়-নম্রতার আচরণ করো, যাতে কেউ কারো উপর গর্ব ও গৌরববোধ না করে এবং পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে।'[১৯৫]

বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে আরবের এক বেদুইন মহানবী সা.-এর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রেও রাসূল সা.-এর নম্র ব্যবহার লংঘিত হয়নি। এ মর্মে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'এক বেদুইন মসজিদে নববীতে এসে প্রস্রাব করতে শুরু করে। এ দেখে সাহাবায়ে কিরাম তাকে ধমকাতে লাগলেন। কিন্তু মহানবী সা. তাদেরকে নিষেধ করে তাকে প্রস্রাব শেষ করার সুযোগ দিলেন। আর বালতি এনে পানি ঢেলে পরিস্কার করান। অতঃপর লেকাটিকে ডেকে নরমভাবে বলেন, দেখো এটা মসজিদ, ইবাদতের স্থান। এখানে প্রস্রাব করা ঠিক নয়। তখন লোকটি তার নিজের ভুল বুঝতে পারলো। মহানবী সা.-এর কথায় লোকটি এতই প্রভাবিত হয় যে, প্রায়ই সে দু'আ করতো, হে আল্লাহ আল্লাহ! একমাত্র মুহাম্মদ সা. ও আমাকে দয়া করো।'[১৯৬]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রভাব : ইসলামি দা'ওয়াতকে মানুষের মাঝে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য রাসূল সা. যে পদ্দতি অবলম্বন করেছেন তন্মধ্যে এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। তিন মানুষের নিকট সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতেন। সেক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের পাশাপামি অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত-বন্দেগির দিকে দা'ওয়াত দিতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি সালাতের বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেন। মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই সকাল এবং রাতে দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করতেন।[১৯৭] নবুওয়াতের সূচনাতেও তিনি আলি ও খাদিজা রা.-কে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন।[১৯৮] পরিবার-পরিজনদের সালাতের ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করতেন।[১৯৯]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কি জীবনের দা'ওয়াতি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই অনুমেয় হয় যে, তিনি তখন ইবাদত ও আখলাকের গুরুত্ব না দিয়ে আকিদা ও বিশ্বাসের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং শিরকমুক্ত স্বচ্ছ আকিদার প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ফরয ইবাদতসহ শারি'আতের আনুষঙ্গিক আহকামসমূহ পালনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত দা'ঈদের এ মর্মে নির্দেশ দিতেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরন ও প্রমাণ পাওয়া যায় হযরত মু'আজ ইবন জাবালের বর্ণিত হাদিসে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সা. মু'আজ রা.-কে ইয়ামনের শাসনকর্তারূপে প্রেরন করার সময় এ মর্মে উপদেশ দেন যে, হে মু'আজ! তুমি তুমি এমন স্থানে যাচ্ছো যার অধিবাসীরা হলো আহলে কিতাব। সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম এভাবে দা'ওয়াত দিবে

১৯৪ আল-কুরআন, ২৬ : ২১৫

১৯৫ আবুল হুসাইন মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২২

১৯৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহিহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদিস নং ২১৩

১৯৭ ইবন হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৬৯

১৯৮ ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৪

১৯৯ আল-কুরআন, ২০ : ১৩২

যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল। যদি তারা একথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে সাবধান! তাদের সর্বোত্তম মাল গ্রহণ করবে না। আর মাজলুমের বদদু'আকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা, মাজলুমের প্রার্থনা ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।[২০০]

উক্ত হাদিসে দা'ওয়াতের বিষয়গুলোকে গুরুত্বের দিক বিবেচনায় এনে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রথমতঃ তাওহিদ ও আকিদা, দ্বিতীয়তঃ ইবাদত, তৃতীয়তঃ মানুষের পারস্পরিক হক, চতুর্থতঃ পারস্পরিক মু'আমালাত।

তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি আহ্বানের প্রভাব : তাকওয়া হলো উত্তম চারিত্রিক ভূষণ, যা একজন দা'ঈর জীবনে প্রতিফলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাকওয়া মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে সৎকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করে। এ গুণে গুণান্বিত দা'ঈর প্রভাব মাদ'উদের উপর খুব সহজেই পড়ে। যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল মানুষকে এ গুণের অধিকারী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাকওয়া ঢাল স্বরূপ, যা মানুষকে পাপকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। মহানবী সা.-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াতবর্তিকা। এ মহাগ্রন্থ থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। অতএব, কুরআন অবতীর্ণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাকওয়ার বিষয়ে সচেতন করে দেয়া। পবিত্র কুরআনে তাই ধ্বনিত হয়েছে, 'হে রাসূল! আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। এটা তাদের জন্য উপদেশস্বরূপ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।'[২০১]

মানুষের পরিপূর্ণ সফলতা হচ্ছে পরকালীন সফলতা। আর এটা একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এর প্রভাবের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন।'[২০২] এ তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-এর উপর মানব জাতির জন্য গাইডবুক হিসেবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন– বিশেষ করে মাক্কি সূরাসমূহ নাযিল করেছেন। এগুলো মানুষকে তাকওয়ার পথ নির্দেশ করে চিরস্থায়ী জান্নাতের পথে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ যোগায় এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের উপায় শিক্ষা দেয়। ফলে এ মহামূল্যবান গন্থে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের পাশাপাশি ভীতিসঞ্চারমূলক অসংখ্য বিধান ও বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

'অনুরূপভাবে আমি আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।'[২০৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনের মাক্কি সূরাসমূহের শিক্ষার যে প্রভাব ব্যক্তি ও সমাজের উপর প্রতিফলিত হয় এরই পথ ধরে পরবর্তীতে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইসলামের বাণী ও দিগন্ত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

---

২০০ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহিহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৫৬

২০১ আল-কুরআন, ২০ : ১-২

২০২ আল-কুরআন, ২০ : ৩২

২০৩ আল-কুরআন, ২০ : ১১৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনে মাক্কি সূরাসমূহ ও মানব জীবনে দা'ওয়াতি কৌশল ও প্রয়োগিক বিশ্লেষণ

মানব সমাজে যুলুম, অত্যাচর ও নির্যাতন সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক। এর বাস্তবতা রয়েছে। কিন্তু দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা আরো বেশি। সুতরাং দা'ঈর উপর কোনো নির্যাতন আসলে তিনি এর প্রতিরোধে কোনো পদক্ষেপ নিবেন কিনা। না শুধু নির্যাতন সহ্য করে যাবেন, প্রতিরোধের চিন্তা করবেন না, শক্তি প্রয়োগ করবেন না। এ নিয়ে উলামার মাঝে কারো কারো অস্পষ্টতা থাকতে পারে। বিশেষ করে কেউ কেউ আল-কুরআনের ধৈর্য ধারণের আদেশকে এর সাথে জুড়ে দিতে পারেন। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়। যদি ধৈর্য ধারণ করো, তবে তা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য উত্তম।'[২০৪]

বাহ্যত এ আয়াত দ্বারা মনে হয়, নির্যাতনের প্রতিরোধ বা প্রতিশোধ নেয়ার প্রয়োজন নেই, যেখানে এর চেয়ে ধৈর্য ধারণকেই কল্যাণকর বলা হয়েছে। অতএব এ ধারণা মতে প্রতিরোধের প্রয়োজন নেই। নেই এর কোনো উপযোগিতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে ধৈর্য ধারণ বলতে নীরবে সহ্য করা বুঝানো হয়নি। বরং ধৈর্য অর্থ প্রতিরোধে প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় সংযম প্রদর্শন করা মাত্র। অন্যথায় অত্যাচারী বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ কিতালের প্রসঙ্গে প্রচুর আয়াতের সাথে এ আয়াতের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে সব ধরনের শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি নিতেও নির্দেশ দিয়েছেন, 'তাদের মুকাবিলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'[২০৫]

তাছাড়া যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধের মাঝে এমন কতক ভালো দিক রয়েছে, যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। সে ধরনের প্রতিরোধে দা'ওয়াতি কার্যক্রমের জন্য অনেক উপকারিতাও নিহিত রয়েছে। কেননা ইসলাম বিভিন্ন রকম যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেয়াকে অনুমোদন করেছে। প্রয়োজনে প্রতিশোধও নেয়া যায়। যদি তাতে সমতার নীতি ও আদল অবলম্বন করা হয়। তবে একটা বিষয় সব সময় ইসলামের দা'ঈকে স্মরণ রাখতে হবে, তিনি দা'ঈ, তার মূল লক্ষ্য দা'ওয়াতে সফল হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া নয়। অর্থাৎ মাদ'ঊতে তার দা'ওয়াত গ্রহণ করানোই তার টার্গেট। তাই প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করতে হবে। সব সময় চিন্তা করতে হবে, কিভাবে মাদ'ঊকে আকৃষ্ট করা যায়। তাই মুকাবিলায় অবতীর্ণ হতে হবে দা'ওয়াতের স্বার্থেই, প্রতিশোধের জন্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করে এ ক্ষেত্রে ইসলাম বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও মাধ্যম অবলম্বনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। দা'ওয়াতের অতীত তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সময়ক্ষণ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে তা থেকে পদক্ষেপ নেয়া যায়। এখানে আল-কুরআনের মাক্কি সূরাসমূহের আলোকে মানব জীবনে দা'ওয়াতি কৌশল ও প্রয়োগিক দিকসমূহ তুলে ধরা হলো–

ধৈর্য ধারণ ও সংযম অবলম্বন : ইসলামি দা'ওয়াতে ধৈর্য ও সংযমের গুরুত্ব অপরিসীম। বরং একে দা'ওয়াতের মেরুদণ্ড বলা হয়। যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধে দা'ঈগণের শক্তি-সামর্থ্য কম থাকলে তথা তাদের এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে, সে অবস্থায় অত্যাচারী হোক আর সাধারণ

---

২০৪ আল-কুরআন, ১৬ : ১২৬

২০৫ আল-কুরআন, ৮ : ৬০

মানুষ হোক, সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন একটা বিরাট বিষয়। কেননা, মাযলুম যখন তার উপর বিভিন্ন নিপীড়নে ধৈর্য ধরে, তা দেখে অনেক সময় যালিমের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে ও হৃদয় বিগলিত হয়।

অন্যদিকে দা'ঈর প্রতি সাধারণ মানুষও সমবেদনা অনুভব করতে থাকে। এ জন্য বলা হয়, জনমত স্বভাবত মাযলুমের পক্ষে থাকে। তাই ধৈর্যের মাধ্যমে জনমত দা'ঈর পক্ষে আসে। অত্যাচারী ও সাধারণ জনগণ সকলের মাঝে দা'ঈর দা'ওয়াতের দৃঢ়তা ও সত্যতার ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা জন্মে। এ জন্য সাধারণত প্রতিশোধ না নিয়ে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরার জন্য মাক্কি সূরায় অনেকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমার উপর আপতিত বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।'[২০৬] তাছাড়া ধৈর্য ছাড়া এ পথে টিকে থাকা অসম্ভব। কেননা দা'ওয়াতি কাজে বিভিন্ন মেযাজের লোকদের সাথে মিশতে হয়, শুনতে হয় বিভিন্ন কটু কথা, হাসি, ঠাট্টা ও বিদ্রূপ। কথায় কথায় তাদের সাথে ঝগড়া বাঁধালে বা প্রতিশোধমূলক জবাব দিলে দা'ওয়াতি কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে, 'অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জন-সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলি কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তবে তা হবে একান্ত সৎসহসের ব্যাপার।'[২০৭]

অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে তাগুত ও বাতিলপন্থী লোক যদি অধিষ্ঠিত থাকে, তখন দা'ঈর উপর কি ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন নেমে আসে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত মু'আয আবন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 'যখন মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভ্রান্তির পথে জাতিকে পরিচালিত করবে। তাদেরকে মেনে নিলে পথভ্রষ্ট হবে। আর তাদেরকে না মানলে, তাদের কথা না শুনলে জান দিতে হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো এ সংকটকালে আমাদের কি করণীয়? তিনি উত্তরে বললেন, এ সংকটকালে তোমরা তাই করবে যা ঈসা আ.-এর সাথীরা করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে টুকরা টুকরা করা হয়েছিলো। ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ানো হয়েছিলো। এতদসত্ত্বেও তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করেননি। আল্লাহর পথে তার আনুগত্য স্বীকার করে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ঐ জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে জীবন আল্লাহর নাফরমানি ও খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত।[২০৮]

নির্যাতনের মুখে নিজের আদর্শ ত্যাগ করা বা অত্যাচারীর দলে ভীড়ে যাওয়া ঠিক নয়। বরং ধৈর্যের সাথে দা'ওয়াতি কাজে টিকে থাকতে হবে। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতগণও সে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকতেন। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

'আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।'[২০৯]

এজন্য মাক্কি সূরায় আসহাবুল উখদুদ ও আসহাবুল কাহফের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে দা'ওয়াতি কাজ করতে গিয়ে আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত মহানবী সা.-

---

২০৬ আল-কুরআন, ৩১ : ১৭

২০৭ আল-কুরআন, ৩ : ১৮৬

২০৮ আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি.), খ.১৬, পৃ. ২০৫, হাদিস নং ২২০২১

২০৯ আল-কুরআন, ৩ : ১৪৬

কে পাগল, গণক, কবি, মিথ্যুক, যাদুকর ইত্যাদি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কটুবাক্য সহ্য করতে হয়েছে।

এমনকি শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। কখনো তাঁর পথ চলার পথে কাটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, কখনো গলায় চাদর পেচিয়ে মেরে ফেলার ফন্দি আটা হয়েছে, কখনো সিজদারত অবস্থায় নাড়িভুড়ি ঢেলে দেয়া হয়েছে, কখনো শরীরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার অনুসারীদের উপর চালানো হয়েছে ভয়াবহ নির্যাতন ও অত্যাচারের স্টিম রোলার। হযরত বিলাল, খাব্বাব, সুমাইয়া, আম্মার প্রমুখ নির্যাতিত মুসলিমদের ঘটনা সর্বজন বিদিত।

সর্বোপরি মহানবী সা.-সহ সকলকে মাতৃভূমি মক্কা নগরী থেকেও বিতাড়িত হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও নবী কারিম সা.-এর ধৈর্যে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসেনি। মূলত এ ধৈর্য ও সহনশীলতার ভিত্তি ছিলো আল-কুরআনের মাক্কি সূরার নিম্নোক্ত আয়াত :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.

'তুমি ধৈর্য ধারণ করো যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।'[২১০]

আর এক মাক্কি সূরায় বর্ণিত হয়েছে, فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلاً (সুতরাং তুমি পরম ধৈর্য ধারণ করো।)[২১১] অন্য একটা মাক্কি সূরায় বলা হয়েছে,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ.

'তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আর তুমি হতাশ হবে না।'[২১২]

ঈমানের অগ্নি-পরীক্ষা মনে করা : আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো হকপন্থীদের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করা হবে তারা নিজেদের হকপন্থী হওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এজন্য তারা যেনো ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে বিরক্ত বা সন্দেহ প্রবণ না হয়ে পড়ে। বরং হাসিমুখে এবং ধৈর্য সহকারে তার মুকাবিলা করবে।

দা'ঈগণের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, পরীক্ষার এ পর্যায় অতিক্রম করতে পারলে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। এ মর্মে একটা মাক্কি যুগের সূরায় আল্লাহ বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

'মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। অনন্তর এভাবে আল্লাহ জানবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।'[২১৩]

---

২১০ আল-কুরআন, ৪৬ : ৩৫
২১১ আল-কুরআন, ৭০ : ৫
২১২ আল-কুরআন, ১৬ : ১২৭
২১৩ আল-কুরআন, ২৯ : ১-৩

দা'ঈর এ কথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, ক্রমাগত পরীক্ষাসমূহের মুকাবিলা তাকে করতেই হবে। প্রাণান্তকর সংগ্রাম ও পরীক্ষার পথ পরিহার করে সফলতার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহ বলেন,

'আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং যালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে। আপনার পূর্ববর্তী অনেক নবীকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে নবীগণের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে। আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূ-তলে কোনো সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোনো সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোনো একটা মু'জিযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকেই সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'[২১৪]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথের দা'ঈগণকে এ পথেই অগ্নি-পরীক্ষা করে থাকেন, অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন করে মুসলিমদেরকে দা'ঈ হিসেবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। মু'মিনকে মুনাফিক শ্রেণি থেকে পৃথক করে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে,

'কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোনো সাহায্য আসে, তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক।'[২১৫]

উত্তম আচরণ করা : দা'ঈর প্রতি মন্দ আচরণ করা হলেও যে মন্দ আচরণ করে দা'ঈ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ভালো আচরণ করলে সে ব্যক্তি দা'ঈর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ জন্য মহানবী সা. তার মন-মানসিকতা, আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা না দিয়ে উত্তম আচরণের মাধ্যমে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছেন। আর সেটা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশের আলোকেই, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

'ভালো ও মন্দ সমান নয়। জবাবে তাই বলুন,তাই করুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাতে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেনো অন্তরঙ্গ বন্ধু।'[২১৬]

কেননা মন্দ আচরণের মুকাবিলা মন্দের দ্বারা হলে দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে দূরত্ব বেড়ে যায়। যা দা'ঈ ও দা'ওয়াহর কোনো উপকারে আসবে না। মন্দের প্রতিশোধ নিয়ে মানুষের বাহ্য সমর্থন নেয়া যায়, কিন্তু অন্তর জয় করা যায় না। মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আনতে হলে সেখানে দা'ঈর জায়গা করে নিতে হবে। তাহলেই মাদ'উর হৃদয়-মন, আচার-আচরণ, সমাজ সবকিছু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকবে।

---

২১৪ আল-কুরআন, ৬ : ৩৩-৩৫

২১৫ আল-কুরআন, ২৯ : ১০-১১

২১৬ আল-কুরআন, ৪১ : ৩৪

আর এ জন্য যথাসম্ভব মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। তিনি দা'ঈকে এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। ইরশাদ হয়েছে,

'আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[২১৭]

সৌজন্য বজায় রেখে বিচ্ছিন্ন হওয়া : দা'ঈ চরম ধৈর্য প্রদর্শন এবং বারবার ক্ষমা করে দেয়ার পর যুলুম-নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে বা তার মাত্রা বেড়ে গেলে কিংবা বেড়ে যাওয়ার আশংকা করলে, সে ক্ষেত্রে সেই যালিমদের থেকে সাময়িক দূরত্বে অবস্থান করাই শ্রেয়। তবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ভালো আচরণের মাধ্যমে হতে হবে। তথা শত্রুতা প্রদর্শনের ভিত্তিতে নয়। স্বাভাবিক সৌজন্য বজায় রেখে তার থেকে আলাদা হতে হবে। আল-কুরআনে একেই হাজরে জামিল বা সৌজন্যমূলক পৃথক বলা হয়েছে। এটা অবলম্বনের জন্য দা'ঈগণকে বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً.

'তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সুন্দরভাবে পরিহার করে চলো।'[২১৮]
অন্য মাক্কি সূরায় বলা হয়েছে,

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

'আর জাহিল লোকদের থেকে আপনি বিরত থাকুন।'[২১৯] অন্য স্থানে আরও বলা হয়,

وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.

'আর জাহিল লোকেরা তোমাদের সাথে কথা বলতে এলে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম।'[২২০]

এজন্য নবী কারিম সা. অত্যাচারী ও নিপীড়নকারীদের নিকট থেকে যখন পৃথক হতেন তখন শত্রুতা, হিংসা এবং ঝগড়া-বিবাদ করে পৃথক হতেন না, বরং মানবিক সহমর্মিতার আচরণ অব্যাহত রাখতেন, দা'ওয়াতি কাজও জারি রাখতেন।

সালাত ও দু'আ : চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে শ্রেষ্ঠ দু'আ সালাতের মাধ্যমেও টিকে থাকার চেষ্টা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

'হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চিতই আল্লাহর ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'[২২১]

এজন্য মহানবী সা.-ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করে সালাত আদায় করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা শোনাতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'তুমি কি সেসব লোককে দেখোনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো, সালাত কায়িম করো।'[২২২]

---

২১৭ আল-কুরআন, ৪২ : ৪০
২১৮ আল-কুরআন, ৭৩ : ১১
২১৯ আল-কুরআন, ৭ : ১৯৯
২২০ আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩
২২১ আল-কুরআন, ২ : ১৫৩
২২২ আল-কুরআন, ৪ : ৭৭

তেমনিভাবে বনি ইসরাঈলের উপর যখন ফিরআউনি অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন মুসা আ. সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২২৩]

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগতির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে, মাদ‘ঊ কখনো আর ঈমান আনবে না, তখন তাদের উপর বদদু‘আ করেছেন। যেমন হযরত নূহ আ. তাঁর জাতির ব্যাপারে বদদু‘আ করেছিলেন।[২২৪] এমনিভাবে মুসা আ.-ও পাপাচারী ও অত্যাচারী ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর বদদু‘আ করেছিলেন।[২২৫] এজন্য মহানবী সা. হুশিয়ার করে বলেছেন,

واتقوا دعوة الْمظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب.

‘মাযলুমের দু‘আ সম্পর্কে সতর্ক থেকো। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।’[২২৬]

তবে তারা নিশ্চিত না হয়ে বদদু‘আ করেননি। যেমন মক্কা ও তায়িফবাসী মহানবী সা.-কে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তায়িফবাসী কর্তৃক তিনি নির্যাতিত হওয়ায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে ছিলেন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে নবী কারিমের অভিমত কি তা জানার জন্য। মহানবী সা. তাতে রাজি হননি। আল্লাহর পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন।

আজও দা‘ঈগণের নিকট যেহেতু অহি আসবে না, তাই যালিমদের হিদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তবে এভাবে দু‘আ করা যেতে পারে, ‘হে আল্লাহ! ওদের নসিবে হিদায়াত থাকলে তা প্রদান করুন, অন্যথায় ধ্বংস করে দিন। তাদের শক্তি সামর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন। এ ধরনের দু‘আ দা‘ঈ কাজে লাগাতে পারেন।

সতর্ককরণ ও ভীতি প্রদর্শন : পরিস্থিতি যদি দা‘ঈর কিছুটা অনুকূলে থাকে, অন্য দিকে নির্যাতনও যদি হালকা ধরনের হয়, তবে সে যালিমকে সতর্ক করা যেতে পারে। এমনকি ধমকি বা শাস্তির হুমকিও দেয়া যেতে পারে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি সেদিকেই ইঙ্গিতবহন করে,

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً م بَلِيْغًا.

‘আপনি এদের এড়িয়ে যান, আর সতর্ক করুন এবং এদের ব্যাপারে শক্ত কথা বলুন।’[২২৭]

কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত যালিমদের এ পৃথিবীতে ধ্বংস ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে দা‘ঈকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কেউ গালি-গালাজ করে অন্যায় করলে, তাকেও গালি-গালাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া যাবে না। এমনকি এ ব্যাপারে আল-কুরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, ‘আল্লাহকে ছেড়ে যারা অন্যের আরাধনা করে তাদেরকে মন্দ বলো না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে।’[২২৮]

যালিমদের গণবিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো : যালিমরা যাদের সহযোগিতা নিয়ে যুলুম করে, তারা সমাজের অভিজাত ও ধনিক শ্রেণি এবং যাদের সমর্থনে টিকে থাকে, তারা হলো সাধারণ জনগোষ্ঠি। তাই ঐ যালিমদেরকে জনগোষ্ঠি তথা জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেও

---

২২৩ আল-কুরআন, ১০ : ৮৪-৮৭
২২৪ আল-কুরআন, ৭১ : ২৬-২৭
২২৫ আল-কুরআন, ১০ : ৮৮
২২৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহিহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৫৬
২২৭ আল-কুরআন, ৪ : ৬৩
২২৮ আল-কুরআন, ৬ : ১০৮

অনেক যুলুম নির্যাতন হ্রাস পাবে। আর আখিরাতের অবস্থা তুলে ধরেই দা'ঈগণকে সে কৌশল শেখানো হয়েছে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে। যেখানে বলা হয়েছে,

'আর কতইনা উত্তম হতো, যদি এ যালিমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিতো যে, আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। অনুসৃত নেতাগণ যখন তাদের অনুসারীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে, আর এভাবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের পার্থিব সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তখন সে অনুসারীরা বলবে, হায়! যদি একবার ফিরে যেতে পারতাম, তবে আমরাও ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেভাবে তারা আজ করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন। আর তারা জাহান্নাম থেকে কখনো বের হতে পারবে না।'[২২৯]

এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরে দা'ঈগণ জনসাধারণকে যালিমদের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলতে পারেন। কেননা আজ যালিমদের হয়ে কোনো যুলুমে সাহায্য করলে একদিন সেটাই তাদের জন্য পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

অবরোধ ও বয়কট : অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি দিক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করে অসহযোগিতা প্রদর্শন করার মাধ্যমেও অনেক দা'ওয়াহ বিরোধীকে প্রতিরোধ করা যায়। তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখা যায়। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক অভিনব পদ্ধতি। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মুনাফিক, অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীকে উক্ত পদ্ধতিতে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যায়। এজন্য অত্যাচারী মক্কার কাফিরদেরকে চিন্তাগত বয়কট করার জন্য মাক্কি সূরা কাফিরূন নাযিল হয়। আর কার্যগত ও সহযোগিতামূলক ইস্যুতে বয়কট করার জন্য নির্দেশ করা হয় অন্য মাক্কি সূরার নিচের আয়াতে,

وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.

'আর যালিমদের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হবে না, তখন তোমাদের জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।'[২৩০]

এ বয়কট পদ্ধতি পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যও ইসলাম অনুমোদন করেছে। যেমন কারো স্ত্রী যদি অন্যায়ভাবে অবাধ্যতায় সীমালংঘন করে, তবে তাকে বিছানায় বয়কট করার নির্দেশনা পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে।[২৩১]

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যবহারের প্রচেষ্টা : সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন রকমের যুলুম প্রতিরোধ, সমাজ সদস্যদের মতবিরোধ নিরসন, সামাজিক সমস্যা সমাধান ও কল্যাণই তার মূল লক্ষ্য। কুরআনের ভাষায় আল্লাহ তা'আলা সকল নবী-রাসূলকে ঐ পরিকল্পনা দিয়েই পাঠিয়েছিলেন।[২৩২]

অনেকে কুরআনে বর্ণিত ন্যায়দণ্ড ও লৌহদণ্ডকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর কিতাবকে সংবিধান বলেছেন। এ সকলের সমন্বয়ে সমাজে ইসলামি আইন চালু করা গেলে সব রকমের যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন সম্ভব।

অপসংস্কৃতি ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া : শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থও খাঁটি ইসলামি দা'ঈদের সহ্য করে না। যেমন ইবরাহিম আ.-এর পিতা আযর ধর্মীয় নেতা। তিনি ইবরাহিম আ.-এর দা'ওয়াতের পথে বাধা দিয়েছিলেন।

---

২২৯ আল-কুরআন, ২ : ১৬৫-১৬৭
২৩০ আল-কুরআন, ১১ : ১১৩
২৩১ আল-কুরআন, ৪ : ৩৪
২৩২ আল-কুরআন, ৫৭ : ২৫

তেমনি শেষনবী আশা করেছিলেন ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আহবার ও রুহবানরা গয়তো তাঁর দা'ওয়াত সহজেই গ্রহণ করবে। কারণ আল্লাহ, আখিরাত, নবী, অহি ইত্যাদির সাথে তারা পূর্বেই পরিচিত। কিন্তু দেখা গেলো, রাসূল সা.-এর দা'ওয়াতের সাথে যখন মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমি স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো, তখন ঐসব আহবার ও রুহবানদের ধর্মীয় স্বার্থও তাদেরকে আবু জাহেলের সাথেই সহযোগিতা করতে বাধ্য করলো।

এভাবে এক শ্রেণির ভণ্ডপীর ও বিকৃতমনা বুদ্ধিজীবী সমাজে ধর্মের দোহাই দিয়ে ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক হয়ে দা'ঈদের উপর নির্যাতনের সহায়তা দেয়। জনমতকে খোদাদ্রোহীদের পক্ষে ও ইসলামি দা'ঈদের বিপক্ষে নিয়ে যায়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন তাইমিয়া, হাসান আল-বান্না, সাইয়িদ কুতুব প্রমুখ ইসলামি দা'ঈ ও তাদের অনুসারীদের উপর যে নির্যাতন নেমে এসেছিলো, তাতে ঐ শ্রেণির লোকদের সহায়তা কার্যকর ছিলো। তাই তাদের ভণ্ডামি, চাতুর্য ও ধর্ম ব্যবসা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করতে হবে। তাদেরকে গণবিচ্ছিন্ন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও তাদের মাঝে দেয়াল রচনা করতে হবে।

সংগ্রাম ও সশস্ত্র প্রতিরোধ : যুলুম প্রতিরোধে সশস্ত পদক্ষেপ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি দা'ঈগণের শক্তি যখন একটা রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয় এবং সামর্থ্য থাকে, তখন সে পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। দা'ইগণ এতে সামর্থ্যবান হলে এটা খুবই কার্যকরী পদক্ষেপ। ইসলামের চূড়ান্ত জিহাদ বা সশস্ত্র সংগ্রামকে যে ক'টি উদ্দেশ্যে অনুমোদন করেছে, তাতে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো– যুলুমের মূলোৎপাটন।[২৩৩] বস্তুত আল্লাহ তাঁর পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অরাজকতা দেখা দিক তা চান না। তিনি চান না তার বান্দাদের বিনা অপরাধে নির্যাতন করা হোক, ধ্বংস করা হোক।

কিন্তু রাসূল সা.-এর যুদ্ধনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিলো সাধ্যমতো জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে নতুন নতুন কৌশল ও নৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রু শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া।

সন্ধিচুক্তি করা : সাধারণত প্রতিপক্ষ সন্ধি করতে চাইলে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত।[২৩৪] ইসলামি দা'ঈগণও যুদ্ধে অপারগ হলে সন্ধিচুক্তিতে আসার চেষ্টা করতে পারেন। আর এটা সামরিক চুক্তিও হতে পারে। যেমন মহানবী সা.-এর হুদাইবিয়ার চুক্তি, আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তিও হতে পারে। যেমন রাসূল সা.-এর মদিনা সনদের মাধ্যমে চুক্তি। উল্লেখ্য, মহানবী সা.-এর এসব চুক্তির মাধ্যমে যালিমদের পক্ষ থেকে অনেক যুলুম থেকে মুসলিমদেরকে হিফাজত করা হয়েছিলো।

প্রভাবশালীদের আশ্রয় লাভ : যালিম থেকে রক্ষা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কিংবা রাষ্ট্রের সহযোগিতা বা আশ্রয় নেয়া যায়। ইসলামি দা'ওয়াতের পরিভাষায় একে সুলতান নাসির তথা সাহায্যকারী কর্তৃত্ব বলা হয়।[২৩৫] এজন্য মহানবী সা. হযরত উমর ও আবুল হাকাম আবু জাহলের ইসলাম গ্রহণ কামনা করতেন। উক্ত প্রভাবশালী মহলটি মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, প্রয়োজনে ও নির্ভরযোগ্য মনে হলে উভয় প্রকারের ব্যক্তির আশ্রয় নেয়া যাবে। এজন্য মহানবী সা. মক্কায় স্বীয় চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তায়িফে গিয়েছিলেন দা'ওয়াত নিয়ে এবং সাহায্যকারী খুঁজতে। তৎকালীন মক্কার অবস্থা তাঁর জন্য অনুকূলে ছিলো না। তাই তায়িফে নিরাশ হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন মাত'আম ইবন আদ্দির আশ্রয়ে।[২৩৬]

---

২৩৩ আল-কুরআন, ২২ : ৩৯; ৮ : ৩৯; ২ : ১৯০, ১৯৩; ৪ : ৭৫

২৩৪ আল-কুরআন, ৪ : ৯০

২৩৫ আল-কুরআন, ১৭ : ৮০

২৩৬ ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত তারিখ*(বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৭), খ.২, পৃ. ৯২

কাহাফ পদ্ধতি : কাহফ পদ্ধতি হলো পাহাড়-পর্বতের গুহায় তথা গোপনীয় কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকা। যালিমের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে কোনো রকমের প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে দা'ঈ আত্মগোপন করতে পারেন। তবে এর সাথে যথাসম্ভব প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। যুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য এ পদ্ধতি অনেক দা'ঈ অবলম্বন করেছেন। যেমন ইয়াহুদিদের যুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য প্রাথমিক কালের খ্রিস্টানগণ পাহাড়-পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছুটা অজ্ঞাত থাকলেও এ ধরনের কাহফ বা গুহাবাসীর কথা কুরআনে আলোচিত হয়েছে।[২৩৭] এমনকি নবীগণের মাঝেও কেউ কেউ তা অবলম্বন করেছিলেন। যেমন– হযরত যাকারিয়া আ. একটা গাছে, ঈসা আ. গহীন জঙ্গলে, মহানবী সা. হিজরতের সময় মক্কায় পাহাড়ের গুহায়। এটা কাপুরুষতা নয়; বরং পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন।

হিজরত : অত্যাচার যদি এমন পর্যায়ে যায় যে, দা'ঈর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। অথচ প্রতিরোধের কোনো কৌশলই তার হাতে নেই, নেই কোনো আশ্রয় বা আত্মগোপন করার স্থান, সেক্ষেত্রে দা'ঈ হিজরত করবেন। বরং নির্যাতিত অবস্থায় সকলকে করার জন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৩৮] এমনকি আল্লাহ তা'আলার অনেক নবী-রাসূলও হিজরত করেছেন। যেমন– হযরত ইবরাহিম, মুসা আ. ও হযরত মুহাম্মদ সা.। সর্বশেষ নবী নিজে হিজরত করার পূর্বেও মুসলিমদেরকে দু'দফা হাবশায় হিজরতে পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনিও স্বীয় অনুসারীগণসহ ধীরে ধীরে মদিনায় হিজরত করেন এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দ্বীনকে বিজয়ী করেন। অতএব দা'ঈগণকেও শুধু হিজরত করলে চলবে না। বরং হিজরত করতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ও দা'ওয়াতকে সফলতায় পৌঁছানোর জন্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআনের মাক্কি সূরায় যেভাবে দা'ওয়াতি পদ্ধতি ও কৌশল উপস্থাপিত হয়েছে ও মহানবী সা. মানব জীবনে তা প্রয়োগ করেছেন, তা হলো স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের এক সমন্বিত রূপ। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যে কোনো গ্রহণ, বর্জন ও পরিবর্তন দা'ওয়াতি হিকমত নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই আল-কুরআনের মাক্কি সূরার আলোকে প্রণীত দা'ওয়াতি পদ্ধতি ও কৌশল আধুনিক যুগেও অত্যাবশ্যক। কোনো দা'ঈ যদি তাওহিদি আকিদা এবং শারি'আহ ও আখলাকের মূলনীতির দিকে দা'ওয়াত দিতে চায়, তাহলে তা মাক্কি সূরায় দেখা গেছে অতীতে সকল নবী-রাসূল একই দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। বর্তমান যুগের দা'ঈগণ যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনে উত্তম পন্থায় তর্কের নীতি প্রয়োগ করতে চাইলে তা হযরত ইবরাহিম আ.-এর দা'ওয়াতে পাওয়া যাবে। দা'ঈগণ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অস্ত্রের ব্যবহার করতে চাইলে, তা মাক্কি সূরায় বর্ণিত হযরত মুসা, দাউদ আ.-সহ অনেকের দা'ওয়াতে তার সন্ধান পাওয়া যাবে। সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচি নিতে চাইলে, তা হযরত শু'আইব, ইউসুফ, মুসা আ.-এর দা'ওয়াতে খুজে পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক সংস্কার আনতে চাইলে, তা ইউসুফ ও শু'আইব আ.-এর দা'ওয়াতি কর্মসূচিতে খুজে পাবেন। এভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে সামগ্রিক বিষয় শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াতে খুজে পাবেন। আল-কুরআনের মাক্কি সূরাসমূহ সকল স্তরের মানুষের জন্য দা'ওয়াতের পদ্ধতিসহ সকল বিষয় উপস্থাপনের কৌশলাদিও সরবরাহ করেছে এবং মহানবী সা. তা মানব জীবনে প্রয়োগ করেছেন, যা দা'ওয়াতের মূলনীতিতে রূপ নিয়েছে।

---

২৩৭ আল-কুরআন, ১৮ : ২০

২৩৮ আল-কুরআন, ৪ : ৯৭-১০০

উপসংহার

ইসলামে দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেছেন মূলত আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এই দা'ওয়াতি মিশন নিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা. একই পদ্ধতিতে মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেন। দা'ওয়াতি মিশন সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন পবিত্র কুরআনের দা'ওয়াতি পদ্ধতির মাধ্যমে। বিশেষ করে এ কাজের জন্য তিনি মাক্কি সূরাসমূহের আলোকে অভিনব কৌশলসমূহ অবলম্বন করেন। আল্লাহর রাসূল সা. কর্তৃক প্রণীত দা'ওয়াতের কোনো উপস্থাপন কৌশল বা মাধ্যমকে যুগোপযোগী ও সামঞ্জস্যশীল করা তথা মডারেট করাও একটা দা'ওয়াতি মূলনীতি। মহানবী সা. নিজেও তা করেছেন। যেমন– কুরাইশদের প্রথা অনুযায়ী ভয়াবহ কোনো পরিস্থিতিতে লোকজনকে সংবাদ দেয়ার জন্যও তাদেরকে সাফা পাহাড়ে একত্রিত করা হতো। যিনি সংবাদটি দিতেন, তিনি উলঙ্গ হয়ে লোকজনকে আহ্বান করতেন। তাদের ভাষায় তাকে বলা হতো 'নাযিরুল উরয়ান' তথা উলঙ্গ সতর্ককারী। মহানবী সা.ও ভীষণ ভাব-ব্যঞ্জণায় আহ্বান করে লোকদের একত্রিত করেন এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করেন। কিন্তু জাহিলি প্রথানুসারে তিনি বিবস্ত্র হননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে উক্ত মাধ্যমটিকে উন্নত, পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করেছিলেন।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সা. তাঁর মাক্কি জীবনে আল-কুরআনের মাক্কি সূরার দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিয়েছেন। যুগে যুগে দা'ঈগণও রাসূল সা.-এর অনুসরণে মাক্কি সূরার আলোকে দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। আর সেজন্যই মাক্কি সূরাসমূহের এ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে **দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কী সূরাসমূহের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা** বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে। ইসলামে দা'ওয়াতের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কি সূরাসমূহের গুরুত্বও সীমাহীন। সুতরাং এর আলোকে একজন দা'ঈ ইলাল্লাহকে দা'ওয়াতি কার্যক্রমে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কিছু মৌলিক জ্ঞানের সমন্বয়। যেমন– সামগ্রিকভাবে আল-কুরআনের পরিচিতি, নাযিলের কারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মাক্কি-মাদানি সূরার পরিচিতি ও বৈশিষ্টাবলিসহ কুরআন-হাদিসের মৌলিক পার্থক্য ও পরিসংখ্যানমূলক তথ্যাবলির সুস্পষ্ট জ্ঞান। উল্লিখিত মৌলিক জ্ঞানসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দা'ঈকে সমসাময়িক যুগের চাহিদার আলোকে দা'ওয়াহ পদ্ধতি ও কৌশলের সঠিক প্রয়োগ জানা আবশ্যক। দা'ওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা ও পরকালের প্রতি ভয়-ভীতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে আল-কুরআনে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নামের সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করা যা আল-কুরআনের মাক্কি সূরাসমূহে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল-কুরআন নাযিলের যুগে দা'ঈগণ এক সাথে পূর্ণাঙ্গ কুরআন পাননি। তা তেইশ বছরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। কিন্তু বর্তমানে পূর্ণাঙ্গরূপে কুরআন মানুষের মাঝে বিদ্যমান। কুরআন নাযিলের যুগে মুসলিমগণ প্রতীক্ষায় থাকতেন যে কখন কি নাযিল হয়, কোন বিষয়ে না জানি কোন আদেশ নাযিল হয়। কিন্তু তৎপরবর্তী কালে মুসলিমগণ এ ধরনের প্রতীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেননি। এটা তাদের জন্য মহা সুযোগ। চিন্তা-ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাদের

জন্য সহজসাধ্য হয়েছে। তৎকালীন মুসলিমগণের সংখ্যা ছিলো কম, কিন্তু বর্তমানে অনেক। অনন্তর দা'ঈর সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বেশি। সে সময় মুসলিমগণ প্রধানত জাযিরাতুল আরবে সীমিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সংখ্যায় কম-বেশি তারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। তৎকালীন সময়ে ধর্মগুলো মানুষের মাঝে সত্যের দাবিদার বলে বিরাজ করছিলো। কিন্তু বর্তমানে তাদের দ্বারাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের অসারতা ও অগ্রহণযোগ্যতা দিন দিন প্রকাশিত হচ্ছে। যে জন্য সেসব ধর্মাবলম্বীগণ হীনমন্যতায় ভুগছে। কুরআন নাযিলের যুগে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ কঠিন ছিলো। একটা সংবাদ পৌঁছাতে হয়তো স্থানভেদে কয়েক ঘন্টা, কয়েক দিন বা কয়েক মাস লেগে যেতো। কিন্তু বর্তমানে উন্নত যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে কি ঘটছে অল্পক্ষণের মধ্যেই তা অন্য প্রান্তের মানুষ জেনে যাচ্ছে। সেজন্য বর্তমান বিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বপল্লী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এটা বিশ্বময় দা'ওয়াত প্রসারের পথ সহজ, সুগম ও প্রশস্ত করেছে।

কুরআন নাযিলের যুগে দা'ওয়াতি কর্ম ছিলো ইখলাস নির্ভর। যা বর্তমানে অনেকাংশে লোক দেখানো কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে যে দা'ওয়াত ছিলো এক মহিমান্বিত সেবা, বর্তমানে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পেশা। পূর্বে দা'ওয়াত বলতে বুঝাতো একটা আকিদা, একটা পয়গাম, পরিতৃপ্তি, স্বাদ ও হৃদয়ের আকুতি। বর্তমান সমাজে যা হয়ে গেছে ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের মাধ্যম। যা রূপান্তরিত হয়েছে একটা কষ্টকর পেশায়। পূর্বের দা'ওয়াত উৎসারিত ছিলো এমন এক অনুভূতি থেকে, যা সৃষ্টি হয়েছিলো সমাজের পথভ্রষ্টতা ও বিপর্যয় অবলোকন করে, আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষ দূরে সরে গিয়ে যেমন করে দুর্ভাগ্য ডেকে এনছিলো, তা থেকে উদ্ধারের প্রেরণা থেকে। কিন্তু বর্তমান সমাজে দা'ওয়াত হচ্ছে দা'ঈর নিজস্ব পথ বা দলমতের কর্মী হিসেবে। পূর্বযুগে দা'ঈগণ আল-কুরআনের ছায়ায় ইসলামি দা'ওয়াহ নিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে দা'ঈগণ বিভিন্ন বাড়িতে বা আস্তানায় বসে অপেক্ষা করেন, যেনো লোকজন তাদের কাছে আসে দা'ওয়াত গ্রহণ করার জন্য, নিজেদের সংশোধনের জন্য। পূর্বযুগের দা'ঈগণ ছিলেন মানুষের জন্য ইসলামি আদর্শের মূর্তপ্রতীক। তাদের ব্যক্তিত্ব ছিলো আকর্ষণীয়। যা দেখে মানুষ দা'ওয়াত গ্রহণ করতো। দা'ঈগণ যা করতেন, লোকজনও তা নিজেদের জবিনে আঁকড়ে ধরতো। কিন্তু বর্তমানে একজন দর্শক অনেক দা'ঈর আচার-আচরণের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়। কারণ তারা যা বলে তা করে না। সুতরাং ইসলামি জীবনাচার তাদের মাঝে না থাকায় তাদের দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হয় না। কুরআন নাযিলের যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন প্রত্যেকেই ভাবতেন যে, তাদের নিজেদেরকেও সে দা'ওয়াতি কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে সাধারণত সে চেতনা মুসলিমগণের মাঝে বহুলাংশে অবর্তমান। পূর্বযুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তারা অনুভব করতেন যে, এখন থেকেই তারা জাহিলি ও কুফরি সমাজ থেকে পৃথক। কিন্তু বর্তমানের মুসলিমগণ সাধারণত এ ধরনের চিন্তা অনুভব করেন না। অধিকাংশ মুসলিমের ঈমানি চেতনা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

কুরআন নাযিলের যুগে দা'ঈগণের মাঝে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের সহযোগিতা সাধারণত নেই বলহে চলে। আছে দলীয় চেতনা প্রসূত সহযোগিতা। বিভিন্ন পদমর্যাদা ও মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য পূর্ব যুগে দা'ঈগণের মধ্যে কোনো অসঙ্গত প্রতিযোগিতা ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে তা সচরাচার পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অহি নাযিলের যুগে কাফির, মুনাফিকদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কুরআনে পূর্ব সতর্কতামূলক আভাস দেয়া হতো। কিন্তু রাসূল সা.-এর ওফাতের পর কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু অহি বন্ধ তাই

এখন সে ধরনের আগাম সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে এসব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। পূর্ব যুগে মদিনায় মহানবী সা.-এর হিজরতের পর মুসলিমগণের জন্য একটা দা'ওয়াতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমানে দা'ওয়াতি রাষ্ট্র নেই বললেই চলে। মুসলিমগণের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে সে যুগে একটামাত্র কেন্দ্রিয় কর্তৃত্ব ছিলো। কিন্তু আজ সেটা বিদ্যমান নেই। সে যুগে বিজ্ঞানের নামে নাস্তিকতা চলতো না। কিন্তু বর্তমানে নাস্তিকরা ছলে বলে কৌশলে তা চালাতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রচুর অনুসারীও তারা পেয়েছে।

কুরআন নাযিলের যুগে বর্তমান যুগের তুলনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় বিভিন্ন অপরাধ বা মন্দ কাজের প্রভাব মন্থর গতিতে স্থানান্তরিত হতো। কিন্তু বর্তমান আধুনিক প্রচার মাধ্যমের সুবাদে সেগুলো অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। পূর্ব যুগে পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ও কৌশলের দিক দিয়ে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ইসলামি দা'ওয়াতের কার্যক্রমের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেনি বা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক যুগে দা'ওয়াতের তুলনায় দা'ওয়াত বিরোধী তৎপরতা এতটাই বেশি যে, আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

নবী-রাসূলগণের যুগেও দেখা গেছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রত্যেক নবীর জন্য হাওয়ারি তথা সাহায্যকারী ছিলো। নবীদের গঠিত দলের কথা কুরআনের মাক্কি সূরাতে উল্লিখিত রয়েছে। আধুনিক যুগে ইসলামি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কম-বেশি ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন, প্রাতিষ্ঠানিক, প্রচার মাধ্যম ও ইন্টারনেট কেন্দ্রিক দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আধুনিক যুগে ইসলামি দা'ওয়াতের সফলতায় বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান ইসলামের যুগ। এর সফলতা ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া ইসলামি দা'ওয়াতের প্রাথমিক কৌশলগত স্থান হলো মানুষের ফিতরাত, যা সকলের মাঝেই নিহিত রয়েছে। এমনিভাবে দা'ঈগণের হাতে মু'জিযা রয়েছে আল-কুরআন ও মহানবী সা.-এর সিরাত। পাশাপাশি আছে হিকমতপূর্ণ তথা বিজ্ঞানভিত্তিক দা'ওয়াহ পদ্ধতি। একইভাবে মুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াতি চেতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেখে ইসলামের বিরোধীরাও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে মানব রচিত মতবাদগুলো তাদের সুঁতিকাগারে প্রত্যাবর্তিত হয়ে গেছে। আধুনিক বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ দিশেহারা হয়ে শান্তি খুজছে, সত্যের অনুসন্ধান করছে। দা'ঈগণ যদি এ মোক্ষম সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন, তবে গোটা বিশ্বে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটতে পারে; বরং এ সম্ভাবনাই অতি উজ্জল।

অতএব কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাপক সংশোধন করে ইমানি শক্তিতে বলীয়ান হওয়া ও অন্যকে বলীয়ান করা কর্তব্য। নির্দ্বিধায় কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়কে আকড়ে ধরতে হবে। সত্য গ্রহণে পরস্পরে উপদেশ দিতে হবে এবং নিজের কোনো ভুল হলে তা নিসংকোচে মেনে নিতে হবে। চরম ধৈর্য সহকারে দা'ওয়াতের পথে এগুতে হবে। নৈরাজ্যের মুকাবিলায় আরেকটি নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। ইসলামি দা'ওয়াত দেয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিতে হবে, পরিকল্পনা মাফিক হিকমতের সাথে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাড়াহুড়ো প্রবণতা পরিহার করতে হবে। একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে এবং জীবনে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতে হবে। কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। খণ্ডিত ইসলাম নয়; বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বরণ ও উপস্থাপন করতে হবে। ইসলামি নেতৃত্ব সৃষ্টির উপর প্রচণ্ড গুরুত্বারোপ করতে হবে। ইসলামি দা'ঈদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ও সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর মাঝে সংগ্রামী

এবং গবেষণা মনোবৃত্তি জাগ্রত করতে হবে। দা'ওয়াতি বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাঝে সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। চরম ইখলাস ও মানবতার প্রতি প্রভূত দরদ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইসলামি ঐক্য ও ইমানি ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তৃত্বকে ইসলামি দা'ওয়াতের পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দম্ভ ও ভোগ বিলাসিতার পরিবর্তে বিনয়, নম্রতা ও পরিমিত জীবনাচারের আদর্শ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে এবং চলা ফেরায় মার্জিত, পরিশীলিত স্মার্ট হতে হবে। শিক্ষিত সমাজের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসলাম বিরোধীদের চক্রান্ত সম্পর্কে নিজে সচেতন থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও সচেতন করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, কৌশল ও মাধ্যম উদ্ভাবন ও তা ব্যবহারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি অসীম সাহস ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থা রেখে ইসলামি দা'ওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেনো সকল মানুষকে দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্কি সূরাসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করেন। মাক্কি সূরাসমূহের শিক্ষার আলোকে আল্লাহর রাসূল সা. যেভাবে দরদ নিয়ে দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, আধুনিক যুগের বিশ্ব মুসলিম যেনো সে পথ অনুসরণ করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সন্ধান করে নিতে পারেন মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সে কামনা করছি।

প্রামাণ্য চিত্রাবলি

চিত্র-১

আধুনিক যুগের কা'বা শরিফ

চিত্র-২

মধ্যযুগের যুগের কা'বা শরিফ

চিত্র-৩

হেরা গুহা : যেখানে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা।

চিত্র-৪

সাফা পাহাড় : যেখানে মহানবী সা. সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত ঘোষণা করেন

চিত্র-৫

আধুনিক যুগের সাফা পাহাড়ে গমনের পথ

চিত্র-৬

আল-কুরআনে প্রামাণ্য হস্তলিপি

চিত্র-৬

আল-কুরআনে প্রামাণ্য হস্তলিপি

চিত্র-৭

কুরআনের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থানের কাল্পনিক চিত্র

Ref: http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/06/blog-post_6.html

চিত্র-৮

হেরেম শরিফের সীমানা মানচিত্র

চিত্র-৯

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

١. القرآن الكريم

٢. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد : *الجامع لأحكام القرآن*، الرياض: دار عالم الكتب، ١٣٧٢هـ

٣. الألوسى، العلامة شهاب الدين السيد محمود : *روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*، بيروت: دار إحياء التراث العربي

٤. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير : *جامع البيان عن تأويل آى القرآن (تفسير الطبري)*، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ

٥. نخبة من العلماء : *التفسير المیسر*، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٣٠هـ

٦. ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر : *تفسير القرآن العظيم*، الرياض: دار طيبة، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ

٧. الأندلسى، أبو حيان : *تفسير البحر المحيط*، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣م

٨. القرطبي، محمد بن أحمد : *الجامع لأحكام القرآن*، الرياض: دار عالم الكتب، ١٣٧٢هـ

٩. البيضاوي، القاضي نصير الدين : *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، استانبول: مكتبة الحقيقة، ١٤١٩هـ

١٠. الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي : *لباب التأويل فى معانى التنزيل*، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ

١١. باني باتي، القاضي محمد ثناء الله المظهري : *تفسير المظهري*، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ

١٢. النيسابوري، العلامة نظام الدين الحسن بن محمد : *تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان*، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ

١٣. الرازي، الإمام فخر الدين : *التفسير الكبير*، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ

١٤. رضا، السيد محمد رشيد : *تفسير القرآن الحكيم*، القاهرة: دار الْمنار، الطبعة الثانية، ١٣٦٦هـ

١٥. الزمخشاري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر : *تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل*، بيروت: دار الْمعرفة، الطبعة الثالثة، ١٤٣٠هـ

١٦. السيوطي، الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن : *الإتقان فى علوم القرآن*، الْمدينة الْمنورة: مجمع الْملك فهد لطباعة الْمصحف الشريف، ١٤١٦هـ

١٧. الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السرى : *معانى القرآن وإعرابه*، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ

١٨. الزرقشي، بدر الدين محمد بن عبد الله : *البرهان في علوم القرآن*، القاهرة: دار الحديث، ١٤٢٧هـ

١٩. الذهبى، د. محمد حسين : *علم التفسير*، القاهرة: دار الْمعارف، ١٤٢٦هـ

٢٠. القطان، مناع : *مباحث فى علوم القرآن*، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤١٣هـ

٢١. الصالح، الدكتور صبحى : *مباحث فى علوم القرآن*، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة العاشرة، ١٩٧٧م

٢٢. الزرقانى، الشيخ محمد عبد العظيم : *مناهل العرفان في علوم القرآن*، بيروت: دار الكتاب العربى، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ

٢٣. البخاري، محمد ابن اسماعيل : *الجامع الصحيح للبخاري*، دمشق: دار النوادر، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م

٢٤. القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح *مسلم*، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م

٢٥. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى : *جامع الترمذي*، الرياض: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م

٢٦. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث : *سنن أبي داود*، الرياض: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م

٢٧. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي : *سنن النسائي*، الرياض : بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م

٢٨. القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد : *سنن ابن ماجه*، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م

٢٩. الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد : *شرح الطيبي على مشكاة الْمصابيح*، مكة الْمكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م

٣٠. ولي الله، شاه : *حجة الله البالغة*، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٠هـ

٣١. مجلس الْمراجعة : *دائرة الْمعارف الإسلامية*، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٣٣م

٣٢. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير : *قصص الأنبياء*، دمشق : دار ابن كثير، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ

٣٣. ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر : *البداية والنهاية*، الرياض : بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م

٣٤. ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الجزري : *الكامل في التاريخ تاريخ ابن الأثير*، بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ الْموافق ١٩٨٧م

٣٥. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : *تاريخ الإسلام ووفيات الْمشاهير والأعلام*، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م

٣٦. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت : *تاريخ الأنبياء*، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ

٣٧. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : *لسان العرب*، الكويت : دار النوادر، طبعة خاصة، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م

٣٨. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب : بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، القاهرة : لجنة إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م

٣٩. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس الْمحيط، القاهرة : دار الحيث القاهرة، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م

٤٠. الدكتور إبراهيم مدكور : *الْمعجم الوجيز*، القاهرة: دار التحرير للطبع والنشر، ١٩٨٩

٤١. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف : *المعجم الوسيط*، القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، تحت إشراف مجمع اللغة العربية لجمهورية مصر العربية، الطبعة الرابعة، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م

٤٢. الزبيدي، السيد مرتضى الحسيني : *تاج العروس من جواهر القاموس*، الكويت : مطبعة حكومة الكويت، ١٣٨٥هـ، ١٩٦٥م

٤٣. فهرسة مكتبة فهد الوطنية : *الموسوعة العربية العالَمية*، الرياض : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م

٤٤. غلوش، الدكتور أحمد : *أصول الدعوة الإسلامية*، القاهرة: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٥هـ

বাংলা উৎস

৪৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী : অনূঃ মাওলানা মহিউদ্দীন খান, তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন, মদিনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল-হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৪৬. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারি : অনূঃ মাওলানা আজিজুল হক, *সহিহ আল-বুখারি*, ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮১

৪৭. আল-আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন : *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৩

৪৮. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর : *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৯

৪৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ১৪শ খণ্ড*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩

৫০. হিফজুর রহমান সিওহারবি : অনূঃ মাওলানা নুরুর রহমান, *কাছাছুল কুরআন*, ঢাকা : এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ২০০৫

৫১. ইবন কাসীর, আবুল ফিদা হাফিজ আদ-দামেশকি : *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, অনূঃ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন প্রমুখ, ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৭

৫২. ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক : *সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনূঃ আকরাম ফারুক, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

৫৩. ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক : সীরাতুননবী (সা.), ১ম খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ১৯৯৪

৫৪. ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক : সীরাতুননবী (সা.), ২য় খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ১৯৯৪

৫৫. ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক : সীরাতুননবী (সা.), ৩য় খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫

৫৬. ইবনে হিশাম, আবদুল মালেক : সীরাতুননবী (সা.), ৪র্থ খণ্ড, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৬

৫৭. নজিবাবাদী, মাওলানা আকবর শাহ খান : *ইসলামের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও অন্যান্য, ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৮

৫৮. নজিবাবাদী, মাওলানা আকবর শাহ খান : *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৮

৫৯. নজিবাবাদী, মাওলানা আকবর শাহ খান : *ইসলামের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৮

৬০. আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ : *মোস্তফা চরিত*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ৮ম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৫

৬১. হোসেন, কাজী আকরাম : *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১ম মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৫

৬২. ইসমাঈল, সেখ মোহাম্মদ ও হক, কাজী জহুরুল : *ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম জাহান*, ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন, আগস্ট ২০০১

৬৩. আমীন, ড. আহমদ : *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, অনূঃ মুহাম্মদ আবূ তাহের মেসবাহ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৪

৬৪. আমীন, ড. আহমদ : *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, অনূঃ মুহাম্মদ আবূ তাহের মেসবাহ, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০২

৬৫. আমীন, ড. আহমদ : *দুহাল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, অনূঃ মুহাম্মদ আবূ তাহের মেসবাহ, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০০৪

৬৬. আহমদ, সোহরাব উদ্দীন : *মুসলিম জাহান*, ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৯

৬৭. আমীর আলী, সৈয়দ : *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, অনূঃ ড. রশীদুল আলম, ঢাকা : আয়েশা কিতাব ঘর, জুলাই ২০০২

৬৮. আমীর আলী, সৈয়দ *আরব জাতির ইতিহাস*, অনুবাদ- শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ৩য় পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০০৪

৬৯. কে আলী, অধ্যাপক *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮০

৭০. হাসান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল : *আরব জাতীর ইতিহাস*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬

৭১. রেজা-ই-করীম, মুহাম্মদ *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় পুণমুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০০

৭২. চৌধূরী, হাসান আলী : *ইসলামের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৮

৭৩. উসমানি, আল্লামা তক্বী : *উলূমুল কুরআন*, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : আল-জামি'আতুস সিদ্দিকিয়া, নভেম্বর ২০০০

৭৪. উবাইদুল্লাহ, মুফতী মুহাম্মদ : *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : দারুল কিতাব, নভেম্বর ২০০০

৭৫. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ : *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫

৭৬. শফিকুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ : *'উলূমুল কুরআন*, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, নভেম্বর ২০১১

৭৭. দেহলভী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ : *আল ফাওযুল কাবীর*, অনূঃ মাওলানা মাহদী হাসান, ঢাকা : মক্কা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৭৮. ইউসুফ, আবুল কালাম মুহাম্মদ : *মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি ও কেন*, ঢাকা : খেলাফত পাবলিকেশন্স, ২০১০

৭৯. আহমাদ, ড. এসরার : *কুরআনের পরিচয়*, অনূঃ মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০৭

৮০. আনওয়ারী, ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান : *তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০২

৮১. আনওয়ারী, ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান : *ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: বিআইআইটি, সেপ্টেম্বর ২০০৬

৮২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *দ্বীনী দাওয়াত*, অনূঃ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ খালেদ, তাবলীগী ফাউন্ডেশন, ১৪২৭ হি.

৮৩. খান, আব্বাস আলী : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ২০১১

৮৪. আহমদ, এ. কে. এম. নাজির : *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মে ২০১৩

৮৫. আনোয়ার, মুফতী এমদাদুল্লাহ : *জান্নাতের বর্ণনা*, অনূঃ মাওলানা নাজমুল হুদা মিরপুরী, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জানুয়ারি ২০১৩

৮৬. আনোয়ার, মুফতী এমদাদুল্লাহ : *জাহান্নামের বর্ণনা*, অনূঃ মাওলানা নাজমুল হুদা মিরপুরী, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ইংরেজি উৎস

87. Hitti, Philip K. : *History of the Arabs,* Palgrave Macmillan : ST Martins, 10th edition 1972

88. Margoliouth, D. S. : *History of Islamic Civilization,* New Delhi : Kitab Bhavan, reprint, 1978

89. Ameer Ali, Syed : *A Short History of the Saracens,* London : Macmillan and Co. Limited, reprint, 1916

90. Wellhausen, J. : *The Arab Kingdom and its fall,* Translated by Margaret Graham Weir, Calcutta : The Calcutta University Press, University of Calcutta, 1927

91. Guillaume, A. : *The Life of Muhammad*, Oxford University Press, Lahore, Karachi, Dacca, 1967

92. Joseph Hell : *Arab Civilisation,* eng. tr. by S. Khuda Bukhsh, Lahore: SH. Ashraf Press, 1949

93. Enamul Haq, Dr. M. : *Crimaljustice system administration*, Dhaka: Ahsania Mission, October, 2001

94. Davenport, John : *An Apology for Mohammed and the Koran,* London : Dryden Press, J. Davy and Sons, 137, Long Acre, 1882

Website

95. http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/06/blog

96. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg visited on 10.06.2014

97. http://islambd.org/ visited on 15.07.2014